ড: জয়ন্ত চৌধুরী

নেতাজির মা



নে তা জি র

মা

নেতাজির

মা

ড. জয়ন্ত চৌধুরী
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

দীপ
NETAJIR MAA
by Dr. Jayanta Choudhuri

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ সৌম্যদীপ প্রধান
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

আমার দুই দিদি, স্নেহশীলা মাতৃসমা
বড়দি (তপতী চক্রবর্তী)
ও
ছোড়দির (রত্না সরকার)
করকমলে

ভূমিকা

নেতাজির মাতৃসাধনা, তাঁর মাতৃময় জীবনগাথা, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তেমনভাবে উঠে আসেনি। বিদ্যাসাগরের মাতৃদেবী, স্বামী বিবেকানন্দের মা সম্পর্কে লেখালেখি হলেও সুভাষচন্দ্র বসুর পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণি প্রভাবতী দেবী সম্পর্কে জীবনীকার, গবেষকরা বিশেষ অবকাশ পাননি। বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের উত্তাল দিনগুলিতেও তাঁর মা'এর প্রভাব, মাতৃভক্তি, মাতৃকর্তব্য উল্লেখযোগ্য। সুভাষচন্দ্রের মাতৃসাধনা-গর্ভধারিণী জননী, বঙ্গজননী, ভারতমাতা পরিশেষে দুর্গা-কালীতে বিলীন হয়েছিল। তাঁর কৈশোরের চিঠিপত্র (মা'কে লেখা) কারাবাসকালে লেখা অসংখ্য চিঠিপত্র ও লেখাতে বিধৃত হয়ে আছে মাতৃসাধনার মূল সুর। সামগ্রিকভাবে নেতাজির জীবনের সূচনা পর্বে, যে দেশপ্রেম, ঈশ্বরভাবনা, সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবের ভাবনা আন্দোলিত করেছিল, তার নেপথ্যে ছিল বাবা জানকীনাথ বসু ও মা প্রভাবতী দেবীর আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা, মানব দরদি মন এবং অবশ্যই স্নেহময় প্রশ্রয়। সুভাষচন্দ্রের পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরানি, বসু পরিবারের মা জননী, প্রভাবতী দেবী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মাতৃসাধনা সম্পর্কে প্রথম শ্রদ্ধার উপাচার—'নেতাজির মা'। সুবি থেকে সুভাষ, সুভাষচন্দ্র থেকে নেতাজি ও উত্তর জীবনে তাঁর পথ চলার, তাঁর বাল্য, কৈশোর গড়ে ওঠার নেপথ্য ও নিভৃত শক্তি তাঁর মা প্রভাবতী দেবী। তাঁর মাতৃভক্তি ক্রমশ সার্বিক মাতৃসাধনা, ভারতসাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। গড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়, এই বিবর্তন ইতিহাসের নিরীক্ষণে, নানা জনের স্মৃতির স্বর্ণময় সম্ভার সত্তার থেকে অনুসন্ধানী অন্বেষণে খুঁজে ফেরার একান্ত নিবেদন 'নেতাজির মা'।

দেশভাগের পর, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় যে দুঃসহ ব্যভিচার আর কৃত্রিম অতি উজ্জ্বল আলোর আড়ালে তীব্র অন্ধকারে রয়ে যাওয়া মহাপ্রাণদের ইতিহাস চাপা দেওয়া হয়েছিল তার রাহুমুক্তির সূচনা হয়েছে। নানা গোপন ফাইলের প্রকাশ্যে আসায় অনেক নেতাজি-সত্য সামনে চলে আসছে। শুধুমাত্র ইতিহাসের সন-তারিখ নয়, নেতাজির ব্যক্তি মানস, মনন অনুসন্ধানের সুযোগ সামনে এসেছে। অপপ্রচারের আঁধারে হারিয়ে গিয়েছিলেন এ মহাভারতের ভীষ্মতুল্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুক্তিসাধক সুভাষ, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনতুল্য সেনানায়ক নেতাজি আর তীক্ষ্ন মেধাবী নীতিবান পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণতুল্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। জন্মাষ্টমী তিথির মতোই জাতির জীবনে রয়ে গেছে শুধুই ২৩ জানুয়ারি। সে যুগে প্রভাবতী দেবী কোদালিয়ার দুর্গা দালানের ডানপাশে বাসুদেব নারায়ণের আসন করেছিলেন। এ যুগের মহাভারতের পার্থসারথি শ্রাবণের বর্ষণ মুখর গভীর রাতে কংসের কারাগারে নয়, শৃঙ্খলিতা ভারত মায়ের মুক্তিযজ্ঞের যাজ্ঞিক পুরোধা রূপে মধ্যাহ্ন সূর্যকে সাক্ষী রেখে পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন ঘুমন্ত দেশবাসীর চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন এনে দিতে। 'আমরা জন্ম হইতেই মা-এর জন্য বলিপ্রদত্ত'—বিবেকানন্দের এই বাণীর জীবন্ত ভাষ্য সুভাষচন্দ্র, তাঁর জীবনে, কর্মে, পথ দেখিয়েছেন আজও আগামীর জন্য। নারীশক্তির জাগরণে তাঁর প্রচেষ্টা ও অবদান সঠিকভাবে মূল্যায়ণ হয়নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্র-নজরুলের জীবনদর্শনের ধারায় নারীশক্তিকে রণাঙ্গণে ঝাঁসি রেজিমেন্টের মাধ্যমে মাতৃমুক্তি যজ্ঞে সামিল করে বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিলেন নেতাজি।

একদা কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে 'নেতাজির পরম পূজনীয়া মাতা ঠাকুরানী' শীর্ষক বক্তব্য রেখেছিলাম। বহু বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে সেদিন সব কথা বলার অবকাশ না হলেও আজ বিস্তারিত পেশ করার সুযোগ পেয়ে তৃপ্তিলাভ করছি। প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিপ্লবী শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য তরুণ বিশ্বাস, অনুকূল ঠাকুর সম্পর্কে তথ্য সরাবরাহ করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। নেতাজির দাদা ডা. সুনীলচন্দ্র বসুর দৌহিত্র ইন্দ্রনীল মিত্র, শৌলমারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃত সারদানন্দজীর সাক্ষাৎধন্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ক্যাপ্টেন বিপ্লবী প্রয়াত বিশ্বজিৎ দত্ত, জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিজয় নাগ, সবিতা গুহ, প্রিয়ম গুহ, কালীচরণ ঘোষ (বিপ্লবী ও লেখক) এর সুযোগ্য পুত্র শিবশংকর ঘোষ, অনিন্দ্য দাস, সোমনাথ খান, পণ্ডিত গৌরীনাথ-অশোকনাথ শাস্ত্রী সমিতির বিমান ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নন্দিনী ভট্টাচার্য এবং অগ্রজ, অনুজ, বন্ধু স্বজন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।

উল্লেখ্য, নেতাজির মাতৃপূজার আড়ালে পিতৃদেব জানকীনাথ বসুর প্রভাব সুভাষ জীবনকে কীভাবে আলোড়িত ও সমৃদ্ধ করেছিল সে প্রসঙ্গও এসেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় নেতাজির পৈতৃকগৃহ এলগিন রোডের নেতাজিভবনে আজ প্রভাবতী দেবীর স্মৃতিকক্ষ মুছে ফেলে 'নেতাজির কক্ষ' করা হয়েছে। নেতাজির প্রকৃত কক্ষটি ছিল মা-এর ঘরের লাগোয়া, সে কক্ষটিকে মেজদা শরৎ বসুর ঘর রূপে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে দেশবাসীর সামনে। মেজদা শরৎ বসু তাঁরই নির্মিত নিকটবর্তী উডবার্ন পার্কের বাড়িতে সপরিবারে বাস করতেন। মাতা-পুত্রের সঠিক স্মৃতি সংরক্ষিত হোক নেতাজিভবনে, ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষায় অচৈতন্যের আরাধনা বন্ধ হোক। সুভাষ-বর্ষে এই প্রার্থনা রইল। পরিশেষে, ব্যথাতুর চিত্তে স্মরণ করি শৈশবে স্বর্গত পিতৃদেব রবীন্দ্র চৌধুরী এবং কয়েক বছর আগে না-ফেরার দেশে চলে যাওয়া মাতৃদেবী মৈত্রেয়ী চৌধুরী ও পিতৃতুল্য পিতৃব্য ড. অমিয় চৌধুরীকে। তাঁদের হাতে 'নেতাজির মা' গ্রন্থটি তুলে না দিতে পারার যন্ত্রণা আজীবনের। জয়হিন্দ।

জয়ন্ত চৌধুরী

৩০ আগস্ট ২০২১
(জন্মাষ্টমী)

ড. জয়ন্ত চৌধুরীর অন্যান্য গ্রন্থ :

১। নেতাজি গেলেন কোথায়?

২। President Aganist the Raj

৩। Netaji Subhas Chandra Bose --A Political visionary

৪। ক্ষমা করো মহাপ্রভু

৫। সোভিয়েত রাশিয়া ও লাল চীনে নেতাজি

৬। সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ—অনৈক্য থেকে ঐক্যে

৭। নিরুদ্দেশের পথিক

৮। ক্ষমা করো সুভাষ

৯। অনির্বাণ নেতাজি (সম্পাদিত)

১০। মেঘসমুদ্র ও একলা আকাশ (কাব্যগ্রন্থ)

১১। নেতাজী ও নজরুল : আদর্শিক সম্পর্ক (জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)

সুভাষ সূচি

প্রথম অধ্যায়

মা জননী প্রভাবতী দেবী

কিশোর সুভাষ তাঁর পরম পুজনীয়া শ্রীমতী মাতা ঠাকুরানিকে হৃদয়মথিত এক পত্রে লিখেছেন—'মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারতমাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্যা! হায়! কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই আর্য্যবীরকুল যাঁহারা ভারতমাতার সেবার জন্য হেলায় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন।... আমাদের দেশের অবস্থা কি দিনদিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—দুঃখিনী ভারতমাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবে না? মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব?...'

সাল তারিখ বিহীন, অনেকটা গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিটি রবিবার দিন রাঁচি থেকে লেখা। এই সময়কার চিঠিগুলি থেকে স্পষ্ট, কলকাতায় তাঁর মা প্রভাবতী দেবী অবস্থান করছিলেন এবং সালটা বাংলার ১২১৩।[১] প্রাক যৌবনের সুভাষ-এর জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই সময়কার লেখা প্রতিটি পত্রেই। প্রাণ খুলে হৃদয়ের কথা, মনের ব্যথা ব্যক্ত করেছিলেন—'চির স্নেহাধীন সেবক সুভাষ'।[২] সুভাষ জননী আমৃত্যু সুভাষের ছোটবেলার এই চিঠিগুলি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে গেছেন।[৩] অরুণোদয়ের প্রভাতী আলোকছটা ছড়িয়ে গিয়েছিল কটকের কিশোর সুভাষের ভাবভাবনার গভীরে।

বিদেশের মাটিতে বসে অতি অল্প সময়ে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' বা ভারত পথিক রচনা করে চলে যান[৪] বৈপ্লবিক সংঘর্ষময় জীবন পথে, সে এক অন্য অধ্যায়, অনন্য ইতিহাস।

পরিণত বয়সে লেখা ওই আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র তাঁর পারিবারিক ইতিহাস[৫], শৈশবের পরিবেশ থেকে ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায় অকপটে, অসাধারণ দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই তিনি লিখেছেন—'আমার বাবা, জানকীনাথ বসু, গত শতাব্দীর নবম দশকে উড়িষ্যায় চলে যান এবং ওকালতি সূত্রে কটকে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুযারি শনিবার আমার জন্ম। আমার বাবা মাহীনগরের বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; আর মা প্রভাবতী হাটখোলার দত্ত পরিবারের কন্যা। আমি আমার বাবা-মা'র ষষ্ঠপুত্র ও নবম সন্তান।' তাঁর বাবা ও মা'য়ের বয়সের ব্যবধান ছিল নয় বছরের। ১৮৬০-এর ২৮ মে বাবা ও ১৮৬৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি মা জন্মগ্রহণ করেন।[৬] প্রভাবতী দেবীর মতো জানকীনাথ বসুও দানধ্যান করতেন। বিশেষ করে দরিদ্র ছাত্ররা সাহায্যের আশায় তাঁর কাছে নিয়মিত আসত।[৭] জানকীনাথ নিজেও মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং লেখাপড়া শেখার সময় আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব তিনি নিজে অনুভব করেছিলেন।[৮] জানকীনাথের বেশিরভাগ দান যেত উড়িষ্যায় তবে বাংলার পূর্বপুরুষের ভিটে কোদালিয়াতেও। জানকীনাথ তাঁর মা ও বাবার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঠাগার তৈরি করেছিলেন।[৯] দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্যও তাঁর হৃদয়ে কোমল একটা স্থান ছিল, সেজন্য মৃত্যুর আগে পুরোনো ভৃত্য ও অন্যান্য পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য তিনি ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।[১০] নেতাজির মাতৃদেবী সম্পর্কে বিস্তারিত যাবার আগে তাঁর পিতৃদেব জানকীনাথের শিক্ষা ও চাকুরিজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করলে পারিবারিক পরিবেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। সুভাষচন্দ্রের নিজের লেখনীতে জানা যায় তাঁর বাবা

কলকাতার অ্যালবার্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (তখন এনট্রান্স বলা হত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিস ইনস্টিটিউশনে (এখনকার স্কটিশচার্চ কলেজ, যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন পর্বের পর সুভাষচন্দ্র পড়তেন) পড়াশুনা করেন। এরপর কটকে গিয়ে র‍্যাভেনশ কলেজের স্নাতক হন। কলকাতায় ফিরে আসেন আইন পরীক্ষা দেবার জন্য। এইসময় ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগণ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তাঁর ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের মত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। রেক্টর কৃষ্ণবিহারী সেনের অ্যালবার্ট কলেজে কিছুদিন তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন এবং ১৮৮৫ সালে কটকে ফিরে আইনব্যবসা শুরু করেন। সুভাষচন্দ্রের লেখা থেকে আরও জানা যায়—'১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কটক মিউনিসিপ্যালিটির তিনিই প্রথম নির্বাচিত বেসরকারি চেয়ারম্যান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তিনি Government Pleader ও Public Prosecutor-এর পদ লাভ করেছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন ও রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হন। জেলাশাসকের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধ ঘটায় ১৯১৭ সালে তিনি উভয় পদেই ইস্তফা দেন। আর এর তেরো বছর পরে, ১৯৩০ তিনি সরকারি দমননীতির প্রতিবাদস্বরূপ রায়বাহাদুর উপাধি বর্জন করেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক বোর্ডের মতন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যে তিনি শুধু জড়িত ছিলেন এমন নয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কটক ইউনিয়ন ক্লাবের মত শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়।'[১১] তাঁর দান-ধ্যানও কম ছিল না। অবশ্য এটি তাঁর পূর্বপুরুষ পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক পুরন্দরের ধারা অনুযায়ী পেয়েছিলেন অনুমান করা যায়।[১২] উল্লেখ্য, অ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপনা ও জয়নগরের বিদ্যালয়ে কিছুকাল প্রধান শিক্ষকতা করেন। এই সময় জানকীনাথ অর্থকষ্টে ছিলেন।[১৩]

১৮৮০ সালে জানকীনাথ বসুর বিবাহ হয় উত্তর কলকাতার হাটখোলার দত্ত পরিবারের একটি শাখায়। প্রভাবতী দেবীর বাবা ছিলেন গঙ্গানারায়ণ দত্ত। এ প্রসঙ্গে নেতাজির ভাইঝি গীতা বিশ্বাস (বসু) স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'গঙ্গানারায়ণ দত্ত তাঁর প্রথম পৌত্রী প্রভাবতীর বরের অন্বেষণে কলেজে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন একটি কালো রোগা ছাত্র একজায়গায় বসে কী লিখছে। তখন টিফিনের ছুটি। অন্যান্য ছাত্রেরা মাঠে খেলধূলা ও গল্পগুজব করছে। তিনি সেই ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন অন্যান্যদের মতো খেলাধূলা না করে লেখা নিয়ে ব্যস্ত? জানকীনাথ উত্তরে বললেন তাঁর বই কেনার সামর্থ্য নেই, সেজন্য বন্ধুদের কাছ থেকে বই নিয়ে লিখে নিচ্ছেন। গঙ্গানারায়ণ তাঁর পিতার নাম, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নিলেন এবং জানকীনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর অপরূপা সুন্দরী পৌত্রী প্রভাবতীর বিবাহ স্থির করে ফেললেন। বিবাহের পর প্রভাবতীর পিতা কাশীনাথ দত্ত যখন মেয়েকে দেখতে তার শ্বশুরালয়ে গেলেন, তাঁদের পারিবারিক অবস্থা দেখে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পিতাকে বললেন, 'বাবামশাই, আপনি আমার সোনার প্রতিমার মতো মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন?' পিতা উত্তর দিলেন, 'জলে ফেলেছি কি কিসে ফেলেছি দেখো।'[১৪]

এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন—'আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি নাকি আমার বাবার সঙ্গে আমার মা-এর বিবাহ স্থির করার আগে, বাবার জ্ঞানের পরীক্ষা নেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। আমার মা ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর কনিষ্ঠা বোনেদের পরপর যাঁদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তাঁরা হলেন, ডিস্ট্রিক্টসেশন জজ স্বর্গত বরদাচন্দ্র মিত্র, আইসিএস, বারাণসীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু, সাবরডিনেট জজ স্বর্গত চন্দ্রনাথ ঘোষ এবং কলকাতার স্বর্গত রায়বাহাদুর চুনীলাল বসুর কনিষ্ঠ ভাই স্বর্গত ডাক্তার জে এন বসু।'[১৫]

গীতাদেবী সম্ভবত স্মৃতি বিভ্রাটে প্রমাতাসহ ও মাতামহের নাম বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। মাতৃকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সুভাষচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখায়—'ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে কলকাতার যে সমস্ত পরিবার ঐশ্বর্যের জন্য এবং নবসৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার সুবাদে প্রভূত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল দত্ত পরিবার তাদের অন্যতম। এর ফলে সেকালে নব্য অভিজাত মহলেও তাদের স্বীকৃতি ছিল। আমার প্রমাতামহ, কাশীনাথ দত্ত, নিজের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যান এবং কলকাতার প্রায় ছ'মাইল উত্তরে ছোট শহর বরাহনগরে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সুশিক্ষিত; অত্যুৎসাহী পাঠক ও ছাত্র সমাজের বন্ধু। কলকাতার ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স জার্ডিন স্কীনার এন্ড কোম্পানিতে অফিস-পরিচালনা সংক্রান্ত এক উচ্চপদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। জামাতা নির্বাচনের ব্যাপারে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত ও প্রমাতামহ, উভয়েই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে, তখনকার দিনে কলকাতার প্রধান প্রধান অভিজাত পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন কাশীনাথ দত্তের অন্যতম জামাতা।[১৬] তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি কলকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অপর একজন রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু। তিনি আমার বাবার আগে কটকে যান এবং ওকালতি করে সমগ্র উড়িষ্যায় এক অনন্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।[১৭] তাঁর প্রসঙ্গে শরৎ বসুর কন্যা গীতা বিশ্বাস (বসু) লিখেছিলেন—'মা জননীর পিসেমশাই হরবল্লভ বসুর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। বাবার কাছে গল্প শুনেছি তিনি বাবাকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দাদাভাই (জানকীনাথ বসু) রাজি হননি। যদিও তাঁর আট পুত্র ছিল, নিজের পুত্রকে কারো কাছে দিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। বাবা ঠাট্টা করে আমাদের বলতেন, 'বাবা ভুলই করেছেন, হরবল্লভ বসুর পোষ্যপুত্র হয়ে থাকলে আমাকে আর কাজ করতে হত না। পায়ের ওপর পা দিয়ে চিরকাল বসে খেতে পারতাম।' হরবল্লভ বসু তাঁদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সকলেই তাঁর অনুরক্ত ছিলেন। হরবল্লভ বসু তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন, 'তোদের দন্তদাদু ভালো না দেড়েল দাদু ভালো?' তাঁর বড় বড় দাঁত ছিল, তাই, নিজেকে দন্তদাদু বলতেন। মা জননীর বাবার (কাশীনাথ দত্ত) দাড়ি ছিল তাই তিনি দেড়েল দাদু। কাশীনাথ দত্ত কলকাতার বরাহনগরে থাকতেন। সেজন্য তাঁর সঙ্গে নাতিদের অত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। হরবল্লভ বসু কটকে থাকতেন, তাই তিনি অনেক কাছের লোক।'[১৮]

সুভাষচন্দ্র তাঁর পিতৃদেব জানকীনাথ ও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র সংক্ষেপে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

আমার বাবার যৌবনে যদিও জনগণের মধ্যে গভীর নৈতিক জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তবু আমার বিশ্বাস এই যে, রাজনৈতিক ভাবে দেশ ছিল তখনও মৃত। একথা তাৎপর্যপূর্ণ যে তাঁর আদর্শ পুরুষগণ কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র (এঁরা উভয়েই শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং অনেকটা এঁদের প্রেরণাতেই উচ্চ-চরিত্রাদর্শের এক নতুন শ্রেণীর শিক্ষক তৈরি হয়েছিল। আমার বাবাও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন এবং হয়তো বৃত্তি হিসাবেই তিনি তা গ্রহণ করতে পারতেন।) সুউন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলেও কোনভাবেই সরকার বা ইংরেজ বিরোধী ছিলেন না। কেশবচন্দ্র স্পষ্টই বলতেন যে, ইংরেজের আগমনকে, তিনি ঈশ্বরের বিধান বলেই মনে করেন। আর ঈশ্বরচন্দ্র আজ একজন 'অসহযোগী' যেমন করে থাকেন, তেমনভাবে সরকার ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিহার করে চলেননি, যদিও প্রগাঢ় স্বাধীনতা বা আত্মসম্মানবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের মূলকথা। আমার বাবাও উচ্চ চরিত্রাদর্শের মানুষ ছিলেন এবং নিজ পরিবারকে সেইভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনিও সরকার বিরোধী ছিলেন না। সেজন্যই তিনি Government Pleader ও Public Prosecutor এর পদ এবং সেই সঙ্গে সরকারের উপাধি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার বাবার অগ্রজ অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ

বসুর প্রকৃতিও ছিল অনেকটা একইরকম। তিনি অনিন্দ্য চরিত্রের লোক ছিলেন, পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক গুণের জন্য তাঁর প্রতি ছাত্রদের ভক্তি ও ভালোবাসাও ছিল প্রগাঢ়, কিন্তু তিনিও সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। সেই রকম, আমার বাবার আমলের আগে, 'বন্দেমাতরম' (এর প্রকৃত অর্থ আমি মাকে অর্থাৎ মাতৃভূমিকে প্রণাম করি। এটি প্রায় ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।) সঙ্গীত রচনা করেও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা) পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সরকারি চাকুরী করা। যদিও তাঁর জাতীয় সঙ্গীতগুলি মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে, তবু সরকারি চাকুরীতে ডি.এল.রায় (বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন এবং বহু জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা—দিলীপ রায়ের পিতা। ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।) ম্যাজিস্ট্রেট হতে পেরেছিলেন। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছে কয়েক দশক আগে, কারণ সেটি ছিল পরিবর্তনের, এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সম্ভবত অপরিণতির যুগ।[১৯]

জানকীনাথ বসু দাদাভাই ও প্রভাবতী দেবী মাজননী হিসাবে বৃহত্তর পরিবারে অত্যন্ত শ্রদ্ধার ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'স্মৃতির আলোয়' বইতে গীতা বসু (বিশ্বাস) লিখেছেন—'আমাদের মাজননী প্রভাবতী বসু অসামান্য রূপসী ও গুণবতী ছিলেন। তাঁর পুত্রগণ সকলেই তাঁদের কর্মক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।... তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা-বুদ্ধিমত্তা-কর্মদক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা অসাধারণ ছিল। গৃহস্থালী, ছেলেমেয়েদের লালনপালন, অতিথি অভ্যাগতদের দেখাশুনা-সমস্তই মা জননী করতেন। ছেলেদের লেখাপড়ার দিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। আমাদেরও কোনোরকম বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমরা তাঁকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করতাম—আবার যথেষ্ট ভয়ও পেতাম। জানকীনাথ ও প্রভাবতী, উভয়েই অতিশয় ধর্মপ্রাণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁদের ছয় কন্যা যথাক্রমে প্রমীলা, সরলা, তরুবালা, মলিনা, প্রতিভা ও কনকলতা। তখনকার দিনে মেয়েদের বেশি শিক্ষালাভ অভিভাবকদের অভিপ্রেত ছিল না। তাঁদের সকলেরই অল্প বয়সে বিবাহ হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্রের বোনেরা অন্য সংসারে গিয়ে তার মধ্যেই নিজেদের জড়িত রেখেছিলেন। শরৎচন্দ্র বা সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ আমরা দেখিনি। তাঁরা অবশ্য দাদাভাই ও বাবার বাড়িতেই প্রায়ই আসতেন বা থাকতেন। কোনো বোনের অসুস্থতা বা কোনো অসুবিধা হলে দেখেছি ভাইরা খুবই উদ্বিগ্ন হতেন। আমাদের বড় পিসিমা প্রমীলা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে বেশিরভাগই আমাদের বাড়িতে থাকতেন। ভাই-ভ্রাতৃজায়া ও আমাদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল।'[২০]

সুভাষচন্দ্রের একদা সহকর্মী ও সহমর্মী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত স্মৃতিচারণায় তাঁর বইতে লিখেছেন যে—সুভাষচন্দ্র খুবই সৌভাগ্যবান যে একজন ভাল ও স্নেহময়ী মা তিনি পেয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম পুত্র সতীশচন্দ্র বসু (বার-অ্যাট-ল, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য), দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র বসু (ব্যারিস্টার ও কংগ্রেস দলের নেতা, আইনসভার সদস্য, দিল্লি), তৃতীয় সুরেশচন্দ্র বসু (নিজস্ব মতে চলার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে পদত্যাগ করেন ও কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনাল-এর অ্যাকসেসর), চতুর্থ সুধীরচন্দ্র বসু (জামশেদপুরের টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোম্পানির অফিসার ছিলেন), পঞ্চম সন্তান ডা. সুনীলচন্দ্র বসু বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ষষ্ঠ সন্তান। সপ্তম সন্তান শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু টেক্সাইল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বোম্বাইতে। একদম ছোট ভাই জামডোবাতে প্রতিষ্ঠিত হলেও অসময়ে মারা যান।[২১]

নেতাজির ভাইঝি গীতার স্মৃতিকথায় জানা যায় সুরেশচন্দ্র জার্মানি থেকে Glass Manufacturing শিখে এসেছিলেন। সুধীরচন্দ্র Metallurgist, শৈলেশচন্দ্র Textile Expert। কনিষ্ঠপুত্র সন্তোষচন্দ্র ছিলেন ছোট বয়স থেকে অসুস্থ, তিনি ২৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।[২২]

এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী প্রতিমা মিত্র তাঁর 'রাঙামামাবাবু' শীর্ষক নিবন্ধে ছোটভাইয়ের প্রতি সুভাষের মমত্ববোধের অপূর্ব চিত্র তুলে এনেছেন—'... নানান রাজনৈতিক কাজের মধ্যে থেকেও এই কর্মযোগীর সকলের প্রতি অদ্ভুত আন্তরিক দৃষ্টি ছিল। ছোটমামা ৺সন্তোষচন্দ্র বসু যখন অসুস্থ অবস্থায় (সেই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হয়) এলগিন রোডের বাড়িতে, তখন কিছুদিন রাঙামামাবাবু ১ নং উডবার্ন পার্কের (মেজমামা ৺শরৎচন্দ্র বসুর) বাড়িতে ছিলেন। প্রতি রাত্রে (১১টার আগে কোনদিনই নয়) এসে ছোট ভাইটিকে দেখে, তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কত মজার ছড়া গল্প বলে সেইখানেই শুয়ে পড়তেন। কিছুতেই অন্য ঘরে বা অন্য বিছানায় যেতেন না। অত রাত্রে এইভাবে তিনি প্রতিদিন পায়ে হেঁটে আসতেন।

চারিদিকে শ্যেনচক্ষু গোয়েন্দার দল। তাঁর উপর নজর রাখত। তাই দিদিমণি (প্রভাবতী বসু) কত সময় উদ্বিগ্ন হতেন তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে। কিন্তু তিনি ছোট ভাইটির রোগশয্যার পাশে রোজই এসে উপস্থিত হতেন। সেই রোগীর ঘরে নীরব নিস্তব্ধ রাত্রে কত কথাই বলতেন! কেবলই বলতেন, দেশকে স্বাধীন করা, সমৃদ্ধ করা যেন আমাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য হয়। ভারতের (তখন অখণ্ড ভারত) নারীর বিবাহিত জীবন আত্মসুখের উদ্দেশ্যে নয়। সবল সুস্থ সুযোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা চাই। আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'তোরা সব শক্তির অংশ, তোরা না জাগলে কি করে ভারত জাগবে? দেশ কিভাবে স্বাধীন হবে?' বলতে বলতে যেন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। সুপ্তসিংহ কথাটা পড়েছিলুম, কিন্তু সেই সময়ে শেষ রাত্রে তখন অর্ধসুপ্ত অবস্থায় 'আর ঘুমায়না দেখ চক্ষু মেলি' ইত্যাদি আবৃত্তি করতেন তখন সেই কথাটিই চাক্ষুষ হয়ে উঠত। ঘরের আবহাওয়াটাই যেত বদলে। গম গম করে উঠত। গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠত। সে দৃশ্য সে পরিবেশ বলা যায় না।...'[২৩]

ছোটভাই চলে গেল, প্রভাবতী দেবী প্রত্যক্ষ করেছিলেন পুত্র বিয়োগের যন্ত্রণা। সেই অশৌচ চলাকালীন প্রভাবতী দেবী জেনেছিলেন কলকাতার রাজপথে স্নেহময় সুভাষের ওপর ব্রিটিশের বর্বর প্রহার ও হাজতবাসে অভুক্ত রক্তাক্ত হবার সংবাদ। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ থাকায় সেই সময়কার স্বাধীনতা দিবস পালন করতে পারেন নি। ১৯৩১ এর ২৬ জানুয়ারি সদ্য ভ্রাতৃহারা কলকাতার মহানাগরিক পুলিশ প্রহরাকে বোকা বানিয়ে দুপুর বেলায় কর্পোরেশনের সামনে থেকে বিশাল শোভাযাত্রা করে ময়দানের পথে অগ্রসর হন। তিনি গভীর রাতে উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে কর্পোরেশনে চলে আসেন।[২৪] বেলা তিনটের সময় শঙ্খনিনাদ ও বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে দিয়ে বিশাল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এগিয়ে চলেন। পুলিশ এলোপাথারি লাঠি চার্জ শুরু করে। 'ছোটভাই সন্তোষচন্দ্র মারা যাওয়ায় তাঁর অশৌচ চলছিল, সেজন্য তিনি নগ্নপদ এবং উত্তরীয় আবৃত ছিলেন। শৈলেন মার খেয়ে ছিটকে গেল এবং ক্ষিতীশ লুটিয়ে পড়লে যখন সুভাষচন্দ্রের উপর এলোপাথাড়ি লাঠির বাড়ি পড়ছিল তখন 'জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী উন্মাদিনীর মতো চেঁচিয়ে ওঠেন—উনি কলকাতার মেয়র ওঁকে অমন করে মেরো না।' নরেন্দ্র নারায়ণ তখন সুভাষচন্দ্রের পাশে ছুটে যান, তাঁর শরীর আড়াল করার চেষ্টা করেন, এক ফিরিঙ্গি সার্জেন্ট একটা বড় লাঠি সবলে চালিয়ে দেয় সুভাষের মাথা লক্ষ্য করে, সুভাষচন্দ্রকে ঠেলে সরিয়ে দিলে সেই লাঠি পড়ে নরেন্দ্রনারায়ণের ব্রহ্ম তালুর উপরে, খুলি ফেটে রক্তস্রোত ঝরতে থাকে চোখ মুখ বেয়ে। তিনি পড়ে যাচ্ছেন—রাজকুমার চক্রবর্তী তাঁকে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যান মেডিক্যাল কলেজের দিকে।[২৫]

তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের মুখপত্র 'দ্যা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক অমল হোমের বর্ণনায় জানা যায়—

'...মেয়রই হলেন এই বেধড়ক মারের বিশেষ লক্ষ্য। দুদিক থেকে দুটো সাওয়ার এসে তাঁকে পেটাতে শুরু করল। হাত ভাঙল, মাথা ফাটল, রক্তে ভেসে গেল...।'[২৬] অবশেষে কোর্টে সেদিনের বর্ণনা পাওয়া যায়—

'...ডকে এসে দাঁড়ালেন রক্তসিক্ত কলকাতার মুখ্য নাগরিক—The first citizen of Calcutta। হাতে একটা কাপড়ের ফালি জড়ানো, কপালে মাথায় গোটাকয়েক পট্টি বাঁধা। ম্যাজিস্ট্রেটের উত্তরে মেয়র জানালেন যে তিনি নন-কো-অপারেটর, অতএব আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিচারের কোনো সহায়তা করবেন না। ৬ মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম হবার পর সুভাষচন্দ্র কোর্টকে জানালেন, আগের দিন তাঁর সঙ্গে লালবাজার হাজতে পুলিশের ব্যবহার। বাড়ি থেকে খাবার ও কাপড়চোপড় পাঠান হয়েছিল, তা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তখন তাঁর অশৌচ, তাঁর ছোটভাই সন্তোষচন্দ্র কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। হাজতের খাবার তাঁর পক্ষে খাওয়া সম্ভব ছিল না। থাকতে হলো অভুক্ত। ভাঙা হাতের জন্য স্লিং চেয়ে পাননি। ব্যান্ডেজ পাননি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয়নি। শুধু পেয়েছিলেন ছিপি খোলা আধশিশি টিনচার আয়োডিন। জ্বর হয়েছিল। কিন্তু হাজতে থার্মোমিটার পাওয়া যায় নি। কলকাতার মেয়র আহত অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায়, বিনা আহারে, বিনা স্নানে, বিনা বেশ পরিবর্তনে পুলিশ কোর্টের ডকের উপর দাঁড়িয়ে...'[২৭]

অনুমান করা যায় সেসময় জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবীর মনের অবস্থা। তাঁদের সে বেদনা যন্ত্রণা সঞ্চারিত হয়েছিল পরিবারের বাকি সদস্যদের মধ্যেও।

ফিরে যাই কটকের সেদিনের বৃহত্তর বসু পরিবারের আঙ্গিনায়। সুভাষচন্দ্রের নিজের ভাষায়—'বৃহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার অসুবিধা অনেক। শৈশবে যে বিশেষ যত্নের একান্ত প্রয়োজন তা লাভ করা যায় না। তার উপর, ভীড়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়, ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও কুনো স্বভাবের পরিবর্তে সমাজের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার একটা প্রবণতা গড়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে শুধু নিজের অনেক ভাইবোনের মধ্যেই আমি মানুষ হয়ে উঠিনি; মামা, জ্যাঠা এবং মামাতো ও পিসতুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে একত্রে বাস করার মত এক জীবনধারায়ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাজেই 'পরিবার' কথাটির মধ্যে যে অর্থ নিহিত আছে তা আপনা থেকেই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া দেশ থেকে যে সব দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসতেন তাঁদের জন্যও আমাদের বাড়িতে অবারিত দ্বার ছিল। দীর্ঘকাল ধরে চলতি ভারতীয় প্রথা অনুসারে কটক শহরে সম্ভ্রান্ত কোন অতিথি আগমন করলেই, তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাক আর নাই থাক, আশ্রয়লাভের ভরসায় সোজা তিনি আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। যেখানে হোটেলে বাস করার তেমন রীতি নেই, ভালো হোটেলও নেই, সেখানে সামাজিক প্রয়োজনেই যে কোন প্রকারের একটা ব্যবস্থা সমাজকে করে দিতে হয়।[২৮]

সে সময়কার পারিবারিক বিশালত্ব প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন—'বংশধারা বিচার করে দেখলে এটা লক্ষ করার মতো বিষয় যে, আমার পিত্রালয়ে বৃহৎ পরিবারের অস্তিত্ব কোন সাধারণ রীতি নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। অন্যদিকে মাতুলালয়ে বৃহৎ পরিবার স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কোনো না আমার মাতামহ নয় পুত্র ও ছয় কন্যার জনক। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সাধারণতঃ কন্যাদের পরিবারই ছিল বৃহৎ। আমার মা-ও বাদ ছিলেন না। তবে পুত্রদের ক্ষেত্রে সেই রকমটি হয়নি। আমার বাবা-মা-এর আটটি পুত্র ও ছটি কন্যা, তাদের মধ্যে নয় জন, সাতপুত্র ও দুই কন্যা বর্তমানে জীবিত।[২৯] নেতাজির ছোটবেলার গড়ে ওঠা এক অনন্য পরিবেশে যা তৎকালীন বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের জীবনে ঘটেনি। নেতাজির সার্বিক ঐক্য সাধনের লক্ষ্য ও রাজনীতি, তাঁর বাল্য ও বিদ্যার্থী জীবনেই অবচেতনে জায়গা করে নিয়েছিল তা অকপটে উঠে এসেছে তাঁরই আত্মজীবনীর পাতায়—'আমাদের পরিবারের বিরাটত্বের কারণ শুধু তার আয়তনের জন্যই নয়, পোষ্য ও ভৃত্যের সংখ্যাও ছিল প্রচুর; আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাণীজগতের প্রতিনিধি—গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, ময়ূর, বেজি ইত্যাদি। ভৃত্যদের নিয়ে ছিল নিজস্ব এক জগৎ, তাদের পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ধরা হত। তাদের অনেকে আমার জন্মের বহু আগে থেকেই কাজ করে আসছিল এবং কাউকে

কাউকে (যেমন সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধাদাসী) আমরা সকলে সমীহ করে চলতাম (তাদের কেউ কেউ পরে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছে ও পেনসান ভোগ করছে; কেউ কেউ মারা গেছে)। ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তি এসে তখনও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়নি; ফলে ভৃত্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট নিবিড়। শৈশবের এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে ভৃত্যশ্রেণী সম্পর্কে আমার মনোভাব গঠনে সাহায্য করেছে। পারিবারিক এই আবহাওয়ায় স্বভাবতই আমার মনের প্রসার ঘটেছিল; তবু তা আমার মুখচোরা লাজুক স্বভাবটিকে ছাড়াতে পারেনি। পরবর্তী জীবনে এই স্বভাব বহু বছর ধরে আমাকে পীড়া দিয়েছে, এবং সন্দেহ হয় এখনও আমি তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কিনা। আমি বোধহয় অন্তর্মুখী ছিলাম এবং এখনও তাই আছি। তাঁর এই অন্তর্মুখীতা তাঁর জননী প্রভাবতী দেবীর নজর এড়াত না তাই তিনি পরবর্তীকালে 'সুবি'র ব্যাপারে বেশি চিন্তিত থাকতেন এবং তা পারিবারিক নানা স্মৃতিকথায় খুঁজে পাওয়া যায়। যখন প্রবাসে বসে সংক্ষিপ্ত সময়ে এই অসমাপ্ত আত্মজীবনের স্মৃতিচারণা লিপিবদ্ধ করেন সুভাষচন্দ্র তখন ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত। শৈশবের সেদিনের ভাললাগা মন্দলাগা গুলিকে, তাঁর বাবা ও মায়ের স্নেহ ভালোবাসাকে কেমন উপলব্ধি করেছিলেন তিনি?—'একেবারে শৈশবের যে কথা আমার মনে পড়ে তা হল এই যে, নিজেকে নিতান্ত তুচ্ছ এক জীব বলে বোধ হত। আমি আমার পিতামাতাকে বেশ সমীহ করতাম। সাধারণত আমার বাবার চারদিকে এক গাম্ভীর্যের আড়াল থাকত এবং তিনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন। আইন ব্যবসার চাপে, জনসেবামূলক কাজের চাপে পরিবারের প্রতি নজর দেবার মতো খুব বেশি সময় তিনি পেতেন না, যেটুকুও বা পেতেন তা তাঁর সব ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্বভাবতই ভাগ করে দিতে হত। সর্বাপেক্ষা ছোট যে থাকত তার ভাগ্যেই অবশ্য আদরটা একটু বেশি জুটত, কিন্তু সে বেশিদিনের জন্য নয়, কারণ পরিবারে নূতন কারও আবির্ভাব ঘটলেই সে এই বিশেষ অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। বাবার অন্তরের কথা যাই হোক না কেন, নিরপেক্ষতার ব্যাপারে বাবাকে এতই কঠোর মনে হত যে বড়দের পক্ষেও বিচার করা কঠিন ছিল বাবা কাকে বেশি ভালোবাসেন। আর মা? যদিও তিনি অনেক বেশি স্নেহশীলা ছিলেন এবং কখনও কখনও তাঁর দুর্বলতা চোখে পড়ত না এমন নয়, তবু বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই তাঁকে সমীহ করে চলত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনিই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন এবং পারিবারিক ব্যাপারে সাধারণত তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির তিনি অধিকারিণী ছিলেন, আর তার সঙ্গে তীব্র বাস্তবতা বোধ ও গভীর বিবেচনাশক্তি যুক্ত থাকায় সাংসারিক বিষয়ে তিনি কি কর্তৃত্ব বিস্তার করতেন তা সহজেই অনুমেয়। শৈশব থেকে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁদের সঙ্গ আরও ঘনিষ্ঠভাবে লাভ করার জন্য আমার মনে তীব্র ইচ্ছা জাগত এবং সেইসব ছেলে মেয়েকে, যাদের সৌভাগ্যবশত বাবা-মা'র সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটেছে, তাদের ঈর্ষা না করে থাকতে পারতাম না। আমার স্পর্শকাতর ও আবেগপূর্ণ স্বভাবের জন্যই বোধহয় এরকম ইচ্ছা মনে জাগত।'[৩০]

অনেক ভাইবোনের সংসারে সুভাষচন্দ্র বাল্যকালের মনঃস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন চমৎকারভাবে। সে সময় জননী প্রভাবতী দেবীর উষ্ণ সান্নিধ্য সুভাষ সর্বদা না পেলেও জীবনের নানা নীতি শিক্ষা, পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে রপ্ত করতে পেরেছিলেন। আত্মকেন্দ্রিকতা কিংবা স্বার্থপরতা স্থান পায়নি, অভিভাবক, বিশেষ করে মাজননীর শাসনাধীন কটকের বৃহৎ পরিবারে। বাড়ির প্রাঙ্গণেই রয়েছে ছোট দুর্গামন্দির। ছোট প্রবেশ পথ দিয়ে নেমে দু'তিনজনের বেশি বসার জায়গা ছিল না মন্দিরটিতে। আজও পটে দুর্গা দেবী পূজিতা হন। মন্দিরের উল্টোদিকে বিশাল নিমবৃক্ষ যেটি পিতৃদেব জানকীনাথ বসু রোপণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩১] অনুমান করা যায় কিশোর সুভাষ ও মাতাঠাকুরানি ওই পারিবারিক মন্দিরে সময় কাটাতেন। কটকে নেতাজির জন্মকক্ষটি সেদিনের মত অনেকটা সংরক্ষিত হলেও বর্তমানে মিউজিয়ামে পরিবর্তন করা হয়েছে সমগ্র ভবনটিকে। আলাদাভাবে 'ঠাকুরঘর' কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত না করলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ছোট একটি ঘরকে

চিহ্নিত করা হয়েছে 'ফ্যামিলি রুম' বলে যেখানে দুই বিদেশিনী এমিলি সেঙ্কেল, অ্যানিটা ব্রজেট সেঙ্কেল ও তাঁর স্বামী মার্টিন পাফের ছবির পাশে নেতাজি সুভাষের ছবি স্থাপন করা হয়েছে। কটকের ওই বাড়ির সঙ্গে, নেতাজির সঙ্গে, যাঁরা ঐতিহাসিক বা আইনগত কোনোভাবেই সম্পর্কযুক্ত নন।[৩২] অবশ্য এমন বিকৃতি কলকাতার ৩৮/২ এলগিন রোডের নেতাজিভবনের মিউজিয়ামেও ঘটেছে। দো'তলার উত্তর দিকের যে শয়নকক্ষ সুভাষচন্দ্রের, যেখান থেকে অন্তর্ধানের পূর্বে তিনি অবস্থান করতেন সেই ঘরের পাশেই থাকতেন জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবী। ১৯৩৪ এর ডিসেম্বরে জানকীনাথ ও ১৯৪৩ এর ডিসেম্বরে প্রভাবতী দেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন যে ঘরটিতে সেটিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল একদা নেতাজির বাবা-মা'এর ঘর বলে।[৩৩] পরবর্তী সময়ে হঠাৎই পালটে ফেলা হয় ওই ঘরের নামকরণের ফলকটি। নেতাজির মেজদাদা শরৎ বসু ও মেজ বৌদি বিভাবতীর বাসকক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাস্তবে শরৎ বসু নির্মিত ১ নং উডবার্ন পার্কের বাড়িতেই শরৎ বসু প্রয়াত হন ১৯৫০ সালে। পরবর্তীকালে বিভাবতী দেবী প্রয়াত হন উডবার্ন পার্কের বাড়িতেই। উল্লেখ্য এলগিন রোডের বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব ১৯০৬ সালে।[৩৪] ভুবনেশ্বর, পুরীতে তিনি গৃহনির্মাণ করেছিলেন। কটকের বাড়িও তাঁরই। মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হবার পূর্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে দীর্ঘদিন বাড়িটি ব্যবহৃত হত। জাতীয় উপেক্ষায় হারিয়ে গেছে নেতাজির ছোটবেলার স্পর্শধন্য বহু জিনিস এবং জননী প্রভাবতী দেবীর ব্যবহৃত সামগ্রীও।[৩৫]

কলকাতায় অনেক টানাপোড়েনের পর জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি ও সিমলায় বিবেকানন্দের বসত বাড়িতে তাঁদের মায়ের সময়কার স্মৃতি সঠিকভাবে রক্ষিত হলেও নেতাজির ক্ষেত্রে সব পক্ষ থেকেই উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে নানা কারণে।[৩৬]

অবশ্য কোদালিয়া গ্রামে জানকীনাথ বসুর পৈতৃক ভিটেতে যে দুর্গাদালান রয়েছে তারই সংলগ্ন কক্ষে সুভাষ জননী প্রভাবতী দেবীর পূজিত নারায়ণ আজও পূজিত হন।[৩৭] কটকে কৈশোরের সুভাষ কেমন অনুভব করতেন তার ছবি তিনি তুলে ধরেছেন আপন লেখনীতে—'বাবা-মা'র সঙ্গে এই অস্বাভাবিক ভীতিপূর্ণ সম্পর্কটাই একমাত্র দুঃখজনক ব্যাপার ছিল না। আমার উপরে এতগুলি ভাই ও বোনের উপস্থিতির ফলে নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ বলে বোধ হত। এতে বোধহয় ভালই হয়েছিল। আমার উপরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সমান যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এরকম একটা ধারণা নিয়ে ভয়ে ভয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। ভালো হোক বা মন্দ হোক, অত্যধিক আত্মবিশ্বাস বা আত্মাভিমান আমার মধ্যে ছিল না। আমি কোন জন্মগত প্রতিভা লাভ করিনি; তবে কঠিন পরিশ্রম করতে কখনও পিছপাও হতাম না। আমার বিশ্বাস, আমার অবচেতন মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে কেবলমাত্র পরিশ্রম ও পরিশীলিত আচরণের দ্বারাই সাধারণ গুণসম্পন্ন মানুষ জীবনে সাফল্যলাভ করতে পারে।[৩৮]

সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চায়, জীবনদর্শনে প্রভাবতীদেবীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শোক, যন্ত্রণা, দুঃখকষ্টের মধ্যেও দয়া, ক্ষমা, সেবা ও ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের অনন্য চরিত্রবল গঠনের পাশাপাশি পরিশীলিত ব্যবহার, রুচিবোধ, সৌজন্যবোধ মাজননীর সংসার থেকে সুভাষ জীবনে উপ্ত হয়েছিল। তথাকথিত শিক্ষাগত তকমা না থাকলেও বৃহত্তর বসু পরিবারের দৈনন্দিনতার মাঝে তাঁর প্রকৃত জীবনবোধের শিক্ষা বারংবার লক্ষ্য করা গেছে। সে যুগে নারীশিক্ষার সূর্যোদয় সবে শুরু হয়েছে। মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সামাজিক আড়ষ্টতা আষ্টেপৃষ্টে প্রায় প্রত্যেক পরিবারকেই বিদ্ধ করেছিল। বাবু সংস্কৃতির ঘেরাটোপে নবজাগরণের জাগ্রত চেতনার রশ্মি তখনও সর্বোতমুখী হয়ে ওঠেনি। তাঁর বাংলা হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। প্রচুর বাংলা বই পড়তেন এবং শুনতে ভালোবাসতেন, বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থ।

সুভাষজননীর সঙ্গে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে সুভাষ মননে সাময়িক সংঘাতের সুর বেজেছিল তা শোনা যায় অন্তরঙ্গ বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা পত্রে। এই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর মেলামেশা নিয়ে পারিবারিক অশান্তির খবরও পাওয়া যায়।[৩৯] কৃষ্ণ-সুদামার মতো তাদের বন্ধুত্ব ১৯১২ থেকে শুরু হলেও[৪০] পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর দু'জনের রাজনীতির ধারা ক্রমশ ভিন্নমুখী হয়। কৈশোরে সাধুবেশে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করে বেশ কিছুকাল উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে সাধুসন্ত সঙ্গ করেছিলেন সুভাষ যাঁদের সঙ্গে, তাঁদের অন্যতম ছিলেন হেমন্ত।[৪১] ১৯১৪ সালে মে-জুন মাসের তপ্ত গরমে দিল্লির লালকেল্লার মতো মৌর্যদর্শন, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, লছমন ঝোলা প্রভৃতি তীর্থে সাধুদের আখড়া জীবনের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় জাতপাতদীর্ণ ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে ঘরে ফেরেন। পরাধীনতা মনের দাসত্বকে দৃঢ় করে এটাই ছিল সেদিনের সুভাষচন্দ্র ও সঙ্গীদের অভিমত ও অভিজ্ঞতা।

হেমন্ত একসময় একটি পত্রে সুভাষ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছিলেন 'রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমে সুভাষের মতো বন্ধু হারিয়েছি-জীবনে এর চেয়ে আমার বড় ক্ষতি হয়নি।'[৪২] সেই হেমন্তকে লেখা অজস্র চিঠি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। একসময় 'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' বই প্রকাশ করেন হেমন্ত। সঙ্গে কিছু কৈশোর কালের চিঠিও। এতে নাকি সুভাষ খুশী হননি বলে একদা মন্তব্য করেছিলে অন্তরঙ্গ বন্ধু হেমন্ত সরকার।[৪৩]

শাসনের চাপে কিশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে সুভাষের বাড়ির সঙ্গে বিশেষ করে মেজদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাদের কথা বন্ধুকে লেখা পত্রে উঠে এসেছে কোথাও কোথাও।[৪৪]

সুভাষের স্বাধীনতা সন্ধানী সাধক মন ও বন্ধুপ্রীতি নিয়েই বাড়িতে বিবাদ এবং অবশ্য হেমন্তের সহচর্য বিবাদের অন্যতম কারণ হত অনুমান করা যায়।

১৯১৩ সালের বড়দিনের ছুটিতে একবার সন্ন্যাসীজীবন যাপনের লক্ষ্যে আঠারো উনিশজন বন্ধু মিলে সুভাষচন্দ্ররা গেরুয়া ধারণ করে শান্তিপুরে গঙ্গার ধারে ৺ভরত পোদ্দারের একটি খালি বাড়িতে সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রসাধনা কিছুকাল করেন।[৪৫] অনেকটা নরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্দের বরাহনগরে সেই আশ্রমিক জীবনের সূচনা লগ্নের মত। 'শেষ রাতে শান্তিপুরের সেই গঙ্গায় ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ গা ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়... দেখিয়া মনে হইল প্রত্যেকে যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সন্ন্যাসী হওয়ার জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা সকলের চোখে মুখে।'[৪৬]

সেই বন্ধু দলের সঙ্গে সুভাষ বাবা মাকে না জানিয়ে আবারও সাধুসন্ধানে গেরুয়া ধারণ করে পাড়ি দেয় উত্তর ভারতে। প্রথম সন্ন্যাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গে হেমন্তকুমার তুলে এনেছেন সনাতন ভারতের মাতৃস্নেহের এক টুকরো ছবি—'গঙ্গায় ডুব দিয়ে ফিরছি। এদিকে আমার দেরি দেখে সুভাষচন্দ্র আমায় খুঁজতে এসেছে। পথের মাঝে একটি বিধবা মেয়ে, সঙ্গে একটি ঘোমটা দেওয়া বউ। আমাদের দেখে বললেন, 'বাবা কোন মায়ের বুকে বাজ হেনে এই বয়সে গেরুয়া পরেছ, যাও বাড়ি ফিরে যাও।' ওদিকে ঘোমটার ভিতর থেকে টসটস করে চোখের জল পড়ছে। আমাদের চোখ ভিজে এল...'[৪৭] দ্বিতীয় সন্ন্যাসপর্ব সুভাষচন্দ্রের উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে। সেই পর্বে সুভাষচন্দ্র সারদানন্দ নাম নিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়।[৪৮] বন্ধুদের কাকে লিখেছিলেন সেই পত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সময়ের নিয়মে অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও সুভাষজননী কৈশোরের চিঠিগুলি আমৃত্যু সংরক্ষণ করেছিলেন। এ বই-এর পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে কিন্তু সুভাষকে লেখা পত্রগুলি সবগুলি বিশেষ করে কমবয়সের 'সুবি' পত্রগুলি আর পাওয়া যায় নি। ১৯২৬ সালের অগাস্টে লেখা পত্রে সম্বোধন করেছিলেন এইভাবে—'কল্যাণীয় প্রাণাধিক সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজিবেষু', মা জননীর এই

প্রার্থনা ঈশ্বর রেখেছেন। যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে ততদিন বিশ্বের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু চিরআসীন থাকবেন। নানা কমিটি-কমিশন করেও তাঁর 'মৃত্যু'র দিনক্ষণ গ্রহণযোগ্য হয়নি জাতির কাছে।[৪৯]

ফিরে যাই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়াতে। ইতিপূর্বেও কটকে তিনি মাঝে মধ্যে সেবাকার্য করতে বেপাত্তা হয়ে যেতেন বাড়ির লোকজনকে না জানিয়ে,[৫০] ঠিক কবে কখন কোন বেশে গৃহত্যাগ করে হাওড়া স্টেশন থেকে উত্তর ভারতের পথে গিয়েছিলেন তার বিস্তারিত প্রামাণ্যতথ্য পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যায় গন্তব্যে পৌঁছেই হয়তো তিনি গেরুয়া বসন ধারণ করেছিলেন। হেমন্তকুমারের স্মৃতিকথায় জানা যাচ্ছে হরিদ্বারের গঙ্গার ধারের নিকটবর্তী ধর্মশালার পথেই পরিকল্পনামত সুভাষের সঙ্গে তাঁর দেখা। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ, লছমন ঝোলা হয়ে আবার হরিদ্বার। সেখান থেকে দিল্লি। 'দিল্লি ছেড়ে গেরুয়া প'রে মথুরা বৃন্দাবন দেখতে চললাম।'[৫১] কাশী, দিল্লি, আগ্রা, বারাণসী সারনাথ, গয়া এই তীর্থযাত্রা পথে বারণসীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ) সুভাষচন্দ্রকে চিনতে পারেন কারণ তিনি জানকীনাথ বসুকেও ভালো চিনতেন। অনেক যত্ন ও উপদেশ তিনি সুভাষদের দিয়েছিলেন। এদিকে বসু পরিবারে সুভাষচন্দ্রের এই নিখোঁজ কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। হেমন্তকে লেখা এক পত্রে জানা যায় সুভাষজননীর উৎকণ্ঠার কথা—'নানা স্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা Active ছিলেন বাবা passive, কতকটা যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ করান হয় না, একজন পুলিশ কর্মচারী relative বারণ করেছিলেন। মা পাগল প্রায়—আমি বাড়ি ছাড়িয়া যাইব—তাই অগত্যা এক মামা (আমেরিকা প্রত্যাগত) চলিলেন, আমার অনুসন্ধানে বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পঁহুছিয়াছে—তাহার মর্ম শুনিয়াছি। বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা।' বেলুড়ে খোঁজ করা হইয়াছিল—হরিদ্বার Ramkrishna Mission এ wire করা হইয়াছিল—negative reply. Howrahর একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছিল—তিনি বলেন ফিরিয়া আসিবে ১৯/২০ দিনের ভিতর—ভালো আছে একলা নাই—সঙ্গে দুইজন আছে। উত্তর পশ্চিমে 'ব' দিয়া কোন স্থানে আছে, তখন বোধ হয় আমরা বারাণসীতে। তিনি আরও বলেন contrary influence-এর জন্য সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না —সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় লাঠি! তিনি কচুপোড়া জানেন!...'[৫২]

অন্যদিকে হেমন্তকুমার সেই পরিস্থিতিতে একঝলক তাঁর ও সুভাষের বাবা মায়ের প্রতিক্রিয়া লিখেছেন —'সুভাষের নামে বাড়ি থেকে পুলিশে হুলিয়া করা হয়েছিল। গণক দিয়ে গণনা করা হয়েছিল। সে পশ্চিমে কোথাও আছে এবং সঙ্গে আরও দুজন আছে—সন্ন্যাসে বাধা আছে। নিশ্চয়ই ফিরবে। বাড়ি ফিরতেই বাবা আলিঙ্গন দিয়ে ছেলেকে টেনে নিলেন—মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছেলের নিষ্ঠুরতার কথা বললেন। আর আমি ছিলাম—'লা-ওয়ারিশ'—বাড়ি থেকে গেলাম কি এলাম, সে খবর বড় একটা কেউ রাখতো না। সন্ন্যাস জীবনের এইখানেই আমাদের ফুলিস্টপ হল।...'[৫৩]

সুভাষের অগোচরেই কী সেই আত্মীয় যিনি পুলিশে চাকরি করতেন তিনি 'হুলিয়া' জারি করেছিলেন। এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনো স্মৃতিকথায় আলোচনা পাইনি। ইতিহাস নিরুত্তর। তবে সন্ন্যাস থেকে কলকাতায় ফিরে এলগিন রোডের সেই পিতৃগৃহ থেকে হেমন্তকে ১৯ জুলাই ১৯১৪ সাল, বৃহস্পতিবার বিকেল বেলায় চিঠি লেখেন—'ট্রাম হইতে নামিয়া বুক টান করিয়া বাড়িতে ঢুকিলাম। সত্যেন মামা ও একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তারা একটু আশ্চর্য হইল। ভিতরে পিসে মহাশয় দাদা, প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। মা'র কাছে খবর গেল। অর্দ্ধেক পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। প্রণাম করিলাম—তিনি

দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এইমাত্র বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম। আমি এতক্ষণ থাকিতাম না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম, কেবল পরি নাই মেয়েদের জন্য।' আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনিও প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন...'[৫৪]
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার দীর্ঘ আলোচনা হয় সন্ন্যাস, সংসার, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নিয়ে '...আমি বলিলাম, বিবেকানন্দের ideal হলে আমার ideal, শেষে বলিলেন, আচ্ছা যখন তোমার higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব। আমি এতদিন বাবাকে active oppose করি নাই—passive I have won the victory এখন তিনি জোর করিয়া কিছু বলিতে পারেন না এবং next time চলিয়া গেলে বোধহয় ফিরাইবার চেষ্টা ও সংকল্প পরিত্যাগ করিবেন। যাহা হউক আসাতে ভালো হইয়াছে এখন দেখিতেছি। মা fanatic, বলেন, আর যদি ও যায় আমি আর থাকিব না—সঙ্গে সঙ্গে যাইব আর ফিরিব না। তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়, বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable...'[৫৫]

সুভাষচন্দ্রের প্রতি মাজননীর এই বিশেষ টান সুভাষচন্দ্রকে অনেক মর্ম যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছিল তাঁর অনুচ্চারিত অনেক কথায় ও ভাবে। তিনদিন পর অর্থাৎ রবিবার ২১ জুলাই ১৯১৪ এর রাতে হেমন্তকে লেখা একটি পত্রাংশ—'...জানি না আমি বাপ-মার জন্য মোটেই feel করি না—তাঁরা কাঁদিলেন আমি হাসিলাম—কি করিব—এ সত্য কথা। হৃদয়ে একটুও ভালোবাসা নাই—থাকিত যদি তাহা হইলে তোমায় বাসিয়া ধন্য হইতাম। বাবার সঙ্গে আজ কথা হইল—তিনি ৩টা উপদেশ দিলেন... তাঁর চেষ্টা আমাকে সংসারধর্মী করা—আমি আজ কিছু বলিলাম না—Passive Silence--implying non-sub mission পরে ইচ্ছা হয় তাঁকে পুনরায় আরও খুলিয়া বলিব। মাকে বোঝান যায় না—মা আমার উপর অসন্তুষ্ট—মনে করেন যে আমি তাঁকে তৃণজ্ঞান করি। তাঁরা আজ রাঁচি গিয়াছেন—ফিরিলে সব বলিব মনে করিয়াছি। সাধারণ মানুষ মাতৃস্নেহকে সর্বাপেক্ষা গভীর ও স্বার্থহীন ভালোবাসা বলিয়া মনে করে বলে—'অতলস্পর্শ মাতৃস্নেহ-পারাবার।'... আমি কিন্তু মাতৃস্নেহকে অত উচ্চস্থান দিই না—। মাতৃস্নেহ কি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ স্বার্থহীন? জানি না যাহা হউক মা যতক্ষণ পথের একটি বালকের সঙ্গে নিজ পুত্রের সমতা না করেন ততক্ষণ সে প্রেম কি স্বার্থহীন? নিজে পালন করিয়াছেন বলিয়া মমতা হয়। একটা পাখি পুষিলে কত মমতা মায়া হয়—তার নিজের সন্তানের ত কথা নাই।... এ জীবনে যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছি—আমি যে প্রেমসাগরে ভাসিতেছি—তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোস্পদ সমান। এ স্বার্থপরতাময় জগতে মানুষে একমাত্র মাতৃস্নেহ খুঁজিয়া পায় তাই তারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। নিজের পালিত জিনিসে সকলের ভালোবাসা জন্মাতে পারে—তাতে বাহাদুরী কি? কিন্তু পথের একটা লোককে হৃদয়ের রাজা করিতে পারে তাহার হৃদয় কত মহান তাহার ভালোবাসা কত উচ্চ—বুঝালেও একথা কেহ বুঝিবে না।...'[৫৬]

অনেক অভিমানে সন্ন্যাসের কঠোরতায় সুভাষ একান্তে একথাগুলি লিখেছেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু হেমন্তকে। মনের কথা উজাড় করেছেন সেদিন। অনুমান করা যায় এলগিন রোডের ওই বাড়িতে সেদিনও হেমন্তকে কেন্দ্র করেই সুভাষের সঙ্গে তাঁর অভিভাবকদের বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। সুভাষের অতীব বন্ধুপ্রীতি কী ঘরের বন্ধন ক্রমশ আলগা করে দিচ্ছিল? ভাষান্তরে বলা যায় যে বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশার ফলে সুভাষচন্দ্র মথুরা বৃন্দাবন, গয়াকাশী বাড়ির অজ্ঞাতে অর্ন্তহিত হওয়া, দেশ দশ, সমাজ, সন্ন্যাস ইত্যাদি নিয়ে বড়দের চোখে হঠাৎ 'বড়' হয়ে যায়। তাঁর প্রতি বসু বাড়ি প্রায় সামগ্রিকভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না বলাই বাহুল্য এ নিয়ে তাঁর দাদাদের প্রতিও অভিমান ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে সেই বিদ্রোহীমনা সুভাষের মনে। সেই সময় একমাত্র হেমন্তকেই কিছু কিছু কথা জানিয়েছিলেন সন্ন্যাস যাত্রার কথা নিয়ে তা বোঝা যায় কোনো কোনো চিঠির

অংশ থেকে। কঠিন অনিয়মে সুভাষচন্দ্র বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। টাইফয়েড আক্রান্ত সুভাষকে নিয়ে বাড়িতে কী পরিমাণ অশান্তি হয়েছিল তা হেমন্তকে লেখা একাধিক পত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

'...এ ডাক্তারের advice গ্রাহ্য করিনা... মেজদার সঙ্গে কি নিয়া বচসা হইল তা প্রায় মনে নাই... তিনি বুঝিলেন he has caught a tarter in me—বলিলাম যতদিন তোমাদের কাছে আছি—ততদিন তোমরা এ ক্ষমতাটা ব্যবহার করবে কিন্তু তোমাদের কাছে থাকছিনা।' আমার শরীরের কথা বলিলেন, বলিলাম তার জন্য আর কেহ দায়ী নহে—আমি দায়ী এবং আমি ভুগিব—আর কেহ ভুগিবে না—তোমার কিছু বলিবার নাই' আমি ত ভয়ানক চোটে গেছলাম—রাগে কাঁপিতেছিলাম—প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে মনটাকে ঠাণ্ডা করলাম।'[৫৭]

হেমন্তসঙ্গকে কেন্দ্র করে সুভাষ পরিবারে বেশ দীর্ঘ কয়েক মাস অশান্তি রাগারাগি চলেছিল অভিভাবক, দাদা ও মামাদের সঙ্গে তার কিছু নমুনা সুভাষচন্দ্রের চিঠিগুলি থেকে পাওয়া যায়। সেই সময় সুভাষজননীর মনোজগত কতটা বেদনাময় ছিল তা অনুমান করা যায়—

'একটা বড় interesting ব্যাপার হয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যার পর আমি ইচ্ছাপূর্বক ঐ চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে আসি—যাহাতে ওরা পড়ে এবং কিছু শিক্ষা পায়। কাল রাত্রে সকলে যখন খাবার পর ঐ ঘরে একত্র তখন চিঠিটা তাহাদের সকলের সম্মুখে খোলা এবং পড়া হয়। আমি উপরে ছিলাম—গোলমাল শুনিয়া কান পাতিলাম। শুনিলাম ঐ বিষয়ে discussion হচ্ছে। discussion বড়ই violent—সকলেই একেবারে ক্রোধান্বিত যে এরূপভাবে গাল দেওয়া হয়েছে। শুনিলাম—তাহারা বলিতেছিল আমরা এমন কি করেছি—যাহার জন্য এরূপভাবে গাল দেওয়া হইবে। ইহাদের মধ্যে সুরেশদা ও সত্যেন বেশি violent—মেজদা more sober, আর সকলে less violent—অল্পাধিক। রণেন দুঃখিত যে তাহাদের জন্য সে বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিগণিত হয়েছে। সে বলিতেছিল চিঠি খোলবার দরকার কি ছিল। আমার কাছে কিন্তু এসে কেউ একটি কথা বলে নাই। মেজদা বুঝি চিঠিটা রেখেছেন।

তাহারা যখন violence এর highest Pitch এ তখন শুনিলাম মেজদা বলছেন 'হেমন্ত রবিবারে আসুক হেমন্তকে দেখিব।' তারপর মেজদা তাহাদিগকে আরও sober হইতে বলিলেন, তখন তাহারা চুপচাপ করিয়া উপরে আসিল।[৫৮]

ওই চিঠির পরবর্তী অংশে মধ্যাহ্নে সুভাষ সুহৃদ হেমন্তের সম্মান রক্ষায় তৎপর, ১৭ বছরের সুভাষ হেমন্তকে লিখেছেন—'আমি জানি যদি কেহ তোমার সঙ্গে কোন বিষয়ে তর্ক করিতে আসে তাহা হইলে কিছুতেই তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে না। আর এ দেহে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আছে ততক্ষণ কেহ অন্যায় করিয়া পার পাবে না—তাহার জন্য গৃহত্যাগও করিতে বলে—সে ত কত আনন্দের কথা। আমি কাল প্রতিজ্ঞা করিলাম—I shall see how I can defend my—, যদি দরকার হয়। আমি অনুমান করিতে পারি সেদিন একটু বচসা হতে পারে—দাদা ভদ্রতা করে বলবে। আমার নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং হৃদয়ে অনন্ত শক্তি দরকার যাহাতে একা আমি বাড়িতে সকলের সঙ্গে লড়িতে পারি। তবে আমার আত্মশক্তি বেশি—এই জন্য যে তাহাদের আমি তিলমাত্র care করি না—'so long I was a Sanyasi in disguise-- now I am going to be a full- flelged Sanyasi'—এই বলিয়া গৃহত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব আনন্দের সহিত।[৫৯]

বাড়ির তীব্র অভিঘাতই কি সুভাষজীবনে একলা চলা পথের পথিক হতে অবচেতনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল? এ নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা হতেই পারে। ওই চিঠির শেষ অংশেও সুভাষজননীর কোনো ভূমিকা বা অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও সম্মুখ সমরে সুভাষ যে প্রস্তুত তা দেখার মত—

'তুমি রবিবার এখানে এগারোটা বারটার মধ্যে আসিও। আমি নীচে তার পূর্ব থেকেই তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিব। ভাবিবার কিছু দরকার নাই। যাহা করিবার বা বলিবার আমি করিব। I would have setted up the matter myself কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাকে একটি কথাও কেহ বলিতে আসে নাই। সেদিন আসিলে দেখিয়া লইব। কিছুক্ষণ পরে আমি তোমার সঙ্গে মেসে যাইব—কারণ অনেকদিন যাওয়া হয় নাই—যাইতে বড় ইচ্ছা করে। এ ঘটনার বিষয় কাহাকেও বলিও না—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। (মেজদা বলিতেছিলেন 'যাহারা এত ক্রোধের বশীভূত তাহাদের spiritual culture কি হয় বুঝি না।') আমার সম্মুখে বলিলে বুঝিয়ে দিতাম anger এর resentment এর ভিতর তফাৎ থাকে।...'[৬০]

সুভাষজননী প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে এই তীব্র মানসিক আঘাত এক ১৭ বছরের ছাত্রকে কীভাবে তোলপাড় করেছিল এবং ন্যায়ের পক্ষে তাঁর অদম্য প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। অনেক ভাইবোনেদের মধ্যে বিশেষ করে কনিষ্ঠদের ওপর বড়দের অযাচিত কর্তৃত্ব কখনও কখনও কত সুন্দর সম্পর্ককে সাময়িক হলেও তিক্ত করে তোলে তা সুভাষজীবনে সাংঘাতিকভাবে সত্য রূপে এক সময় দেখা দিয়েছিল। নেতাজি চরিত্র অনুধাবন করতে গেলে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে ঘরে বাইরে তীব্র সংঘাত এবং স্বাধীনতা সত্যের প্রতি অনুরাগের এ অধ্যায়কে অস্বীকার করা যাবে না। এই সময়কার কোনো পত্রেই প্রভাবতী দেবীর সক্রিয় ভূমিকার উল্লেখ কোথাও পাওয়া না গেলেও সুভাষহৃদয়ে হয়তো মাতৃদেবী ও মাতৃস্নেহ নিয়ে কিঞ্চিৎ উষ্মা বা অভিমান হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই ওটেন প্রহার পর্বের কোনো পর্যায়েই সুভাষচন্দ্র সক্রিয় ছিলেন না বলে জানা গেলেও সুভাষচন্দ্র জানতেন এবং দেখতে পেয়েছিলেন কারা কারা ভারতবিদ্বেষী শিক্ষক ওটেন নিগ্রহে ছিলেন। কিন্তু ছাত্রনেতার দায়িত্ব নিয়ে তিনি তদন্ত কমিশনের সামনে সেইসব ছাত্রদের নাম বলেন নি। ঘটনাচক্রে ওই ঘটনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মামা রণেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন।[৬১] তাঁকেও বাঁচিয়ে ছিলেন সুভাষ। এ নিয়ে পরবর্তীকালে পিতৃদেব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে জানা যায়। নির্দোষ সুভাষকে কলকাতা ছেড়ে আবার কটকে কিছুদিনের জন্য চলে যেতে হয়। জানকীনাথ বসু অনুমান করেছিলেন সুভাষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে এমন ভাবনার কারণে।[৬২] কটকে সুভাষচন্দ্র আবারও দেশ-দশ ও সমাজ সেবায় নিজেকে অর্পণ করেন। কলেরা রুগীদের সেবা থেকে সাময়িক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও শুরু করেন সুভাষ। কারোর সুপারিশ ছাড়াই কলেজে ভর্তির চেষ্টা করেন ও সফল হন।[৬৩]

প্রায় এক বছর পর স্কটিশচার্চ কলেজে পুনরায় পড়াশুনোয় মন দেন সুভাষ। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ই গরীবদের প্রতি তাঁর অসম্ভব মায়ামমতা লক্ষ্য করা যায়। ট্রামলাইন থেকে এলগিন রোডের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় গরীব দুঃখী ভিখারি থাকলে ট্রামভাড়া দিয়ে দিতেন। কলেজে মাঝে মাঝে পৌঁছতে দেরী হয়ে যেত কারণ সেই সময় সুভাষ পায়ে হেঁটে কলেজে যেতেন। এ নিয়ে সুভাষের সহপাঠীরা যথেষ্ট সহমর্মী ছিলেন বলে জানা যায়।[৬৪] উল্লেখ্য ম্যাট্রিকে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ২০টাকা জলপানি বা বৃত্তি পেতেন বলে জানা যায়।[৬৫]

উল্লেখ্য সুভাষচন্দ্রের থেকে তিন বছরের বড় মামা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—'কটকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বলে একটা আশ্রম করেছিল সুভাষ তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে।'[৬৬]

সুভাষচন্দ্রকে বিলেতে আইসিএস হবার জন্য যে পাঠানো হয়েছিল তার নেপথ্যে অবশ্যই ছিল ছাত্র সুভাষের স্বদেশ চেতনা। যে চেতনায় তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল উৎস ইংল্যান্ডকে কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ অধীনে চাকরি না করার দুরন্ত স্পর্ধা ভারতীয় যুবসমাজের কাছে পৌঁছে দিতে

চেয়েছিলেন। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ভাববার অবকাশ দিয়েছিলেন জানকীনাথ। সুভাষ তার 'দলে'র সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছিলেন নিতান্ত অনাগ্রহ কারণ ইতিপূর্বে দু'জন পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন আইসিএস এর চাকরির ফাঁদে।[৬৭]

'...ইংলন্ডে আমার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর আমি জাহাজে রওনা হলাম।[৬৮]

উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক ট্রেনিং গ্রহণের সময় ফোর্ট উইলিয়ামে তিনি রীতিমত কুচকাওয়াজ ও বন্দুক চালনায় অত্যন্ত দক্ষতা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৬৯] তাঁর সামরিক শিক্ষা প্রসঙ্গে একজায়গায় লিখেছেন—'দুই মাস পরে যখন আমরা কোর্টের কাছে চলে গেলাম, সামরিক পোষাক পরলাম, এবং তাঁবু গেড়ে রাইফেল নিয়ে কুচকাওয়াজ করতে শুরু করলাম, তখন সমগ্র রূপটি বদলে গেল। চারমাস আমরা শিবিরজীবন যাপন করেছিলাম এবং বিশেষ উপভোগ করেছিলাম। এর মধ্যে কিছুদিন কলকাতা থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে বেলঘরিয়ায় কাটিয়েছিলাম, যেখানে রাইফেলের পাল্লায় আমরা বন্দুক চালনা অভ্যাস করেছিলাম। সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে সৈন্যবাহিনীর একদল ব্রিটিশ অফিসারের হুকুম তামিল করা—কি পরিবর্তন!...

আমরা প্রথম যেদিন আমাদের রাইফেল আনবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর মার্চ করে ঢুকলাম, সেদিন অদ্ভুত এক ধরনের তৃপ্তিবোধ আমাদের হয়েছিল, যেন আমরা এমন একটা কিছুর দখল নিচ্ছি, যাতে আমাদের একটা জন্মগত অধিকার আছে, অথচ যা থেকে আমাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। শহরে ও অন্যত্র রুটমার্চগুলি উপভোগ করতাম, সম্ভবত এই কারণে যে ইহা আমাদের একটা মর্যাদাবোধ দিয়েছিল। পুলিশ ও গভর্নমেন্টের যেসব অনুচরের দ্বারা হয়রান বা সন্ত্রস্ত হওয়া আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাদের আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারতাম।...'[৭০]

অসাধারণ বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার এই আলো নিয়েই খোদ ব্রিটিশের দেশের রাজধানী লন্ডনে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। হৃদয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভঘৃণার পাশাপাশি তাঁদের দেওয়া চাকরি করতেন না, এমনটা জানা যায় পরবর্তী কালের নানা চিঠিপত্রে। যদিও সুভাষকে লেখা চিঠিগুলি সে সময় সংরক্ষিত সম্ভব না হলেও বন্ধু ও বাড়িতে লেখা অনেক চিঠিই আজ প্রকাশিত। বন্ধু হেমন্তকে লেখা পত্রেও জানা যাচ্ছে চাকরি পেলে তিনি ব্রিটিশ অধীনে চাকরি নেবেন না। ১৯১৯ এর ১৫ সেপ্টেম্বর সিটি অব ক্যালকাটা জাহাজে চেপে 'ভাগ্যপরীক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে'[৭১] পাড়ি জমালেন ইংল্যান্ডে। পৌঁছে গেলেন ২৫ অক্টোবর।[৭২] বিভিন্ন বিষয়ে গভীর অধ্যায়নের পাশাপাশি সে দেশের ভারতীয়দের কাছ থেকে বুঝতে মাঝেমধ্যে ভারতীয় মজলিস ও ইউনিয়ন সোসাইটির সভাগুলিতে যোগদান করতেন।[৭৩] সে সময় অনেক খেটে ছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনকে জানিয়েছিলেন নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে স্থান পাবার আশা কম। তিনি একরাতে হঠাৎই এক বন্ধুর থেকে তার পান—'অভিনন্দন জানাচ্ছি, মর্ণিং পোস্ট দেখ'... পরদিন সকালে যখন মর্ণিং পোস্টের একটা সংখ্যা পেলাম তখন দেখলাম যে আমি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি। আমি আনন্দিত হলাম। তৎক্ষণাৎ দেশে একটা তার পাঠিয়ে দিলাম। এবার আমার সামনে আর এক সমস্যা দেখা দিল। এই চাকরি নিয়ে আমি কি করব?..'[৭৪] এই সময় সুভাষজীবনে আরো একবার ঝড় এসেছিল। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন যে এই চাকরি নিয়ে তিনি কী করবেন? তাঁর সমস্ত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা আদর্শ বিসর্জন দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সুখী গৃহকোণ আর নিশ্চিত জীবন তাঁর জন্য নয় একথা তাঁর আত্মজীবনী ও নিকট বন্ধু চারু গাঙ্গুলীকে লেখা পত্রেও স্পষ্ট। মনস্থির করতে তার দীর্ঘ সাত মাস সময় লেগেছিল। একদিকে আত্মীয়স্বজনদের ভাবনা আর অন্যদিকে বাস্তববাদী প্রশ্ন ছিল—'... দ্বিতীয়ত, উত্তেজনার ঝোঁকে যদি এখন আমি পদত্যাগ করি তাহলে

ভবিষ্যতে আমার কাজের জন্য দুঃখ করবার কোনো কারণ ঘটবে কি? আমি যে ঠিক কাজ করছি এ সম্বন্ধে আমি কি একেবারে সুনিশ্চিত?[৭৫] তাঁর এই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর তিনি যথাসময়ে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে সিভিল সার্ভিসের চাকুরি গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং প্যানেলে অপেক্ষারত জনৈক ভারতীয় সেই চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন যিনি তাঁর স্মৃতিচারণে লিপিবদ্ধও করে গেছেন।[৭৬]

সুভাষচন্দ্র তাঁর অন্তর্জগতে সেই দুর্যোগের সময় মেজদা শরৎবসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন। এথেন্স থেকে ১৯২০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর লিখলেন—'আপনার অভিনন্দন সূচক চিঠি পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। জানিনা আইসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আমার তেমন কি লাভ হয়েছে, কিন্তু এই খবরে যে সকলে খুশী হয়েছেন এবং বিশেষতঃ বাবা ও মায়ের মন এই দুর্দিনে যে একটু হালকা হয়েছে এতেই আমার আনন্দ।'[৭৭]

নেতাজিকে জানার জন্য, তাঁর মা বাবাকে বোঝবার জন্য জীবনের সন্ধিক্ষণে সুভাষমননের অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছে তার হৃদয়মন্থন করা লেখায়—

'সন্দেহবাদী লোকে বলবে যে চাকরীর প্রশস্ত কোলে একবার স্থান করে নেবার পর আমার সমস্ত তেজ উঠে যাবে। কিন্তু এই ক্ষয়কারী প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়তে দেব না। এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি বিবাহ করব না, অতএব যা আমি সত্য বুঝব তা পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হয়ে থাকতে হবে না।[৭৮]

তাঁর পদত্যাগের বিস্ফোরক চিঠি বসু পরিবারে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল। তিনি বাবার 'সম্মতিভিক্ষা' করে আলাদাভাবে চিঠি লিখেছিলেন, মেজদাকে লেখা একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন—'দরিদ্র ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করে বাবা-মা'র কাছে চিঠি লিখেছি। এই পথে, ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে এই চিন্তায় তাঁরা হয়তো আকুল হবেন। আমি নিজে দুঃখ-ক্লেশের ভয় করি না, সেদিন যদি আসেই দুঃখ থেকে সরে আসবার চেষ্টা না করে অগ্রসর হয়ে তাকে গ্রহণ করব।'[৭৯]

অসমাপ্ত আত্মজীবনী মূলত এই পর্বেই শেষ করতে পেরেছিলেন সুভাষচন্দ্র অল্পকিছু সময়ের মধ্যে। তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন ক্লান্তিকর সিভিল সার্ভিসের চাকুরি থেকে সাংবাদিকতার জীবন অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে করেন।[৮০] এ বিষয়ে ইতিপূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকেও পত্র দিয়েছিলেন। কেমব্রিজ থেকে বন্ধু ও সতীর্থ চারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে এক সংক্ষিপ্ত পত্রে তাঁর মনের ছবি ধরা পড়েছে—(২২ এপ্রিল, ১৯২১)

'ভাই চারু,

তুমি জান কর্তব্যের আহ্বানে একবার জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সেই তরী এখন রম্যকাননে উপনীত হয়েছে যেখানে Power, Prosperity, wealth করতলগত। কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সাড়া আসছে —'তোমার এতে আনন্দ নাই। তোমার একমাত্র আনন্দ সাগরের ঊর্মিমালার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ানো।'

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ তাঁরই হাতে জীবনতরী ভাসিয়ে দিলাম। তিনি জানেন, এ তরী কোথায় পৌঁছবে। কি করব এখনও ঠিক করতে পারিনি। একবার ইচ্ছা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো। একবার ইচ্ছা হচ্ছে বোলপুরে যাব। আবার ইচ্ছা হচ্ছে সাংবাদিক হব। দেখা যাক কি হয়। ইতি—

তোমার সুভাষ

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্গত সন্ন্যাস সুভাষসুহৃদদের লেখা পত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কারণ প্রভাবতী দেবী স্বয়ং ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ সঙ্গে জানকীনাথ বসুও। তিনি ওই সময়ই লিখেছিলেন—'আমাকে সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও চটি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামে অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখন পূর্বের ন্যায় গৌরব অনুভব করি।[৮১] দিলীপ রায়কে লেখা পত্রেই সুভাষ লিখেছেন দ্বিতীয়ত আমি কাহাকেও

বলি নাই আইসিএস পাশ করিয়া বাংলাদেশে ফিরিব না।'[৮২] আবার লন্ডনে সতীর্থ দিলীপ রায়কে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—'ভাবছি, আমি এখন ফিরে যাব কেমন করে? এর উপর বাবার কাছে আর এখন জাহাজের ভাড়া চাইতে পারি না।' দিলীপ কুমার রায় জাহাজের ভাড়া ধার দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য এই সময় সুভাষের পদত্যাগ-এর সংবাদ শুনে নাকি পিতৃদেব অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানানো হয় পরিবার সূত্রে।[৮৩]

উল্লেখ্য এই সময় তাঁর মেজদিদি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।[৮৪] সুভাষজননী তাঁর অত্যন্ত স্নেহের সুভাষের চলার পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াননি তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময়ের একটি পত্রে—'মায়ের একটা চিঠি পেয়েছি যাতে তিনি লিখেছেন, বাবা বা অন্যেরা যাই ভাবুক না কেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে তাঁর আস্থা আছে। এই রকম একটা চিঠি পেয়ে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি, আপনাকে বোঝাতে পারব না। এটি আমার কাছে একটি স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে, কারণ এটি আমার মন থেকে একটি ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছে।[৮৫] বাবাকে আশ্বস্ত করার কথা একটি চিঠিও এই সময় পাওয়া যায় মেজদাকে লেখা পত্রে—'... দেশে ফেরার অব্যবহিত পরেই আমি শিক্ষকতা করতে পারি, কিন্তু স্থায়ী পেশা হিসাবে সাংবাদিকতাই আমার পছন্দ। আমার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করতে তা সাহায্য করবে। যদি কোন কারণে, পদত্যাগের ব্যাপারে আমার মতের পরিবর্তন হয়, বাবাকে টেলিগ্রাম করে জানাব। তাতে তাঁর দুশ্চিন্তা লাঘব হবে।[৮৬]

ত্যাগ সেবা এবং ধর্মীয় নানা অনুশাসন প্রভাবতী দেবীর ভিতর সঞ্চারিত হয়েছিল দীক্ষা গ্রহণের আগে থেকেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। এই সময়ের কিছু পরেই সুভাষজীবনে কারাজীবনের ঝড় আসে, তখন তাঁর পিতৃদেব জানকীনাথ বসুর এক আশীর্বাদপত্র পাওয়া যায়—

'শ্রীমান সুভাষের ন্যায় পুত্র পাইয়া আমরা গর্বিত। স্বার্থত্যাগের সুফল সম্বন্ধে আমার গভীর আস্থা আছে। সে যে কারাগারে যাইবে, ইহা আমি প্রতিদিনই আশা করিতেছিলাম। তোমাদের জননী এই ঘটনায় একটুও বিচলিত হন নাই। তিনি মনে করেন, এই রূপ স্বার্থত্যাগের দ্বারাই পরিণামে স্বরাজ লাভ হইবে। প্রিয় সুভাষকে আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইবে।'[৮৭]

প্রভাবতী দেবীর বোন ও সুভাষচন্দ্রের মাসীমা নিশাবতী দেবী তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন আইসিএস ছাড়ার সময় সুভাষজননীর মানসিক অবস্থা—'সমস্ত সংসারটা আমার দিদিকেই চালাতে হত। জামাইবাবু শুধু টাকা রোজগার করে দিদির হাতে দিতেন। দিদিকেই আর সব করতে হত। সব ছেলেগুলোকে দিদিই মানুষ করেছেন। বাড়িতে যেসমস্ত মাস্টারমশাই ছেলেদের পড়াতেন দিদিই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। নিজে পড়াশুনো বেশিদূর করেন নি কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন। প্রতিদিন বিকেলে বেড়িয়ে এসে আড়াল থেকে শুনতেন মাস্টারমশাইরা কিরকম পড়াচ্ছেন। আবার দিদি খুব কঠোর প্রকৃতিরও ছিলেন। ...মনে পড়ছে সুভাষ যখন I.C.S. ছেড়ে দেবে বিলেত থেকে খবর এল তখন সবাই ভেবেছিল দিদি বুঝি খুব কষ্ট পাবে ব্যাথা পাবে। অমন ভালো চাকরী তো আর হয় না। কিন্তু সেই সময় আমার দিদি হেসে বলেছিলেন : 'আমার আটটা ছেলে। একটা না হয় দেশের কাজই করল।' আমার শুধু মনে হয় আমার দিদি অমন মহীয়সী ছিলেন বলেই সুভাষের মত অমন ছেলে তার গর্ভে এসেছিল। আমার জামাইবাবুও অসাধারণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব গম্ভীর এবং ঠান্ডা প্রকৃতির এবং স্বল্পভাষী ছিলেন। সুভাষ বাবার কাছ থেকে এসমস্ত গুণগুলো পেয়েছিল।...'[৮৮]

সেযুগে নারীশিক্ষার এত চল ছিল না। বাংলা লিখতে পারতেন প্রভাবতী দেবী, ইংরাজিও কিছু কিছু বুঝতে পারতেন এবং সেলাই জানতেন বলে জানা যায়। সুভাষচন্দ্রের সিভিল সার্ভিস পদত্যাগ ও প্রথম গ্রেপ্তারের ব্যবধান কিছু মাসের। জানা যায় এলগিন রোডের বাড়িটি ১৯০৯ তে সম্পূর্ণ করে জানকীনাথ বসু এবং পাশের

প্রায় লাগোয়া ৩৮/১ বাড়িটি জানকীনাথ বসুর 'সিনিয়ার' ও অতি ঘনিষ্ঠ জে এন সরকারের বাড়ি ছিল। দুই বাড়ি প্রায় একই হয়ে উঠেছিল। ১৯২৭ সালে ১ নং উডবার্ন পার্কের বাড়ি শরৎ বসু তৈরির আগে পর্যন্ত বেশ কিছুকাল ওই 'অ্যানেক্স' বিল্ডিংয়ে ভাড়া থাকতেন সপরিবারে শরৎ বসু। পাশের ওই বাড়ি থেকেই প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুভাষ বসু।[৮৯] দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ওই ঐতিহ্যবাহী বাড়িটিকে আশির দশকে ভেঙে ফেলে প্রমোটিং করা হয়। বহুদিন সুভাষচন্দ্রও ওই বাড়িতে থাকতেন। নেতাজির এই মাসীমার স্মৃতিতে উঠে এসেছে বৃহত্তর বসু বাড়িতে তাঁর দিদির ভূমিকা—'আমার বাবার নাম ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত, মায়ের নাম ৺বিশ্বেশ্বরী দত্ত। আমি আমার পিতামাতার কনিষ্ঠা কন্যা, আমার দিদি অর্থাৎ সুভাষের মা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী ছিলেন পিতামাতার প্রথমা কন্যা। আমি ছিলাম আমার দিদির কন্যাদের বয়সী। আমার দিদি আমাকে মেয়ের মতই দেখতেন। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের মতনই আমাকে ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন, যত্ন করতেন। তিনি কখনও আমার কথা বা অনুরোধ কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেননি। আমিও আমার দিদিদের যখনই কোন বিপদাপদ হয়েছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। এটা সত্য কথা যে তিনি তাঁর ভাইবোনদের নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। আমার ছোট দু'ভাই ডাঃ সত্যেন্দ্র ও ৺রণেন্দ্র তার কাছে তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই মানুষ হয়েছে। মা মারা যাবার পর অশৌচ অবস্থায় আমার দুইভাইকে নিয়ে দিদি কটকে চলে যায়। বাস্তবিক তাঁর কাছে আমরা সবাই মায়ের মত স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি। সুভাষের কথা বলতে গিয়ে তাই আমার দিদির কথা এত বেশি করে মনে পড়ছে।[৯০]

সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তাঁর মায়ের দয়ালু প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর মাসী নিশাবতী দেবীর ভাষ্যেও উঠে এসেছে সে কথা—'আমার দিদি বড় দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি দান করতেন পরে তা আমরা জেনে ফেলেছি। এছাড়া তাঁর এমনি দান ছিল অনেক। গরমকালে জল-দান, আমদান করতেন। আমরা দেখেছি প্রতি বৎসর পুজোর সময় গরুর গাড়ি বোঝাই করে কোদালিয়ায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে কাপড় পাঠিয়ে দিতেন গরীব-দুঃখীদের জন্য। অমন কোমল প্রকৃতির, অমন দান করতে পারে এমন আমি আর কাউকে দেখিনি।[৯১]

এই স্বভাব সুভাষচন্দ্রের ভিতরে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালেও সুভাষচন্দ্র যেমন অনাথ ছেলেদের জন্য দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন তেমনি আজাদ হিন্দ এর সর্বাধিনায়ক নেতাজি পর্যায়তে অনাথ আশ্রমে তাঁর দানধ্যান ছিল উল্লেখযোগ্য।

সদগুরুর সন্ধানে সুভাষ যখন উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে ফিরে আসেন এলগিন রোডের বাড়িতে, সেসময় জানকীনাথ ও প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল তা যার মর্ম ছিল যে বৃহত্তর ডাক এলে সুভাষকে তাঁরা আটকাবেন না।[৯২]

এ সম্পর্কে নিশাবতী দেবী উল্লেখ করেছেন—'সুভাষকে যখন তারপর বিলেতে আই.সি.এস পড়বার জন্য পাঠান হয় তখন সে দিদি জামাইবাবুর কাছে একটা শর্ত করে যায়। সে বলেছিল, সে তাঁদের (দিদিজামাইবাবুর) অনুরোধে বিলেত যাচ্ছে; কিন্তু যদি পাস করে তবে কিন্তু সে কিছুতেই চাকুরী করবে না। আই.সি.এস.এ সে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। আমার দুই ভাই (দেবেন্দ্র ও রণেন্দ্র) তখন বিলেতে ছিল। ডাঃ আই.পি.বসু (আমার ভাসুর পো) ও বিলাতে ছিলেন। তারা সবাই মিলে খুবই চেষ্টা করেছিল তাকে চাকুরী নেওয়াবার জন্য। কিন্তু কেউ তাকে রাজি করাতে পারেনি।'[৯৩]

নেতাজির মা প্রভাবতী দেবী সারা জীবন নানা দুঃখকষ্ট পেয়ে গেছেন। অসময়ে মা-এর মৃত্যু, পুত্র, কন্যার মৃত্যু, পারিবারিক নানা বিচ্ছেদ, সুভাষচন্দ্রের একেরপর এক কারাবাস, জানকীনাথ বসুর প্রয়াণ, একান্ত স্নেহের সুভাষ এর গৃহত্যাগ তাঁকে পীড়িত করলেও মনের দিক থেকে দৃঢ়তা বজায় রেখে ছিলেন আজীবন।

কলকাতার এলগিন রোডের নির্মিত তাঁর স্বামীর বাড়ি, কটকে, ভুবনেশ্বর, পুরীর বাড়ি (এগুলিও জানকীনাথ বসুর তৈরি) এবং জানকীনাথের পৈতৃক ভিটা কোদালিয়া ছাড়া আর অন্য কোথাও বসবাস করেছেন কিনা জানা যায় না। রাঁচিতে স্বজনের বাড়িতে কিংবা হিমাইতপুরে গুরুদেবের নিবাসে যেতেন। কাশ্মীরেও বেড়াতে গেছেন জানকীনাথ বসুর সঙ্গে। শেষ জীবনে ছিলেন সুভাষের সঙ্গে এলগিন রোডের বাড়িতে। যেখানে অবশ্য আরো চার পুত্র সপরিবারে একসঙ্গেই থাকতেন। তবে শরৎ বসু নির্মিত উডবার্ন পার্ক, রিষড়া, কার্শিয়াং কিংবা বারারি বা অন্যান্য জায়গায় থেকেছেন কিনা তার প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না তবে শিলং এর ক্যাসেল লজে সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বসুর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাজননী ছিলেন বলে গীতা বসুর একটি স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে।[৯৪]

১৯২৭ সালে শিলং এ জানকীনাথ এর গ্রুপ ছবি থাকলেও প্রভাবতী দেবীকে দেখতে পাওয়া যায় না।

১৯৩৮ সালে হরিপুরাতে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে প্রভাবতী দেবী গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৯৫]

১৯৩৮ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল সেখানকার নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বে থাকা লতিকা ঘোষ আর্জি জানিয়ে ছিলেন মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের সাম্মানিক সভাপতির পদে প্রভাবতী দেবীর নাম। উল্লেখ্য লতিকা দেবী ছিলেন সংঘের সম্পাদিকা।[৯৬]

প্রভাবতী দেবীর আত্মমর্যাদাবোধ, মমত্ব বোধ ও সার্বিক মূল্যবোধ অধিকাংশ পুত্রকন্যা ও পুত্রবধূদের কমবেশি প্রভাবিত করেছিল অনুমান করা যায়। সুভাষের প্রতি প্রভাবতী দেবীর বিশেষ স্নেহ থাকার অন্যতম কারণ তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার আলোকে একটা মানসিক নৈকট্য তৈরি হয়েছিল। প্রভাবতী দেবীর সর্বদাই ভাবনা ছিল সুভাষ এমনিতেই সংসার বিবাগী মানব দরদি দেশপ্রেমিক তার ওপর অনেক দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে। সে যদি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে তাহলে তিনিও অসহায় হয়ে পড়বেন। শরৎ বসু সপরিবারে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে। সেখানে মেজ ছেলের পরিবারের সঙ্গে বড় ছেলে সতীশ চন্দ্রের পরিবারের বাস। এলগিন রোডে অধিকাংশ ছেলে সংসার করছেন তাদের মত, একমাত্র সুভাষই বড় অসহায় সন্তান। প্রভাবতী দেবী ১৯৩৪ সালে স্বামীহারা হবার পর বৃহৎ পরিবারের মাজননী হয়ে সবদিকে নজর রাখতে না পারলেও সুভাষের প্রতি আলাদা টান আর নির্ভরশীলতা ছিল। ১৯৩৯ সালে এলগিন রোডের বাড়িতে মাজননী পুত্র ও তাঁদের সামনে বৌদের নিয়ে যে গ্রুপ ছবিটি তোলেন তা অনেক না বলা কথা যেন বলে দেয়। পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে এটাই শেষ ছবি। সেখানে একমাত্র অবিবাহিত সুভাষজননীর গৌরব সুভাষ দাঁড়িয়ে আছেন উপবিষ্ট মাজননীর ঠিক পিছনে।

জানকীনাথ বসুর স্বর্গগমনের প্রায় পাঁচ বছরের মাথায় কোদালিয়াতে (শকাব্দ ১৮৬১ অর্থাৎ ইংরাজি ১৯৩৯ সাল, অনুমান করা যায় দিনটি ছিল কোনো এক পূর্ণিমা, হয়ত বা জন্মাষ্টমী তিথি)[৯৬(ক)] দুর্গাদালান সংলগ্ন বিষ্ণুমন্দির সংস্কার করে নারায়ণের বাঁধানো আসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্ত সুভাষ ও ভক্তিমতী সুভাষজননীর ভক্তিস্নাত নারায়ণ বেদীতলে শ্বেতপাথরে আজও উৎকীর্ণ রয়েছে সেদিনের সেই আর্তি—

ওঁ
পূতঃ পিতামহো যস্য বিশ্রুতঃ প্রাণ মোহনঃ।
হর নাথঃ পিতা যস্য মাতা চ কামিনী।
জানকীনাথ নামাসৌ বসুদাসঃ পতির্ম্মম।।
তেষাং স্বর্লোককামাহং দীনাদাসী প্রভাবতী।
ময়া কোদালিয়া গ্রামে সংস্কৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্।।
শকাব্দ ১৮৬১

উল্লেখ্য, সুভাষজননী কোদালিয়া বোসপাড়া নিকটবর্তী পঞ্চবটী মন্দির বা অন্নপূর্ণামন্দিরে যেতেন। একদা সুভাষগ্রাম (পূর্বতন চাংরিপোতা) নিবাসী, বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা নিবাসী আশি উত্তীর্ণা বৃদ্ধা সবিতা গুহ যিনি ওই মন্দিরে যেতেন তিনি শুনেছিলেন এবং জেনেছিলেন 'যে সুভাষ বোসের মা একদা ব্রত পালনের জন্য ওই মন্দিরে আসতেন'।

আবারও ফিরে যাই সুভাষজননীর সেই কটকের দিনগুলিতে। ছেলে-মেয়ে স্বামী আত্মীয়স্বজন নিয়ে বিরাট সংসার এর দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। কিশোর সুভাষ বড় ধর্মপ্রাণ আর প্রকৃতিতে একেবারেই সাধু অথচ পড়াশুনোয় অমনোযোগী নয়, বাইরে তখন কিছুটা হলেও লাজুক প্রকৃতির। শাসনের বেড়াজাল ভাঙবার বাসনায় কিছুটা বিদ্রোহীও। বাড়িতে বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব স্পষ্ট। পুজোর সময় কোদালিয়ার পৈতৃক বাড়ির দুর্গাদালানে খুব বড় করে মা দুর্গার পুজো হত। পারিবারিক সম্মেলন হত। পুরোহিত নগেন ঠাকুর চণ্ডীপাঠ করতেন। এমনই টুকরো স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায় কিশোর সুভাষের চিঠি পত্রে। সেবার সুভাষ কোদালিয়া যেতে পারেননি পূজোর সময় তখন তিনি কিছু চিঠি লিখেছেন তাঁর 'পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরানী'কে কোদালিয়াতে। দাদাভাই জানকীনাথ ও মাজননী দেবীপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে বিজয়ার সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। অসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবময়তা খুঁজে পাওয়া যায় সুভাষের সেই কিশোর কালের চিঠিগুলিতে। এই সময় জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবীর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা তীব্র হয়। ১৯১২ সালে কলকাতার বাগবাজারের শাক্তসাধক পণ্ডিত শ্যামানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু'জনেই শাক্তমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন।[৯৭] তাঁদের দীক্ষিত জীবনের এই সময়কার তথ্য খুব বেশি জানা যায় না। অনুমান করা যায় কটক গৃহ প্রাঙ্গণে দুর্গামন্দির নির্মাণ, নিত্যপূজা, কোদালিয়ায় মহাসমারোহে দুর্গা পূজার সঙ্গে সার্বিক সম্পর্ক রয়েছে তাঁদের মনোজগতের। সুভাষগ্রাম নামে বর্তমানে পরিচিত নেতাজির পৈতৃক ভিটে কোদালিয়াতে শ্যামানাথের আশ্রম ছিল, ছিল তুলসী মঞ্চও। বর্তমানে তার সামান্য কিছুটা ভিটের অস্তিত্ব আছে। তিনি কোদালিয়াতে 'উন্মত্ত ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন। শ্যামানাথ ঠাকুরের স্ত্রী 'মাম্মীমা' বলে পরিচিত ছিলেন। বাগবাজারে তাঁরা আসতেন। শ্যামানাথের পঞ্চম পুরুষ প্রপ্রপৌত্রী নন্দিনী ভট্টাচার্য লেখককে এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে শ্যামানাথের দুই পুত্র পশুপতিনাথ ও অমরনাথ। পশুপতিনাথের দুই পুত্র গৌরীনাথ, কৈলাশনাথ ও তিনকন্যা ছিলেন বলে জানা যায়। অমরনাথের পুত্র হলেন অশোকনাথ, তাঁর পুত্র সোমনাথ এবং তাঁরই কন্যা নন্দিনী ভট্টাচার্য। গৌরীনাথ (শাস্ত্রী) ও অশোকনাথ (শাস্ত্রী) অত্যন্ত সুপণ্ডিত এবং বসু পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাঁরা থাকতেন। বাগবাজারের বাড়িতে প্রভাবতী দেবী এসেছিলেন এবং অত্যন্ত গোলগাল ফুটফুটে বছর দু'য়েকের অশোকনাথের পুত্র সোমনাথকে, হাতেকাটা চরকায় তৈরি খদ্দরের ছোট চাদর পরিয়ে আদর করেছিলেন। সময়টা সম্ভবত ছিল ১৯৩০-৩১ সাল।[৯৮]

ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে মাঝে মধ্যেই বাগবাজারের বাড়িতে আসতেন প্রভাবতী দেবী। শ্যামানাথের কিছু অলৌকিক কাহিনিও শোনা যায়।[৯৯]

কোদালিয়ার আশ্রমে তিনি রাজরাজেশ্বরীর পূজা করতেন বর্তমানে সেই বিগ্রহ বাগবাজারে নিত্য পূজিতা। শ্যামনগরে যে শ্যামা মা স্বায়ংকালে পূজিতা হন তাঁর পূজাও শ্যামানাথ করেছিলেন। তবে জানা যায় শ্যামানাথ পশুবলির বিরোধী ছিলেন। শাক্ত ও নারায়ণ দুই আরাধনা হত অনুমান করা যায়। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ ছিলেন এই শ্যামানাথ।[১০০]

শ্যামানাথের কাছে সুভাষচন্দ্রের বাবা মা দীক্ষা নেবার কিছুদিন পরেই তিনি প্রয়াত হন। এই সময় স্বাভাবিক কারণেই প্রভাবতী দেবী খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। আজীবন শ্যামানাথ পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় ছিল। এই সময়কার কিছু ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে কিশোর সুভাষের কলমে—'নগেন ঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি কি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিতেছি তন্মধ্যে নগেন ঠাকুর এবং শ্রী শ্রী পূজ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্বাপেক্ষা ভক্তি আকর্ষণ করে। নগেন ঠাকুরের চণ্ডীপাঠ বড়ই মধুর এবং অভক্তকে ভক্ত করিয়া ফেলে। শ্রীশ্রী গুরুদেব মহাশয়ের কোদালিয়া বাটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমরা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিব। দেখা হইলে তাঁহাকে আমার ভক্তি প্রণাম জানাইতেন।[১০১]

গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, কী কথা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো স্মৃতি কথা পাওয়া যায়নি। পরের সপ্তাহের চিঠিটিতে স্পষ্ট—'...শ্রীশ্রী গুরুদেব এবং মাতাঠাকুরানী কেমন আছে লিখিবেন। তাঁহাদিগকে আমি প্রত্যহ স্মরণ করি। তিনি এখানে যে পুষ্পচয়ন করিয়া রাখিতেন এবং আমরা গিয়া তাহার সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতাম তাহা এখনও যেন দেখিতে পাই। তিনি যেদিন পূজা করিয়া 'শান্তিজল' ও পুষ্প বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন যেন মানসচক্ষে দেখিতে পাই...।'[১০২]

অনুমান করা যায় বিদ্যালয়ের পূজাবকাশে তাঁর মাকে এই পত্রটি পাঠিয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি পত্র লেখার পর সুভাষ তাঁর মাকে লিখেছেন অনেকদিন পত্র লেখেননি। কটক থেকে রবিবার তাঁর ছয় নং চিঠিটির পুরোটাই অন্যান্য গুলির মতোই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবনায় ঋদ্ধ। অনুমান করা যায় আগেই তিনি শ্যামানাথ ঠাকুরের জীবনাবসানের সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন কটক থেকে 'পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় যখন ভাবি তখন দুঃখিত হইব কি আনন্দিত হইব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যায় বা কিরূপ অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা জানিনা। তবে চরম দশায় আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইয়া যায়—সেদিন আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন—কোনও দুঃখ নাই—কোনও কষ্ট নাই—পুনর্জন্ম কষ্ট আর আমাদের ভোগ করিতে হয় না—তখন আমরা নিত্যানন্দে বিরাজ করি। যখন ভাবি তিনি সেই নিত্যানন্দ ধামে গিয়াছেন—তিনি অমরগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া স্বর্গীয় সুধাপান করিতেছেন তখন আর দুঃখিত হইবার কারণ দেখি না। তিনি যখন সেই সদানন্দপুরে গিয়া মহাসুখে আছেন তখন আমরা যদি তাঁহার সুখেই সুখী হই তবে আমাদের শোকগ্রস্ত হইবারও কোনও কারণ নাই।...' ওই পত্রে গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মা'কে সান্ত্বনা দিয়েছেন তা অপূর্ব বালকের অসাধারণ প্রাজ্ঞতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। শ্যামানাথ ভট্টাচার্য ঠিক কবে কোথায় কী কারণে দেহ রেখেছিলেন তা বিস্তারিত সূত্র মেলেনি।

সুভাষচন্দ্রের লেখায় জানা যাচ্ছে—'প্রথম গুরুর স্বর্গপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর তিনি পুনরায় সস্ত্রীক হিমাইতপুরের ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সৎসঙ্গে' যোগদান করেন এবং সেইখানে

দীক্ষাগ্রহণ করেন।'[১০৩] উল্লেখ্য জানকীনাথ তাঁর দ্বিতীয় গুরুদেবের থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

পাবনার হিমাইতপুরের আশ্রমে অনুকূল ঠাকুর থাকতেন। তবে মাঝেমধ্যে কলকাতাসহ বিভিন্ন জায়গায় তিনি যেতেন। লণ্ডন থেকে আইসিএস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র দেশে ফেরার পর বাবা মায়ের নতুন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে বাগবাজারে অনুকূলচন্দ্রের এক ভক্তের বাড়িতে যান তাঁর মামা জে.এন.দত্তের সঙ্গে কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীটে। তখন যুদ্ধশেষের ভয়ঙ্কর সংক্রামক 'ওয়ার ফিভার' বা 'ওয়ার ইনফ্লুয়েঞ্জা' বিশ্বের বহু দেশের মতোই বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অনুকূল ঠাকুরসহ তাঁর পার্ষদরা অনেকেই এই জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি।[১০৪]

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রের বাবা মা পুরীতেই কাটান। অনুকূল ঠাকুর স্বপার্ষদ সুস্থ হয়ে ওঠার পর পুরীধামে সৎসঙ্গীরা দুইমাস ব্যাপী উৎসব এর আয়োজন করে। সেদিনের ভাষ্য উঠে এসেছে অন্যতম পার্ষদ সুনীলবাবুর স্মৃতিতে—

'১৯২২ সালে পূজাবকাশের পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জনক জননী আশ্রমে আসেন। তাঁরা উভয়েই শ্রীশ্রী ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। সেই সময়ে একদিন কথা প্রসঙ্গে সুভাষজননী শ্রীশ্রী ঠাকুরকে পুরী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা মাতা মনোমোহিনীর নিকট প্রকাশ করেন এবং মাতা মনোমোহিনী সে কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর বললেন—আমার যাওয়া তো মুশকিল, কেন না, আমার পুরী যাবার সংবাদ পেলে সৎসঙ্গীরা যে যেখানে আছে সব পুরী গিয়ে উপস্থিত হবে। তাদের সকলের তাল সামলাতে বোস মা ও বোস'দার অনেক বেগ পেতে হবে। তা শুনে জানকীবাবু এবং বোস মা উভয়েই বললেন—আমরা সে জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি, ভক্তদের সেবা করব—এর চেয়ে অর্থব্যয়ের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা কোথায়? তাঁদের একথা শুনে শ্রী শ্রী ঠাকুর পুরীতে যাবার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। প্রথমে আমি শ্রী শ্রী বড় মা ও ঠাকুর পরিবারবর্গের অন্যান্য সকলকে নিয়ে পুরী রওনা হয়ে গেলাম। আমরা পুরীতে গিয়ে আরমষ্ট্রং রোডে অবস্থিত, জানকীবাবুর পিতার নামে বাড়ি 'হরনাথ লজে' গিয়ে উঠলাম। পরে ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর, অনন্তমহারাজ, নফর-ভাই প্রভৃতি সহ আশ্রম থেকে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন এবং তাঁরাও 'হরনাথ লজে' গিয়ে উঠলেন। পরে গোঁসাই দা, কিশোরীদা প্রভৃতি কীর্তন দলসহ পুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর পুরীতে গেছেন শুনে কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানের বহু সৎসঙ্গী পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের জন্য আরো বাড়ি নেওয়া হল। এই অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর সেবার জন্য বসু দম্পতি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যহ সকালে এসে সন্ধান নিতেন—কার কী কী দরকার, কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা, সকালে জলখাবার কী কী করা হবে ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর নিতেন এবং তার বিহিত ব্যবস্থা করতেন। এত লোক সমাবেশেও তাঁরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ ও বিচলিত না হয়ে সকলের সেবা যত্ন করতেন, তাঁদের আচার-ব্যবহারে এটা ঘুণাক্ষরেও বোঝা যেত না যে তাঁরা বিরক্ত হচ্ছেন, বরং সর্বদা আনন্দেরই ভাব প্রকাশ পেত। শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলী প্রায় দুইমাস পুরীতে ছিলেন। তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার তো তাঁরা বহন করলেনই এমনকী সমস্ত সৎসঙ্গীর ফিরে আসার পাথেয় পর্যন্ত সানন্দে দান করেছিলেন। পুরীতে অবস্থান কালে 'হরনাথ লজে' বাড়িখানি সর্বদাই কল-কোলাহলে মুখরিত থাকত এবং পুরী শহর ঢক্কানিনাদসহ কীর্তনে উদ্বেলিত হত।...'[১০৫] অনুমান করা যায় এই সময় জানকীনাথ ও প্রভাবতী দেবী নাম সংকীর্তন ও ধর্মাচারণে কাটিয়েছেন। উল্লেখ্য, কোদালিয়া দুর্গাদালানের সামনের তোরণের শীর্ষে খোদিত হরনাথ লজ আজও রয়েছে। পিতৃদেবের প্রয়াণে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছিলেন—'বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম প্রবৃত্তি আরও বলবতী হইয়াছিল। তাঁহার কর্মবহুল ও সংগ্রামরত জীবনে ধর্মের প্রেরণাই ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় সহায় ও শক্তির উৎস। যৌবনে তাঁহাকে সাংসারিক

অভাবের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও ভগবদ বিশ্বাসের বলেই তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে পরিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন আত্মীয়স্বজনের অকাল প্রয়াণে তিনি উপর্যুপরি আঘাত পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার গভীর ভগবদ বিশ্বাসই তাঁহাকে অটল রাখিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্র যখন সরকারি পদ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই—বরং সারাজীবন পুত্রদের কল্যাণকর প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। [১০৬]

সুভাষচন্দ্র তাঁর বাবার মূল্যায়নের পাশাপাশি মা জননী প্রভাবতী দেবীর গুরুদেব অনুকূল ঠাকুরের কাছেও পরবর্তীকালে গিয়েছিলেন। জানা যায় গুরুদেবের আশ্রম গৃহসংস্কারের সময় অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে প্রভাবতী দেবীও ইঁট বহনে হাত লাগিয়েছিলেন। বাবা ও মায়ের ধার্মিকভাবে সুভাষচন্দ্রের সত্ত্বাকে সুস্থির করেছিল পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে। প্রথমবার অনুকূলচন্দ্র অসুস্থ থাকায় দেখা না হলেও কয়েক বছর পর তাঁর পাবনার হিমাইতপুরে যান তাঁর মায়ের নির্দেশে।[১০৭]

উল্লেখ্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অনুরক্ত ছিলেন। হিমাইতপুরে গিয়ে সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন 'দেশের তো নানা কাজই করবার আছে। তা দেশের প্রকৃত সেবা করতে হলে কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে? এ বিষয়ে আপনার মত কি? জানা যায় দেশ ও মানুষ গড়া বিবাহ-সংস্কার, আদর্শ শিক্ষা, পরিবার-পরিজনসহ আশ্রমজীবন-যাপন ইত্যাদি বিষয়ে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। সৎসঙ্গ আশ্রম দেখে সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল কিন্তু একান্তে কোনও কথা বলার সুযোগ হয়নি। এ প্রসঙ্গে এক স্মৃতিচারণে জানা যাচ্ছে—'...সুভাষচন্দ্র আর একবার আশ্রমে এসেছিলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের বেশ কিছু পূর্বে অর্থাৎ অন্তরীণ অবস্থার ঠিক পূর্বে। সুভাষ তখন জননেতা হিসাবে সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তাই তিনি আশ্রমে আসতে এত অত্যাধিক লোকের সমাগম হল যে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎমাত্রই হল, কোন কথা বলার সুযোগ হল না। তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করব বলে এসেছিলাম, এত লোকের ভীড়ে তা আর সম্ভব হল না। আমি বললাম—আসুন না। আমি লোক সরিয়ে দিয়ে, যাতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে Privately কথা বলতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করে বললেন—এত লোকের অসুবিধা করে তা করতে চাই না।'[১০৮]

সুভাষচন্দ্রের এই মূল্যবোধ এই সময়ে অত্যন্ত বিরল। সুভাষজননী প্রভাবতী দেবী স্বাভাবিকভাবেই গুরুভাইদের সঙ্গেও খুবই আন্তরিক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সুশীলচন্দ্র বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'সুভাষজননী প্রভাবতী দেবী আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাই কলকাতায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা না করলে তিনি দুঃখ করতেন। সেজন্য কলকাতায় গেলেই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতাম। সেই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে ও মাঝে মাঝে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সম্পর্কেও অনেক আলোচনা হয়েছে। সুভাষজননী একদিন সুভাষের বাল্যকালের কথা বলতে বলতে আমাকে বললেন—সুভাষের ধরনটা ছোটোবেলা থেকেই আমাদের অন্যান্য ছেলেদের চাইতে আলাদা রকমের ছিল। সে আমার কাছেই শয়ন করত। মাঝে মাঝে রাত্রে উঠে দেখতাম সুভাষ পাশে নেই। একদিন বিছানা থেকে উঠে তার খোঁজে বের হয়ে দেখি যে ছাদের উপর হাতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। তাকে ডেকে বললাম—এরকমভাবে শুয়ে আছিস কেন? সুভাষ বলল—তুমি আমাকে নরম বিছানায় শুইয়ে শরীরটাকে নরম করে দিচ্ছ। ভবিষ্যতে এই নরম শরীর দিয়ে আর কোন শক্ত কাজ করতে পারব না। তাই বিছানা থেকে উঠে এরকম করে ছাদের উপর শুয়ে থাকি। ছেলের কথা শুনে তো আমি অবাক! বললাম—তোকে আবার কষ্ট করতে হবে কেন? সুভাষ উত্তর দিল—জীবনে বড় হতে গেলে, দেশের কাজ করতে গেলে, শরীর সুদৃঢ় করা দরকার। আর একদিন

সুভাষজননীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি রূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে কথা উঠতে তিনি বললেন—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথান্তর বা মনান্তর যে কী করে হয় তা আমার জীবনে আমি জানি না। তাঁর এই কথা শুনে এখন আমার শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেন—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা থাকলে সন্তান-সন্ততি ভালো হয়। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের জনক-জননীকে দেখে শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথার সত্যতা যাচাই করা চলে। সুভাষজননী সত্যই রত্নগর্ভা।'[১০৯]

হিমাইতপুরে সৎসঙ্গ আশ্রম সম্পূর্ণ রাজনীতি বর্জিত ছিল কিন্তু সেখানে সুভাষচন্দ্রের অন্য আর এক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কারণে আকর্ষণ ছিল। বিপ্লবীদের সংগঠন 'শক্তিমন্দির' এখানেই এইসময় বিস্তার লাভ করে। ব্যায়াম, লাঠিখেলার পাশাপাশি অনেক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও বিপ্লবী নেতাদের আগমনস্থল ছিল এটি। সুভাষচন্দ্রকে এই শক্তিমন্দিরের সদস্যরা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। শক্তিমন্দিরের অনেকগুলি শাখা সংগঠন ছিল। অন্যতম ছিল শক্তি সেনা। ছাত্র-যুবরা শরীরচর্চার কলাকৌশল প্রদর্শন ও সংবর্ধনা দিয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে। তিনি সেখানে রাত্রিবাস করেন। তাঁর ভাষণের শেষে বলেছিলেন—'ভারতবর্ষ এতদিন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পথ অনুসরণ করিয়াছে। তাই শোচনীয় অধঃপতন ও দারিদ্র সত্ত্বেও দেশে এমন সব মহাবীর জন্মিয়াছেন যাঁহারা জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দেশ আজ ব্যক্তিতান্ত্রিক বিকাশ চায় না। দেশ চায় সমষ্টিগত সাধনা। তাই ছাত্র ও যুবকদের এখন সংগঠিত শক্তিরূপে গড়িয়া উঠিতে হইবে। জাতীয় বাহিনীর পুরোভাগে আগাইয়া আসিয়া তোমাদের স্থান লইতে হইবে।'[১১০]

ইতিহাসে কম আলোচিত এই শক্তিমন্দির, মাতৃমন্দির। ২২ নভেম্বর ১৯৩০ এ তিনি হিমাইতপুরের এই বিপ্লব আন্দোলনের সম্ভাব্য ক্ষেত্র পরিদর্শনের পর তাঁদের খাতায় লিখেছিলেন—'প্রায় দুই বৎসর পরে আবার এই প্রতিষ্ঠানটি দেখিতে আসিলাম কী আশ্চর্য উন্নতি হইয়াছে এবং ছেলেদের কীরূপ অপূর্ব উৎসাহ। সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বিষয় ছেলেদের সামরিক প্রণালীতে ড্রিল (Drill)। আমি আশা করি কর্তৃপক্ষরা এ বিষয়ে আরও দৃষ্টি দিবেন এবং যাহাতে ভলান্টিয়ারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন। ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। হিমাইতপুরের ভাইরা যে আমার এই অতি প্রিয় কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। ভগবান তাহাদের মঙ্গল করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।'[১১১]

প্রভাবতী দেবী চাইতেন সুভাষ হিমাইতপুরে গেলে যেন তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করেন। সুভাষজননীর এই বিশেষ গুরুভক্তির কথা জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রয়াত উপাধ্যক্ষ ও বসু বাড়ির জামাতা হরিদাস মিত্রের একটি লেটার হেডে লেখা স্মৃতিচারণে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। সুভাষচন্দ্রের মাতৃভক্তির এক প্রত্যক্ষদর্শী—নেতাজির সেজমামা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা কমলা বসুর স্মৃতিকথায়—'... ছোড়দা খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। দুটো ঘটনা বলি। একবার আমার বৌমা (শ্রীমতী অবলা বসু) ও আমার দুই মেয়ে শ্রীমতী ইলা বসু (মিত্র) ও শ্রীমতী মণিকা বসু (মিত্র) কে নিয়ে ছোড়দাকে দর্শন করতে গিয়েছি এলগিন রোডের বাড়িতে। সেদিনকার যাওয়ার এটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাড়ির নতুন বৌকে সুভাষচন্দ্র দেখিয়ে আনব। বড় পিসিমার (প্রভাবতী বসু) কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি শুয়ে আছেন। বললাম, এদের 'সুভাষচন্দ্র'কে খুব দেখার ইচ্ছে। তাই নিয়ে এসেছি। ছোড়দা তখন তেতলায় নিজের ঘরে সহকর্মীদের সঙ্গে বসে জরুরি মিটিং করছেন। একটি লোক মারফৎ খবর পাঠানো হল—সাক্ষাৎপ্রার্থী এসেছেন। ওপর থেকে খবর এল এখন নামা সম্ভব নয়। তিনি কাজ করছেন। বুঝলাম আজকে দেখা পাবার কোন উপায় নেই। বড় পিসিমাও বোধহয় আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। যে লোকটি খবর দিতে এসেছিল তাকে বড় পিসিমা বললেন : 'বলো গিয়ে

মা ডাকছেন।' লোকটি চলে গেল। পলকের মধ্যে দেখি ছোড়দা তেতলা থেকে এসে হাজির। এই হলো সুভাষচন্দ্র! মাতৃভক্তি!

ছোড়দা এই প্রথম আমাকে বিধবার বেশে দেখলেন। আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে আমার হাতখানা ধরে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। কোন কথা তিনি বললেন না। দুঃখপ্রকাশ করলেন না। সান্ত্বনার কথা (যেমন সকলে বলে থাকেন) তেমন কিছুই বললেন না। তিনি শুধু নীরবে চেয়ে রইলেন। ছোড়দার চাউনি বড় সুন্দর ছিল। আর চেহারা ছিল জ্যোতিপূর্ণ দেবকুমারের মতন। ছোড়দার মাতৃভক্তির আর একটি ছোট ঘটনা জানা আছে। আমার শাশুড়ী (শ্রীমতী রানী ভবানী বসু)র কাছে একটি মেয়ে আসত। স্বামী-পরিত্যক্তা এই মেয়েটি খুব ধর্মপরায়ণ ছিল। ভবানীপুরের বস্তি অঞ্চলে থাকত। মেয়েটি ধর্ম প্রসঙ্গে নানা কথা বলত। এই মেয়েটি একবার বড় পিসিমার কাছে গিয়েছিল। আমাদের কাছে বড় পিসিমার কথা, ছোড়দার কথা সে শুনেছিল, ছোড়দা তখন কর্পোরেশনের মেয়র। যাই হোক, বড় পিসিমার কাছে গিয়ে সে বলেছিল তার বাড়ির ঘরটা একটু পাকা করে দিলে তার বড় উপকার হয়। বড় পিসিমা তখন ছোড়দাকে ডেকে বলেন—'ওরে এ এসেছে। একটু দেখিস।' ছোড়দা নিজে সেই বাড়িতে (ভবানীপুর) গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটির ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন। এমনই মাতৃভক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র।'[১১২]

১৯৩১ সালে সুভাষচন্দ্রের ছোটভাই শৈলেশচন্দ্র (সর্ব কনিষ্ঠ সন্তোষচন্দ্র আগেই প্রয়াত) বসুর বিবাহ অনুষ্ঠানে জানকীনাথ, প্রভাবতী, সুভাষচন্দ্রসহ সকলেই আনন্দ অনুষ্ঠানে থাকতে পেরেছিলেন। বৃহত্তর বসু পরিবারের একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফ দেখতে পাওয়া যায়। এরপর নানা পারিবারিক বিপর্যয় চলতে থাকে সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বসু গ্রেফতার, একের পর এক নিকট আত্মীয় ও কনিষ্ঠদের মৃত্যু পরিবারের সবার দাদাভাই ও মাজননীর হৃদয়ে আঘাত দিয়ে গেছে।

১৯৩৪ এর মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে। কটকের আদালতে সাওয়াল করতে করতে জানকীনাথ বসু অচৈতন্য হয়ে যান। তাঁর হৃদযন্ত্র ও কিডনির অসুখ ছিল। চিকিৎসার জন্য এলগিন রোডের বাড়িতে আনা হয়। ডাঃ সুনীল বসু বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বাবার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করে যান। প্রভাবতী দেবীও এই সময় তাঁর ডায়াবেটিস থাকার কারণে খুব একটা সুস্থ ছিলেন না। জানকীনাথ শেষ দু'তিন মাস খুবই অসুস্থ হয়ে এলগিন রোডের দোতলার উত্তর দিকের ঘরেই থাকতেন। চিকিৎসক হাল ছেড়ে দেওয়ায় সুভাষচন্দ্রকে তার বার্তা পাঠানো হয়। এরোপ্লেনে সুভাষচন্দ্র পাড়ি জমালেন ভারতের পথে। সেটাই তাঁর জীবনে প্রথম বিমান যাত্রা সম্ভবত। ২ ডিসেম্বর ১৯৩৪ মধ্যরাতে জানকীনাথ বসু পার্থিব জগতের মায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে চলে যান। ২৬ নভেম্বর প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে তার পান সুভাষচন্দ্র। বাবার অবস্থা সংকটজনক এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিমানে দ্রুত চলে আসার কথা লেখা হয়। সে সময় বিমান সারা রাত চলত না। রাতের বেলায় বিমানবন্দর থেকে আবার পরদিন উড়ত। গলব্লাডারের সার্জিকাল অপারেশন হওয়ার কথা ছিল ভিয়েনাতে তা স্থগিত রেখে ২৯ নভেম্বর রয়াল ডাচ (কে এল এম) বিমান ধরেন ভোরবেলায় রোম এর উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ৩০ তারিখ ভারতের পথে। ৩রা ডিসেম্বর করাচি বিমানবন্দরে খবর পেলেন তাঁর বাবা গত হয়েছেন সেই দিন ভোর রাতে। বিকাল চারটের সময় দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছান।[১১৩]

তাঁকে এবং তার মেজদা শরৎ বোসকে গৃহবন্দী করা হয়। যদিও অনুমতি নিয়ে শরৎ বসু পায়ে হেঁটে কাছে তাঁর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে রাতে চলে যেতেন। এসময়কার বর্ণনা নেতাজির ভাইপো প্রদীপ বসুর বর্ণনায় পাওয়া যায়—'১৯৩৪ সালের কথা। আমার বয়স তখন ছয়। আমাদের দাদাভাই (ঠাকুরদাদা) কলকাতার এলগিন রোডের বাড়িতে দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক অসুখের পর মারা গেলেন... সে সময় শুনলাম যে আমাদের একজন 'ফেমাস' কাকা বিলাত থেকে হাওয়াই জাহাজে আসছেন। তখন এরোপ্লেনে ঘোরাফেরা

করা আজকালের মত সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ...নেতাজির আসার দিন কয়েক গাড়ি ভর্তি করে আত্মীয়স্বজনরা গেলেন বিমানবন্দরে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল না, বেশ একটা থমথমে ভাব। কলকাতায় নামলেই নাকি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে এইরকম গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। কারণ ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি না নিয়েই নাকি তিনি দেশে ফিরছেন। সকালের খবরের কাগজে নেতাজির করাচী পৌঁছবার খবর বেরিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছনোর খবর বেরনোর জন্য সকাল থেকেই এলগিন রোডের বাড়ির সামনে ভিড় জমতে শুরু করে। আমরা তো উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি কখন 'ফেমাস' রাঙাকাকাবাবু এসে পৌঁছবেন। ভিড় ঠেলে একটা অচেনা গাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকল এবং দ্বিতীয় গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত এসে থামল। সেইখানেই ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম ড্রাইভারের পাশে দু'জন পুলিশ বসে আছে। ভেতরে একজন পুলিশ অফিসার। আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। বেশ খানিকক্ষণ কেউই নামলেন না। পুলিশের গাড়ি দেখে অনেকেই একটু ঘাবড়ে গিয়ে ছিলেন। পুলিশ অফিসারটি নামলেন। তারপর নেতাজি সাদা খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর পরা অবস্থায় ও পায়ে সাদা নাগরা জুতো পরে, ফর্সা, ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। নেমেই জুতো খুলে ফেললেন। কাকাবাবু (শৈলেশচন্দ্র বসু) ও আমার দাদা (রঞ্জিতকুমার বসু) গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের কাঁধে ভর করে কাঁদতে কাঁদতে দোতলায় আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। ভিড়ের চাপাচাপিতে আর কিছু দেখতে পাইনি। সেই হচ্ছে নেতাজিকে জ্ঞানত প্রথম দেখা... নেতাজির শরীর তখন খুব খারাপ ছিল। ডাক্তারেরা তাঁকে যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। আমাদের ধারে কাছে যাবার অনুমতি ছিল না...'[১১৪]

অনুমান করা যায় সুভাষচন্দ্র সোজা তাঁর শয়ন কক্ষের পাশেই মাজননীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সে সময় বঙ্গসমাজে মরদেহ সংরক্ষণের রেওয়াজ ছিল না। সুভাষচন্দ্র সম্ভবত তাঁর বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পাননি। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি। তবে পরের দিন ইউরোপে লেখা একটি পত্রে সুভাষচন্দ্র তাঁর জননীর সম্পর্কে লিখেছিলেন তার (বঙ্গানুবাদ—লেখক) অভিব্যক্তি বেদনা দায়ক—'মাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা ভাইবোনেরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি বোঝাতে, কিন্তু কোনো কাজ হল না। হিন্দু স্ত্রীদের জীবন তাঁদের স্বামীর জীবনের সঙ্গে এমন বন্ধন তৈরি করে যার বিচ্ছেদবেদনা তাঁদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। যদিও তা ইউরোপীয় জীবনে কোথাও ব্যতিক্রম ঘটে থাকে.... বর্তমানে আমার পুরনো ঠিকানা ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িতে মা এর সঙ্গে আছি।..'[১১৫]

গোঁড়া হিন্দু রীতিনীতি মেনে এবং তাঁদের পারিবারিক বন্ধু ও সংস্কৃত পণ্ডিত অশোকনাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) ও গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের তত্ত্বাবধানে প্রায় একমাস ধরে শ্রাদ্ধশান্তি দান ধ্যান চলেছিল বলে জানা যায়। অশৌচ চলাকালে জানকী বসুর পুত্ররা মাটিতে খড়ের বিছানায় শয়ন করতেন এবং নিজেরা খাবার সেদ্ধ করে খেতেন, বোনরা এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করতেন। মহিলারা এইসময় একই ঘরে সবাই শয়ন করতেন। পুরোহিতদের অনুমতি ক্রমে সুভাষচন্দ্র ভিন্ন সম্প্রদায়ের বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তাঁরা এসেছিলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সাত ঘণ্টা ধরে চলেছিল বলে জানা যায়।[১১৬] সেদিন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট জন ছিলেন।

প্রভাবতী দেবী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এই সময় পরিবারে বৈষয়িক বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে কোদালিয়া, কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর-এর বড় বড় বাড়িগুলি ছাড়াও চিলকা লেকের এবং ওড়িষ্যার আরো চার পাঁচটা বাগান তাঁদের পিতৃদেবের সম্পত্তি। এলগিন রোডের বাড়ি উইল করা হয়েছিল সতীশ, সুধীর, সুভাষ ও শৈলেশ-এর নামে। শরৎ, সুরেশ ও সুনীল এনাদের অন্যান্য স্থানের সম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল বলে সুভাষচন্দ্রের ভাইপো অরবিন্দ বসু জানিয়েছিলেন।[১১৭]

সুভাষচন্দ্রের নির্ধারিত গলব্লাডার অপারেশনের জন্য ইউরোপ পাড়ি দিতে হয়। ১৯৩৫ এর ২০ জানুয়ারির নেপালস-এ পৌঁছান।[১১৮]

ভিয়েনায় তাঁর গলব্লাডার অপারেশনের আগে তাঁর মা'কে এক মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছেন যা সুভাষচন্দ্রের মতো পুত্র ও সেজদা সুরেশচন্দ্রের ভাই হিসাবে লেখা সম্ভব।

শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়

ভিয়েনা
১৬/৪/৩৫

পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরানী
শ্রীচরণেষু মা,

আপনার ২১/৩ তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি ইতিমধ্যে জেনেভায় গিয়াছিলাম এবং আসিবার সময় 'জুরিখ' ও 'মিউনিখ' হইয়া আসিয়াছিলাম।...

বড়দিদির অসুখের কথা শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি—জানিনা এতদিনে কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল কিনা, যদি এলাপাথি ও কবিরাজিতে উপকার না হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথি করিলে কী ভালো হয় না।

বাটির অন্যান্য সকলে ভালো আছেন ও আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

সেজদাদার কোনরূপ ভালো ব্যবস্থা হইল না বলিয়া বড় দুঃখিত আছি। সংসারের অবস্থার কথা ভাবিলে বড় মন খারাপ হয়। কিন্তু আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তাই আমি ভাবি যে সংসারের জন্য যখন কিছু করিতে পারিতেছি না, তখন সম্পত্তির অধিকারী হওয়া আমার উচিত নয়। বস্তুতঃ যে কারণে আমি পরিবারবর্গের জন্য আজ পর্যন্ত কিছু করি নাই সেই কারণে পৈতৃক সম্পত্তিতে আমার কোনো ন্যায্য অধিকার নাই।

আজ পর্যন্ত আমি আপনার তিনখানি পত্র পাইয়াছি। মহারাজের দেহরক্ষার খবর পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। আমার শরীর একইরকম চলিতেছে। পেটের ব্যাথা সারিতেছে না। তাই আমার অস্ত্রোপচারের কথা চিন্তা করিতেছি। এই বিষয়ে আগামী মেলে আপনাকে জানাব স্থির করি আপাততঃ ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ চলিতেছে। আপনার শরীর কেমন? আপনার হিমাইতপুরে যাওয়া হইল না, এটা বড় দুঃখের কথা। তবে বড়দিদির অসুখের জন্য আপনার বোধ হয় নড়া সম্ভব নয়। কিছুদিন স্থান পরিবর্তন করিলে বোধ হয় ভালো হইত।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন।

ইতি
আপনার সেবক
সুভাষ

এই চিঠিটি নেতাজির ভাইপো ও মেজদাদা সুরেশচন্দ্র বসুর বড় ছেলে রঞ্জিত কুমার বসুর লেখা—'নেতার নেতা নেতাজি' (পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭) বই থেকে গৃহীত হয়েছে। সম্ভবত এই চিঠির সূত্র ধরে সুভাষচন্দ্রের হাতের লেখা নকল করে ইংরাজিতে পোস্টকার্ডে এক নকল উইল বা সুভাষের স্বাক্ষরিত বক্তব্য তৈরি করা হয়েছিল। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সুরেশ বসুর পরিবারকে উচ্ছেদ করার পর। একান্ত পারিবারিক এই উইল বা

পত্রটি গান্ধীজির কাছে নিয়ে যাওয়া হলে লাল পেন্সিল দিয়ে গান্ধীজি কয়েকটি বাক্যের তলায় দাগ দিয়ে বলেছিলেন সুভাষ এমন ভুল ইংরাজি লিখতে পারে না।[১১৯] উল্লেখ্য সেই জাল উইলটি লেখকের হাতে ধরে দেখার সুযোগ ঘটেছিল। সংগত কারণেই যিনি ওই হাতের লেখা তার রাঙাকাকার নকল করতেন তাঁর নাম উল্লেখ করলাম না, তিনি প্রয়াত হয়েছেন। পরবর্তী নেতাজির এমন নকল চিঠি প্রসঙ্গে আসব। ধার্মিক প্রভাবতী দেবী সংসারে সবাইকে আপন করে নিয়ে চলতেন, তবু সুভাষের প্রতি তাঁর একটু বেশি স্নেহ নজর ছিল কারণ তিনি জানতেন সুভাষ অন্যরকম। কোনো বৈষয়িক ভাবনা তাঁকে পীড়িত করে না অথচ সবার জন্যই তাঁর প্রাণ কাঁদে। যে দুর্বল, যারা অত্যাচারিত পীড়িত তাঁদের পাশে সুভাষ এসে দাঁড়ায়। সুভাষের মনের সব খবর মাজননী বুঝতে পারতেন। সুভাষ ছোটোবেলায় লাজুক ছিল, খিদে পেলে মুখে আঙুল পুরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সুভাষের কোনো বৈষয়িক ভাবনা নেই, নেই তাঁর সংসার করার বাসনা, জগৎ সংসার তাঁরই সংসার। কৈশোরে মাকে লিখেছিল 'ভারতমায়ের এমন কোনো ত্যাগী সন্তান হবে না কেন।' প্রভাবতী দেবীর 'সুবি' তাঁকে শুধু সেদিন দেশত্যাগের কথাটি জানাতে পারেনি। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গলব্লাডার অপারেশনের আগে চিকিৎসক প্রফেসর ডোমেলের হাতে নাকি সুভাষচন্দ্র শেষ ইচ্ছা বা উইলপত্র দু'লাইন লিখে ছিলেন একটি কাগজে। ইংরাজিতে লেখা যে কাগজ কলকাতার এটর্নি নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কাছে পাঠান। অপারেশনের নিরাপত্তা আজকের মত ছিল না বলে এমন ধারার উইল নাকি করতে হত। শরৎ বসুর পুত্র শিশির বসু তাঁর 'বসু বাড়ি' বইতে (পৃষ্ঠা-৬০) এত লিখেছেন রাঙাকাকাবাবু ইংরাজিতে দু'লাইন লিখেছিলেন যার মর্মার্থ হল : 'আমার যা কিছু সম্পদ তা রইল আমার দেশবাসীর জন্য; আমার যা কিছু দায় আছে, আমি আমার মেজদাদাকে দিয়ে গেলাম।' আশ্চর্যের বিষয়, জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লেখা এমন একটি উইল রহস্যময়ভাবে আজও দেশবাসীর সামনে এল না কেন তা বিস্ময়কর। যদিও সেসময়কার নানা চিঠিপত্র সংরক্ষিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সেদিনের গান্ধী কর্তৃক সনাক্ত করা জাল উইল এবং চিকিৎসক ডোমেলের হাতে দেওয়া তথাকথিত উইল দু'টি প্রকাশ্যে আনলে বসু বাড়ির তরফে তাহলে অনেক সন্দেহের নিরসন ঘটত। সুরেশ বসু ও শরৎ বসু পরিবারের কাছে আজও যা রক্ষিত থাকা স্বাভাবিক। জানা যায় ভিয়েনাতে সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন মেদিনীপুরে নারাজোলের রাজকুমার এবং সুভাষচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ দেবেন্দ্রলাল খান। তিনি ও তাঁর পরিবার বিশেষ করে তাঁর নারাজোলের রাজবাড়ি স্বাধীনতা আন্দোলনে এক বিশেষ অবদান রেখেছিল। রবিঠাকুর থেকে শুরু করে অজস্র ব্যক্তিত্ব এবং বহু বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক হত ওই রাজবাড়িতে। খণ্ডিত ভারতের ইতিহাসে স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি সে কথা আজও।[১২০]

এই সময়টাতে সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎ বসুও জব্বলপুর জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি তাঁর মা'র কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন এই সময়ে '...তুমি আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। আমি একলা আছি বটে, কিন্তু সত্য বলছি মন ভাঙেনি এবং আশা করি ভগবানের কৃপায় মন ভাঙিবে না। অবশ্য সুভাষ যখন ছিল তখন নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া সময় কাটিত; এখন সে সুযোগ নাই। তবে পড়াশুনো করিয়া সময় একরকম কাটিয়া যাইতেছে; এবং সেইজন্য আরও কিছু বইয়ের জন্য তোমাকে লিখেছি। কতক বই সুভাষ লইয়া গিয়াছে। সে বেচারার আরও কষ্ট হইবে, বিশেষত যখন শরীর অসুস্থ। তবে ভগবান তাহাকে বাল্যাবস্থা থেকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন এবং বন্দীজীবনে সে একরকম অভ্যস্ত। সুভাষ ফিরে আসতে বোধহয় আরও তিন সপ্তাহ; ততদিন পড়াশুনা লইয়া সময় কাটাইয়া দিব।...'[১২১]

উল্লেখ্য, সুভাষচন্দ্র তাঁর মা সহ গুরুজনদের বরাবর আপনি সম্মোধনে চিঠি লিখেছেন, মেজদাকে কোনোদিনও বাংলায় চিঠি লেখেন নি। মা'এর শরীরের খবরাখবর তাঁর বাড়ির অন্যান্যদের চিঠি লেখার সময়ও নিতেন।

১৯৩৭ সালে এলগিন রোডের বাড়িতেই প্রভাবতী দেবী স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। উডবার্ন পার্কের বাড়ি ছেড়ে সুভাষকে চলে আসতে হয় এলগিন রোডে তাঁর পিতৃগৃহে। মাজননী ও সুভাষচন্দ্রের ঘর পাশাপাশি। অধিকাংশ সময়ই দুটি ঘরের লাগোয়া দরজাটি উন্মুক্ত থাকত। শোকতাপে জর্জরিত সুভাষজননী তাঁর ধর্মীয় ভাবভাবনা কোনো স্তরেই বর্জন করেন নি যদিও শরৎ বসুর পরবর্তী প্রজন্ম নাস্তিকতাকে প্রকাশ্যেই মান্যতা দিয়ে থাকেন তবে প্রভাবতী দেবীর পুত্র কন্যাদের এমন দৃশ্য দেখতে বা ভাবতে হয়নি। তবে তাঁর অন্যান্য পুত্রকন্যাদের পরবর্তী প্রজন্ম আস্তিক বলেই জানা যায়।

প্রভাবতী দেবীর সাধুসেবা প্রসঙ্গে উল্লেখ করি সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের এক প্রবন্ধের অংশ —'...শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় বাংলা ১৩৭৪ সালে (ইংরাজি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে) ভবানীপুরে শাঁখারী পাড়ায় প্রথম চতুর্মাস্য চলছে। শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজার কিছু আগে একদিন পূজ্যপাদ নিত্য লোকগত ৺রামদয়াল মজুমদার বাবার বাসায় তাঁকে কথা রামায়ণ শুনাতে শুনাতে শরীর জমে যায়। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে দুইটি মায়ী দেখি। শুনলাম বয়স্কা মায়ীটি ভারত-বিখ্যাত সুভাষচন্দ্রের গর্ভধারিণী এবং দ্বিতীয়া মায়ীটি তাঁর বড়দাদার পত্নী। মা 'এ'-র কাছেই এসেছেন। শাঁখারী পাড়ার অন্নপূর্ণা নাম্নী একটি মায়ী 'এ'-র লেখা পাগলের খেয়াল ও নাম রামায়ণ মাকে দেয়। তা পাঠ করে সুভাষ-জননী বলেন, 'বাবা রামায়ণ শুনে আশা তো মিটলো না, আপনি একদিন আমাদের বাড়িতে যাবেন? যাব বলে স্বীকার করি। মা জিজ্ঞাসা করলেন 'কবে গাড়ি পাঠাব'? তদুত্তরে বলি বৃহস্পতিবার বাগবাজারে পান্নামার বাড়ি যাই, শনিবারে 'উৎসব' সৎসঙ্গে। ঐ দুদিন বাদ দিয়ে গাড়ি পাঠাবেন। মা গাড়ি পাঠান। 'কথা রামায়ণ' পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁদের বাড়ি যাই। মা উপরে নিয়ে গিয়ে পায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। প্রথম দর্শনের দিনও পদসেবা করেছিলেন। কথা রামায়ণ পাঠ হয়। সুনীলবাবা ও তার পত্নী আরও কে কে উপস্থিত ছিলেন। পাঠকালে উপর থেকে কে নেমে গেলেন। অনুমান করলাম সুভাষ-বাবা। পাঠান্তে চলে আসি।

শাঁখারী-পাড়ায় তুলসীদাস আশ্রমে কথা প্রসঙ্গে বলি, কখনও মহাত্মা গান্ধীকে দেখিনি। সেকথা পূর্বোক্তা অন্নপূর্ণা মাতা সুভাষ-জননীকে বলেন। তিনি শুনে বলেন আমি দেখা করিয়ে দেব।...

৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন প্রাতে মার (সুভাষজননীর) আদেশে একখানি রিকসা নিয়ে তাঁর পাচক আসে। রিকসা করে প্রথমে তাঁদের বাড়ি গেলাম। মা নেমে এসে বসিয়ে পায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। এটি যেন তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। বহু ভক্তিমতী মায়েদের দর্শন পেয়েছি কিন্তু সুভাষ-জননীর মত আর দ্বিতীয় কোনো পরমভক্তা রমণী দেখেছি বলে মনে হয় না। ঐরূপ মাতা না হলে সুভাষবাবার মত ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হবে কেন?

মা যে বাড়িতে মহাত্মা গান্ধীজি আছেন সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। গান্ধীকে সেখানে দেখি।

...সুভাষবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। লোকের মুখে তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্বের কথা শুনি। তিনি একজন ভগবদংশসযুক্ত মহামানব এটি বিশ্বাস করি।...

নেতাজির শ্রী বিগ্রহটি যে শ্রীভগবানের শরীর। তিনি লীলা করবার জন্য যে নেতাজি সাজে ছিলেন এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।...'[১২২]

ইতিহাসের আশ্চর্য সংযোগ। বহু বছর বাদে খণ্ডিত ভারতে এক সন্ন্যাসী দেশনায়ক, অনামী (গুমনামী) সন্ন্যাসী যিনি ভক্তজনের কাছে ভগবানজি তিনি তাঁর পূর্বজীবনের স্মৃতিচারণায় ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন যা বিস্ময়কর। সেইসব নথিপত্র অন্য পরিসরে আলোচনা হতে পারে।[১২৩]

এমনকী ষাট-এর দশকে উত্তরবঙ্গের শৌলমারী আশ্রমে প্রথম পর্যায় থাকা সন্ন্যাসী পূর্বজন্মের সমস্ত প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেও সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুগামী যখন প্রভাবতী দেবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তখন সন্ন্যাসী সারদানন্দজির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এবং স্থান ত্যাগ করেন।[১২৪]

যুক্তিবাদী মোড়কে শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অভিমান ইতিহাসের সব সত্যকে স্পর্শ করার অনুমোদন দেয় না। নেতাজির জীবনগাথাকে অগভীর করে রাখার এই অন্ধপ্রবণতা বেদনাদায়ক।

ফিরে যাই ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকে দর্শনের বেশ কয়েকমাস আগের ঘটনায়, যেখানে সুভাষজননীকে মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে থাকতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। ইউরোপ থেকে ফিরে সুভাষচন্দ্রের গলা ও পেটের সমস্যা হয় পুনা থেকে কার্শিয়াংয়ের গিদ্দা পাহাড়ে সপ্তাহ খানেক থাকার পর ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ এ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নজরবন্দী অবস্থাতেই চিকিৎসা শুরু হয়।[১২৫] কাছের আত্মীয় স্বজনকে দেখা করার আলাদা আলাদা অনুমতিপত্র দিয়েছিল পুলিশ।[১২৬]

তাঁর মাতাঠাকুরানী প্রভাবতী দেবীর পক্ষে মেডিক্যাল কলেজে যাওয়া প্রতিদিন সম্ভব না হওয়াতে পুলিশ প্রতিদিন দু'ঘণ্টার জন্য পাহারা দিয়ে এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আসত। মাজননী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন আর বাড়ির বাকি লোকজন সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দেখতেন। এমন বর্ণনা দিয়েছেন শরৎ বসুর বড় ছেলে অশোকনাথ বসু তাঁর 'মাই আংকেল নেতাজি' বইতে।[১২৭]

প্রকৃতপক্ষে ৮ এপ্রিল ১৯৩৬ এ বোম্বে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বোম্বের আর্থার রোড জেল, সেখান থেকে পুনার বারবেদা সেন্ট্রাল জেল এবং কার্শিয়াংএ স্বাস্থ্যের কারণে অন্তরীন দশা চলছিল। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে মেডিক্যাল কলেজ থেকে মুক্তি পান।[১২৮]

নেতাজি বাবা-মা-এর কাছে কেমন ছিলেন? এ ব্যাপারে এক ঝলক আলোকপাত করেছেন সুভাষচন্দ্রের মাসি নিশাবতী দেবী 'সুভাষ খুব নম্র স্বভাবের ছিল। মা বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় সে মাথা হেঁট করে কথা বলত। এত নম্র আমার জীবনে কখনও আর দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' তার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। প্রতিদিন সকালে সে গীতা পাঠ করত। তার স্বভাবের মধ্যে একটা জিনিস ছিল, সে ছোটোদের সঙ্গে মিশত। বাচ্চাদের সে খুব ভালোবাসত।'[১২৯]

এই অহংকারশূন্য, নম্র স্বভাবের জন্যই বাংলার তরুণ সম্প্রদায়, বিপ্লবীরা প্রাণ দিয়ে তাঁদের নেতা সুভাষচন্দ্রকে ভালোবেসেছে। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে বিশালভাবে বরণ করা হয়েছিল। সে ছবির ভিডিও দেখতে পাওয়া যায় কীভাবে দেশীয় ঐতিহ্য মেনে তা হয়েছিল। জানা যায় ১৯৩৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে পুত্র, বৌমাদের সঙ্গে সুভাষজননীও গিয়েছিলেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের জয়যাত্রা দেখতে।[১৩০]

পরের বছর ঐতিহাসিক ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচন এবং সুভাষচন্দ্রের জয়। গান্ধীজির মর্মান্তিক উক্তি 'পট্টভির পরাজয় আমার পরাজয়'। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে আপোশহীন নেতা সুভাষচন্দ্রের সুস্পষ্ঠ সীমারেখা তৈরি হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজনৈতিক শালীনতা হারিয়ে প্রতিপক্ষরা প্রচার করল সুভাষচন্দ্রের 'রাজনৈতিক জ্বর' বলে। অধিবেশনে শরৎ বসুকে সুভাষচন্দ্রের লেখা পাঠ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর কন্যা গীতা বসু (বিশ্বাস) লিখেছেন—'কংগ্রেস অধিবেশন মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরীতে হল। রাঙাকাকাবাবু এইসময় নিউমোনিয়া রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হলেন। মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার মতো তাঁর শারীরিক অবস্থা ছিল না। ডাক্তারদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি যাত্রা স্থির করলেন। সঙ্গে গেলেন আমার নতুন কাকাবাবু ডাঃ সুনীল বসু ও তাঁর দু'জন সহকারী চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে। তাঁর সংকটাপন্ন অবস্থার জন্য মাজননীকে সঙ্গে যেতে হল। এছাড়া বাবা-মা'র সঙ্গে আমার বড়ো বৌদিকে, মীরা ও আমি গেলাম।

রাঙাকাকাবাবুকে সেবা করতে আমাদের খুড়তুতো বোন ইলা, সেও সঙ্গে গেল। কোনরকমে তিনি যথাস্থানে পৌঁছলেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ। তাঁর দারুণ অসুস্থতার কথা কংগ্রেসপন্থীরা বিশ্বাস করেনি। তারা বম্বে থেকে ডাঃ জীবরাজ মেহতা ও ডাঃ গিলডারকে আনালেন রাঙাকাকাবাবুকে পরীক্ষা করার জন্য। তাঁরা এসে অবশ্য তাঁর সংকটাপন্ন অসুখের বিষয় সায় দিলেন।... অবশ্য রাঙাকাকাবাবু উপস্থিত হলেন ডাক্তারদের আপত্তি অমান্য করে। তখন তাঁর প্রচণ্ড জ্বর, স্ট্রেচারে এবং অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শেঠ গোবিন্দ দাস। তিনি কট্টর কংগ্রেসপন্থী। যে সম্মান ও সাহায্য কংগ্রেস সভাপতির পাওয়া উচিত ছিল তা একেবারেই দেওয়া হয়নি। ত্রিপুরী, শহর থেকে অনেকটা দূরে। ওষুধপত্র আনা ইত্যাদির জন্য সময়মতো গাড়ি পাওয়া যেত না। এই সব নীচতা দেখে বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন।[১৩১]

মা প্রভাবতী দেবী কতটা ব্যথা পেতেন অনুমান করা যায়। অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়ার যে ছবি দেখা যায় সেখানে বিপ্লবী ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ারের মেজর সত্যভূষণ গুপ্তকেও দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র তাঁর এই অসুখ সম্পর্কে এবং দেশবাসীর ভালোবাসা নিয়ে বিখ্যাত 'মাই স্ট্রেঞ্জ ইলনেস' বা 'আমার অদ্ভুত অসুখ' শীর্ষক এক মর্মস্পর্শী নিবন্ধ লিখেছিলেন।[১৩২]

লিখেছিলেন—'...এক এক সময় হিমালয়ের আহ্বান দুর্নিবার হয়ে উঠত। ...১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ থেকে একমাস যেরকম একটানা বিষম ও তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে সেরকম যন্ত্রণা সারাজীবনে আমি কখনও ভোগ করিনি।...'

ছেলের মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার পাশে ছিলেন বৃদ্ধা প্রভাবতী দেবী। গুরুদেবের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ও ভক্তি ছিল। মা জননীর কক্ষে গুরুদেবদ্বয়ের ছবি রয়েছে। যেটিকে বর্তমানে নেতাজির মহা নিষ্ক্রমণের কক্ষ রূপে দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল মা জননীর ঘর[১৩৪] ও পাশের ঘরটি ছিল সুভাষচন্দ্রের। মিউজিয়ামের, নানা কক্ষের হেরফের ঘটানো হয়েছে পরবর্তীকালে।[১৩৫]

সুভাষচন্দ্রের ভাইঝি, ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর কন্যা লীলাবতী বসুর (মিত্র) কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রনীল মিত্রের ভাষ্যে জানা যায় মাজননী বাড়ির সবাইকে খুব ভালোবাসতেন। একতলায় ছিল রান্নাঘর। নাতনী (লীলা ডাক নাম রাধু) দিদার কাছে খিদের বায়না করলে রা-রা বলতেন এবং প্রচুর মিষ্টি এনে খেতে দিতেন।[১৩৬]

অন্যদিকে মহানিষ্ক্রমণের আগে যখন ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চিঠি পড়ে নেবার যে কৌশল ও প্রবণতা ছিল তা বিলক্ষণ জানতেন সুভাষচন্দ্র। অতি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি তাই সেসময় ডাকে না দিয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মারফত পাঠাতেন। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাক্যে লেখা চিঠি মালদহের কংগ্রেস নেতা ও সুভাষচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ অতুলকুমারের কাছে ইংরাজিতে লেখাপত্র পাঠিয়েছিলেন ফণীভূষণ চক্রবর্তীর মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অতিসত্বর যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল তাতে। বাড়ির চারদিকে অজস্র সিআইডি গোয়েন্দাকূল যাতে সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য অতুলকুমার তাঁর কিশোরী ভাইঝি লীলাদেবী (মিশ্র) কে এলগিন রোডের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লেখককে বৃদ্ধা লীলাদেবী জানিয়েছিলেন সেদিনের স্মৃতি। তিনি বলেছিলেন তাঁর কাকার সঙ্গে তিনি সুভাষচন্দ্রের কক্ষে গিয়েছিলেন। সেখানে সুভাষচন্দ্রকে একমুখ দাড়ি নিয়ে শিখের মতো লাগছিল। সেখান থেকে সুভাষচন্দ্রের মা তাঁকে আদর করে খেতে দিয়েছিলেন। তাকে আলাদা ঘরে নিয়ে যায় সেখানে অনেক মেয়েরা ছিল ইত্যাদি।[১৩৭]

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ, নির্বাচিত সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর যাত্রাপথে দুষ্কৃতি দিয়ে আঘাত করার কুচক্রান্তও করা হয়েছিল কিন্তু ওয়েলিংটন-এর যাত্রাপথে তাঁর ভাইপো ও সারথী রণজিৎ বসু (কার্তিক)র তৎপরতায় সেদিন কোনো অঘটন ঘটেনি।[১৩৮]

এই ভাইপো-ই রেডিও মেকানিকের ছদ্মবেশে প্রেসিডেন্সি জেলে লালা শংকরলালের গোপন বার্তা শরীরে লুকিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন বন্দী সুভাষচন্দ্রের কক্ষে। সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের আগে তাঁর নামে দুটি মামলা চলছিল। কোর্টে হাজিরা এড়াতে মেডিকেল সার্টিফিকেট খুব জরুরি ছিল। এ প্রসঙ্গে রণজিৎ বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'এই মেডিকেল সার্টিফিকেটটি দেবার জন্য ডাঃ মণীন্দ্র নাথ (তৎকালীন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ—সুচিকিৎসক) এলগিন রোডের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি যখনই আসতেন প্রথমে আমার নতুন কাকা ডাঃ সুনীল বসুর চেম্বারে দেখা করতেন। পরে এঁরা দু'জনে একসঙ্গে রাঙাকাকাবাবুকে দেখতে আসতেন। সেদিনও যথারীতি ডাঃ দে, ও নতুন কাকাবাবু কিছুক্ষণ পরে রাঙাকাকাবাবুকে দেখতে তাঁর ঘরে এলেন। ঐ সময়ে আমি সেই ঘরে উপস্থিত ছিলাম। তখন প্রায় রাত আটটা। পাশেই আমাদের মাজননীর (ঠাকুমা-প্রভাবতীদেবী) ঘর। বেশির ভাগ সময়ে এই দুটি ঘরের মাঝের দরজা খোলাই থাকত। ডাঃ দে ও নতুন কাকাবাবু একটু জোর গলায় বলে উঠলেন যাতে মাজননীর কানে যায়, 'সুবির কিছুই হয়নি, জেলে যেতে ভয় পাচ্ছে। ওর মেডিকেল সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজন নেই।' যদিও এই উক্তি কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না, রসিকতার বশেই তিনি বলেছিলেন। তারপর মাজননী, ডাঃ দে ও নতুন কাকাবাবু রাঙাকাকাবাবুর স্বাস্থ্য ছাড়া অন্য বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন ও ডাঃ মণি দে মেডিকেল সার্টিফিকেট না দিয়েই চলে যান। রাঙাকাকাবাবুও তাঁর মেডিকেল সার্টিফিকেটের সম্বন্ধে কিছু বলেননি। ডাঃ দে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই রাঙাকাকাবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন ও নির্দেশ দিলেন, 'তুমি ডাঃ মণি দের বাড়ি যাও। আমার মেডিকেল সার্টিফিকেটটা তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। আর যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলে মণিবাবুকে বলবে এবারে সার্টিফিকেটটা দিন। আর ভবিষ্যতে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে না'[১৩৯]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বিশ্বাসযোগ্য ভাইপোটি শেষপর্যন্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট আনতে পেরেছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পাশের ঘরের প্রভাবতী দেবী থাকতেন বলছেন অর্থাৎ যে ঘরে প্রভাবতীদের আগের এবং পরের গুরুদেবের ছবি আছে। এক্ষেত্রে আরেক ভাইপো শিশিরকুমার বসু তাঁর বসু বাড়ি বইতে উল্লেখ করেছেন যে 'এলগিন রোডের বাড়িটা উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা ব্যারাকের মতো। মাঝখানে সারি দিয়ে ঘর, দুপাশে লম্বা খোলা বারান্দা। কোনো ঘর বা ভেতরের দালান বা উঠোন দিয়ে না গিয়ে বাড়ির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। তিনটে সিঁড়ি, বাড়ির মাঝামাঝি একতলা থেকে চারতলার ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে পুরনো স্টাইলের ভালো কাঠের সিঁড়ি, দ্বিতীয়টি বাড়ির পেছনের দিকে দোতলা রান্নাবাড়ি থেকে নেমে গেছে। তৃতীয়টি এখন আর নেই। বাড়ির একেবারে দক্ষিণে একটি ছোট্ট চার-ঘরওয়ালা দোতলা বাড়ি ছিল। যদিও বাড়িটি একটি ব্রিজ দিয়ে রান্না-বাড়ির সঙ্গে লাগানো ছিল, সেটিরও একটা আলাদা সিঁড়িও ছিল। ...ওটি ভেঙে ফেলা হয়। ... কোনো ঘরের কাউকে ব্যস্ত না করে পূব বা পশ্চিমের লম্বা বারান্দা ধরে সোজা এগিয়ে গেলে তিনটে সিঁড়ির যে কোনো একটায় পৌঁছনো বেশ সহজ ছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার পথও তিনটি ছিল বলা যায়। একটা মেন গেট। বাড়ির সামনের দিকেই কোণ ঘেঁষে রাস্তার ওপরেই একটি ছোট দরজা ছিল—পশ্চিমের লম্বা বারান্দার শেষে। আর একটা পথ দরকার পড়লে করে নেওয়া যেত। বাড়ির পিছনের মাঠে মেজো কাকাবাবু সুরেশচন্দ্রের একটা কারখানা ছিল, তার ভিতর দিয়ে।'[১৪০] উল্লেখ্য কারখানাটি ছিল ছোটখাটো গাড়ি মেরামতের এবং এটি চালাতেন সেজোদাদা সুরেশচন্দ্র বসুর পুত্র রঞ্জিত বসু, তিনিই লেখককে একথা বলেছিলেন। একদিন দোতলা নির্জন দেখে সুভাষচন্দ্র পিছনের পড়ার ঘরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কারখানা দেখেন। তাঁর স্মৃতিকথামূলক বই 'নেতার নেতা নেতাজি' বইতে লিখেছেন।[১৪১] এরপর শিশিরকুমার লিখছেন—'রাঙাকাকাবাবুর আনুষ্ঠানিক আহারের পর বাড়ির বড়রা একে একে যে যার ঘরে চলে গেলেন। মাজননীও নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। মাজননী ও রাঙাকাকাবাবুর

ঘরের মধ্যের দরজায় সেই যে খিল দেওয়া হল, ২৬ শে জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত আর খোলা হয়নি।[১৪২] অর্থাৎ পশ্চিমের বারান্দার কোণে প্রায় ঘরের লাগোয়া যে বাথরুমটি ছিল সেখানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর শিশিরকুমারের বর্ণনা অনুযায়ী 'বড়রা প্রস্থান করবার পরেই রাঙাকাকাবাবুর ঘর সাজানো শুরু হল। দেখলাম অরবিন্দকেও রাঙাকাকাবাবু দলে টেনে নিয়েছেন। বিছানার বড় বড় চাদর টাঙ্গিয়ে ঘরটাকে তিনভাগে ভাগ করা হল। উত্তর দিকে ঘরের অর্ধেকটা আলাদা রইল। দক্ষিণের বেশির ভাগটাই দাদাভাইয়ের প্রকাণ্ড খাটটা ঘিরে রইল। আর একটা ছোটো এলাকা করা হল বাইরে যাবার দরজার কাছে। সকলকে বলা হয়েছিল, ঐ এলাকা পেরিয়ে কেউ যেতে পারবে না। মাজননীর ঠাকুর সর্বেশ্বরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সে ঐ এলাকা থেকে পরদা একটু সরিয়ে খাবারের থালা একটি নিচু ছোটো টেবিলে সময় মতো রেখে যাবে। আবার সময় মতো খালি থালা সরিয়ে নিয়ে যাবে।[১৪৩] উল্লেখ্য, পশ্চিম বারান্দার কোনেই একটি কলঘর বা বাথরুমে ছিল। সেক্ষেত্রে সার্ভিস কোমোড যেদিকে রাখলে জমাদার পরিষ্কার করা অনেক সহজসাধ্য ছিল। সার্ভিস কোমোড কথা নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র রণজিৎ বসুর মতো তাঁর মাসীমা নিশাবতী বসুও স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে নেতাজি ভবনের দোতলায় যেটিকে নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ কথা বলে উল্লেখ করা হয় সেখানে সার্ভিস কোমোড রাখলে এবং বাইরের জমাদার এসে পূর্বদিকের বারান্দার দিকের একমাত্র প্রবেশের দরজা দিয়ে ঢুকে সার্ভিস কোমোড নিয়ে যেতে হত যা একেবারেই বাস্তবসম্মত নয় যেখানে পর্দার তলা দিয়ে খাবার সরবরাহ করা হত। অর্থাৎ নেতাজি কোন ঘরটিকে বা ঘরগুলিকে নির্জনবাসের জন্য নিয়েছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। মাজননীর কক্ষ যদি উত্তর কোণের পশ্চিমদিকের অর্থাৎ বাঁদিকেরটি হয় ('বসু বাড়ি' বইতে শিশিরকুমার লিখলেও, এবং দীর্ঘদিন ওই কক্ষটিকে মাজননী প্রভাবতী দেবীও দাদাভাই জানকীনাথ বসুর কক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করলেও নেতাজি জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে অজ্ঞাত কারণে মাজননী ও দাদাভাই-এর কক্ষটিকে শিশিরকুমারের পিতামাতার নামে অর্থাৎ শরৎ বসু ও প্রভাবতী দেবীর বাসকক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। মাজননীর গুরুদেবের ছবিসহ ঘরটি নেতাজির মহানিষ্ক্রমণের কক্ষ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রতিদিন সমাজের অসংখ্য দর্শনার্থী আসেন।) তা হলে তাঁর দুই গুরুদেবের ছবি কেন কথিত মহানিষ্ক্রমণের কক্ষে থাকবে? কথিত মহানিষ্ক্রমণের কক্ষে বাঁদিকের দরজা দিয়েই পশ্চিমদিকের ঘর হয়ে কলঘরে যেতে হয়। অন্যদিকে আরো বিভ্রান্তির অবকাশ হয়েছে দুই ভাইপোর বর্ণনায় ও আরো অন্য কিছু স্মৃতিকথায়। রণজিৎ বসু ডাঃ মণি দে কে নিয়ে এলেন যে ঘরে সেটিতেই কী তিনি নেতাজির অন্তর্ধান পর্বে নির্জনে থাকা সুভাষচন্দ্রের ঘরে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে নিয়ে এসেছিলেন? ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের শেষসপ্তাহে সন্ধ্যাবেলায় এক বিশেষ সাক্ষাৎকার হয়। দেশভাগের আগে সম্পূর্ণ অন্তর্ধান পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। সেগুলি অতি গোপনে সংগ্রহ হয়। মেজদা শরৎ বসুর কাছ থেকেও এ ব্যাপারে অর্থ উনি নেননি। এমন কী শরৎ বসুও ও শিশির বসু আদৌ মহানিষ্ক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে জানিয়েছিলেন শরৎ বসুর আপ্ত সহায়ক নিরোদ চন্দ্র চৌধুরী যিনি উডবার্ন পার্কের বাসিন্দা ছিলেন।[১৪৪] এমনকী নেতাজি সংক্রান্ত যে নথিপত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশ করে সেখানেও ১৯৪১ সালের গোয়েন্দা রিপোর্টগুলি বেপাত্তা ছিল। এমনকী শিশির বসু সংক্রান্ত গোপন ব্রিটিশ নথিতে দেখা গেছে নেতাজি সম্পর্কে বিদেশে শিশির বসুর বাজার সংক্রান্ত খবরাখবর লিপিবদ্ধ থাকলেও তিনি ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাতে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছেন এমন কোনো কথা লেখা নেই। ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।[১৪৫] যাই হোক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার নেতাজির অন্তর্হিত হবার আগে যে ঘরে থাকতেন সেখানে যাবার বর্ণনা দিয়েছেন—'...নির্দিষ্ট সময়ে আমি এলগিন রোডের বাড়িতে গেলাম। বাড়ির দরজায় ২/৩ জন পুলিশ বা

মিলিটারী লোক ছিল—কিন্তু তাহারা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ভিতরে যাইতে কোনোরূপ আপত্তি করিল না। কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল। আমার নাম শুনিয়াই বলিল—আসুন আমার সঙ্গে। পরিচয় দিল সে সুভাষের ভাইপো। আমি তাহার পিছে পিছে একটি কি দুইটি শূন্যকক্ষ পার হইয়া আর একটি কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের কাছে পৌঁছিলাম। সে বলিল, আমার আর যাইবার অনুমতি নাই। আমি চলিয়া যাইতেছি। আপনি তাহার পর এই দরজা খুলিয়া ভিতরে যাইবেন।' ভিতরে গিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোণে একটি খাটের উপর সুভাষ শুইয়া আছে। তাহার মুখময় দাড়ি গজাইয়াছে। মনে করিলাম অসুখ বলিয়াই বোধহয় দাড়ি কামায় না। খাটের নিকটে একখানি চেয়ার ছিল—তাহাতে বসিয়া সুভাষের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম আমাকে কেন ডাকিয়াছ। সুভাষ বলিল—কিছু টাকার দরকার। আমি বলিলাম, তুমি তো পীড়িত, শয্যাশায়ী—এ অবস্থায় টাকা দিয়া কি করিবে? সুভাষ একটু হাসিয়া জবাব দিল—এ প্রশ্ন তো কোনোদিন করেন নাই, টাকা চাহিলেই দিয়াছেন—আর সেই ভালো—কারণ আপনারা বিপদে পড়েন এটা আমরা চাই না। আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম—সে কথা ঠিক, টাকা কিসের জন্য চাও কখনো জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে টাকা চাওয়া মানে কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া, তোমার এই গুরুতর অসুখ, তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে বলিয়াই তোমাকে জেল হইতে বাড়িতে পাঠাইয়াছে। সে বলিল, না আমার অসুখ খুব গুরুতর নয়। তারপর কি ভাবে কাহার মারফত টাকা পাঠাইতে হইবে ইহা স্থির করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম....'[১৪৬] উল্লেখ্য ১৯২১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে ড. মজুমদার কাজ করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঘোষের মতো বহু অধ্যাপকরাও জানতেন যে ড. মজুমদার এবং তাঁদের মতো অধ্যাপকরা দেশের কাজে গোপনে অর্থ সংগ্রহ করে রাতের বেলায় বিপ্লবীদের প্রতিনিধির হাতে অর্থ তুলে দিতেন। ইতিহাসে ঘটনা তেমনভাবে তুলে ধরা হয় নি। ড. মজুমদারের উক্ত স্মৃতিকথায় স্পষ্ট দুটি জিনিস—প্রথমত, রুদ্ধদ্বার তাঁর একান্ত বাস অনেক আগেই শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দুটি ঘর পার হয়ে তিনি তৃতীয় ঘরের এককোণে একটি ঘরে সুভাষচন্দ্র শুয়েছিলেন দেখেছিলেন। অন্য এক জায়গায় লিখেছেন—'দোতলায় উঠিয়া দুই একটি ঘরের মধ্য দিয়া এলাম—জনপ্রাণী দেখিলাম না—মনে হইল বাড়িটি জনশূন্য।[১৪৭] এই দুটি তথ্য থেকে স্পষ্ট যে সত্তরের দশকে প্রকাশিত 'মহানিষ্ক্রমণ' ও ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'বসু বাড়ি' বইতে উল্লেখ করা হয়েছে যে মাজননী প্রভাবতী দেবী ও বাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে সবাই মিলে সান্ধ্যভোজন পর্ব সেরেই সুভাষচন্দ্র রাতে শিশির বসুর সঙ্গে মটর গাড়ি করে মহানিষ্ক্রমণ করেন তা সত্য হতে পারে না। দ্বিতীয় তথ্য থেকে স্পষ্ট অসুস্থ সুভাষ নির্জন বাসের কক্ষ হিসাবে এবং একান্ত গোপনীয় কক্ষ হিসাবে তাঁর নিজের ঘরেই থাকতেন। মাজননীর ঘরটিতে যেটিতে পৌঁছাতে গেলে পূর্বদিকের লম্বা বারান্দা যা বাইরে থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান হত সেই পথে যেতে হত অথবা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে লাগোয়া দরজা দিয়ে যেতে হত। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেননি বারান্দা অতিক্রম করে যাবার কথা। যদিও শিশিরকুমার তাঁর বইতে জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে মালপত্তর সঙ্গে নিয়ে পূর্বের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে গৃহত্যাগের কথা লিখেছেন যা কার্যত অবাস্তব।

এক অন্য স্মৃতিকথায় জানা যাচ্ছে, তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও একদা সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়ার আগে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন বিবাদ ও দূরত্ব মিটিয়ে নিতে। সেই জন্য তিনি তৎকালীন আনন্দবাজারের সাংবাদিক সরোজ রায়চৌধুরীকে টেলিফোনে ওইসময় এলগিন রোডের বাসভবনে ডেকে নিয়েছিলেন। '...তিনি খাটের উপর বসে। মুখে একমুখ দাড়ি। বেশ রোগা চেহারা। জিজ্ঞাসা করলাম, দাড়ি কামান নি কেন? হেসে বললেন, কী আর হবে কামিয়ে? আবার তো সেই জেলে। কুশল প্রশ্ন এবং গোটাকয়েক আজেবাজে কথা বলার পর বললেন, শোনো, তোমাকে একটা বিশেষ দরকারে ডেকেছি।

—বলুন।

—কিরণবাবুর সঙ্গে আমার আপোষ করিয়ে দিতে হবে।...'[১৪৮] যেটিকে নেতাজি কক্ষ বলা হয় তা মাজননীর ঘর। রণজিৎ বসু ও ললিতা বসু (সুরেশচন্দ্র বসুর পুত্র ও কন্যা) লেখককে একদা এমন কথাই বলেছিলেন। এমনকী পরবর্তী কালেও তাঁদের সেই কথার সমর্থন মিলেছে বসু পরিবারের এক সদস্যের বক্তব্যে।[১৪৯] ব্রিটিশ গোয়েন্দার এক সূত্রে জানা যায় কিরণশংকর রায় নাকি গোপিকা বিলাস ও তাঁর সঙ্গে আয়ুর্বেদ চিকিৎসক কবিরাজ বিমলানন্দ ২৫ জানুয়ারি দেখা করতে যান এবং দেখেন বাঘের চামড়ার ওপর একমুখ দাড়ি ও গোঁফ নিয়ে কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে ধ্যান করছেন। সে সময় তিনি মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন বলে কোনো কথা হয়নি। তাঁকে সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে দু'দিন আগে ২৩ জানুয়ারি মুসলিম লিগের এম.এ.এইচ ইস্পাহানি সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা করেছেন বলে গড়িয়াহাট রোড বালিগঞ্জের গোয়েন্দা রিপোর্ট লেখা হয়েছে ২৭ জানুয়ারি ১৯৪১।

জানুয়ারি মাসের টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত এবং অন্ধকারে ছিলেন। দুই পুলিশ গোয়েন্দা দফতরের পারস্পরিক বিবাদ সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগকে কেন্দ্র করে চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে। একবার তাঁরা ভাবছেন ২৫ তারিখ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র নিশ্চিত ঘরে ছিলেন অন্যদিকে তাঁদের ধারণা একসপ্তাহ আগেই হয়তো তিনি অন্তর্ধান করেছেন।[১৫০] শেষমেষ তাঁরা নিজেরাই সান্ত্বনা খুঁজেছেন তাৎক্ষণিকভাবে এই যে সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করে নিজেই নিজের ক্ষতি ডেকে এনেছেন। তিনি বিদেশে চলে গেলে আর এদেশে ফিরতে পারবেন না আর এদেশে থাকলে তাঁকে গ্রেফতার করা সময়ের প্রতীক্ষা মাত্র। বোস জাপান অথবা রাশিয়া চলে যেতে পারে।[১৫১] সুভাষচন্দ্র গৃহে সুস্থ হয়ে গেলে তিনসপ্তাহ পরেই তাঁকে ব্রিটিশের গ্রেফতার পরিকল্পনা ছিল।[১৫২] শেষমেষ ব্রিটিশ গোয়েন্দা এমন ব্যাখ্যাও এনেছেন যে এক) সুভাষচন্দ্রের অতীতের ইতিহাস বলে যে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন। তাঁর জন্মকুণ্ডলীর ছকে বলা হয়েছে ৪৬ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। এবছর ২৩ জানুয়ারি তাঁর ৪৪ বছর পূর্ণ হয়েছে। দুই) তাঁর অন্তর্ধান কোনো পরিকল্পিত কাজের জন্য যদি হয় যা এখনো স্পষ্ট নয়।[১৫৩] নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় গোপন নথি প্রকাশিত না হবার কারণে জানা যাচ্ছে না আপোশ রাজনীতিতে কিরণশংকর রায় সত্যিই কী গোপিকাবিলাসকে ওই সময় পাঠিয়ে ছিলেন? গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করতে না কি গোয়েন্দাকূলের 'ইচ্ছাকৃত' কোনো ব্যর্থতা কাজ করেছে? ডা. মণি দে'র কাছ থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেট সুভাষচন্দ্রের উকিল বড়দা প্রসন্ন পাইনের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।[১৫৪] ডা. মণি দে বহুকাল পরে রণজিৎ বসুর আবদার মতো গড়িয়ার জমি অর্ধেক দামে দিয়েছিলেন এবং তখন বলেছিলেন—'তুমি হয়তো জাননা তোমাদের বাড়ির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক,—আমি তোমাদের বাড়িতে কতদিন তোমার ঠাকুমার কাছে মুগের ডাল আর পার্শে মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছি।...'[১৫৫] অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যা হবার কারণে নিরামিষাশী হলেও নিকট পরিচিত জনের জন্য আমিষ রান্না করেছেন। উল্লেখ্য, রঞ্জিত বসু একদা লেখককে জানিয়েছিলেন যে তাঁর রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশ মতোই ভবানীপুরের বিখ্যাত দাস স্টুডিওর মালিক রাদু দাসকে এলগিন রোডে মাজননীর ঘরে তিনি নিয়ে এসেছিলেন। দেশত্যাগের আগে সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল তাঁর মা-এর সঙ্গে ছবি তুলে রাখা। সেই বিখ্যাত ছবিগুলির একটিতে দেখা যায় মা জননীর ঘরে বড়দাদা সতীশচন্দ্র বসু ও মেয়র সিদ্দিকি সাহেব বসে আছেন আর অর্ধ শায়িত সুভাষচন্দ্রের মা সুভাষের মাথায় হাত দিয়ে ওপরে গুরুদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। পরবর্তীকালে দাস স্টুডিওর প্রয়াত রাদু দাসের পুত্র সুনীল দাসও সেদিনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন লেখকের কাছে। নির্জন বাসের আগে সুভাষচন্দ্র মায়ের সঙ্গে ছবি রেখে গেলেন। তাঁর এই আচরণগুলি থেকে স্পষ্ট গোপন আলোচনার জন্য তাঁর সেই ঘরে থাকতেন যেখানে ডা. রমেশচন্দ্র মজুমদার, কিংবা ন'দাদা ডা. সুনীল

বসু ও ডা. মণি দে গিয়েছিলেন আর একটু বাইরের লোকজনের ব্যাপার থাকলে উত্তর কোণের লম্বাটে মাজননীর ঘর ব্যবহার করতেন। যেমনটা সাংবাদিক কিংবা মেয়র উপস্থিত থাকতে পারেন। পাশাপাশি দুটির ঘরের প্রশস্ত কাঠের গুলগুলি (খরখড়ি) যুক্ত কাঁচের জানালা দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে ও পিছনের দিকের কিছুটা খুব সহজেই নজরদারি চালানো যেত।

১৯৪১ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে গৃহত্যাগ ও বাংলা ত্যাগের পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখকের 'নিরুদ্দেশের পথিক' বইতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে শিশির বসুর বর্ণিত ১৬ জানুয়ারি ভোজনপর্ব সবার সঙ্গে বসে করার পর মধ্যরাতে পূর্ণিমা জ্যোৎস্নায় গাড়ি চেপে সামনের গেট দিয়ে সশব্দে গোয়েন্দাকূলের মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রমণ সম্ভব ছিল না এবং এর সমর্থনে কিছু মৌখিক বক্তব্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য গোয়েন্দানথি বা প্রামাণ্য সাক্ষ্য মেলেনি। রমেশচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য স্মৃতিকথাতেও জানা যাচ্ছে যে সুভাষচন্দ্র সত্যই নির্জনবাস করেছিলেন এবং তাঁর অন্তর্ধানের পর ভাইপো ভাইয়েরা সেই নাটক চালিয়ে গেছেন ২৬ তারিখ পর্যন্ত। বিপ্লবী মন্ত্রগুপ্তির শপথে থাকা দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সত্যরঞ্জন বক্সী প্রয়াণের কয়েকমাস আগে বলেছিলেন—'যাবার আগের রাতে দেখা হলো এলগিন রোডের বাড়িতে! জড়িয়ে ধরলেন সুভাষবাবু। অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বললেন—'সত্যবাবু এই শেষ দেখা।' একটি মুহূর্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল, থরথর করে কেঁপে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। নির্গত অশ্রুকে পরক্ষণেই অগ্রাহ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন—'না , না সত্যবাবু—'we shall live together, die together'[১৫৬] এমনই এক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন একদা তাঁর সারথিও, ভাইপো রণজিৎ বসু—'সম্ভবত সেই ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের দিন রাত প্রায় ১০টা নাগাদ রাঙাকাকাবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন ... সেদিন রাতে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করেছিলাম রাঙাকাকাবাবুর অন্তরীন কক্ষে। দেখেছিলাম তাঁর অপূর্ব সৌম্যমূর্তি। পরণে গেরুয়া রংয়ের গরদের ধুতিচাদর, কপালে সিঁদুরের লাল তিলক। তিনি হাসিমুখে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার কারখানা কেমন চলছে' একটা সাধারণ উত্তর দিয়েছিলাম, কি উত্তর দিয়েছিলাম তা আজ আর স্মরণে নেই। তারপর রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন—'তুমি কোনওদিন রাজনীতি কোরো না। সেজদার সংসারের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।' এইরকম কিছু বাক্যালাপের পর সুভাষচন্দ্র আমাকে ওঁর বাহুবন্ধনে জড়িয়ে মাথার ওপর ওঁর মুখটা রাখলেন। সেই সময়ে কী যে অনুভূতি হচ্ছিল আমার বলার নয়। শরীরের ভেতরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ রয়ে যাচ্ছিল। নিজের মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাকে বাহুমুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এক ছুটে সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম বেশ মনে আছে। আমার ধারণা এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই রাঙাকাকাবাবু সন্তর্পণে ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে গৃহত্যাগ করেন।'[১৫৭] লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল ওনার মুখ দিয়ে সেদিনের এই কাহিনি শোনার, যতবার নানা সময়ে এই প্রসঙ্গ তুলেছি কমপক্ষে প্রায় চোদ্দবার প্রতিবারেই লক্ষ্য করেছি রণজিৎ 'জেঠু' (এই নামেই ওনাকে সম্বোধন করতাম) অত্যন্ত আবেগদৃপ্ত হয়ে কথাগুলি বলতেন এবং চোখ জলে ভিজে উঠত। দোতলা নির্জন থাকাকালে দুপুর বেলায় সোজা দক্ষিণ দিকে পড়ার ঘর (পরবর্তীতে ভেঙে দেওয়া হয়) এর সিঁড়ি বেয়ে সোজা রণজিৎ বসুর কারখানা 'পরিদর্শনে' এসেছিলেন হয়ত বা বহির্গমনের পথটি দেখে নিতে এসেছিলেন। অনুমান করা যায় নেতাজির নির্জনবাসের সময় ডানঘরে তাঁর মাতাঠাকুরানী থাকতেন। দক্ষিণ দিকের ঘরে বিশ্বস্ত ভাইঝি ইলা বসু থাকতেন অন্যান্যরা দক্ষিণ দিকের ঘরগুলিতে। একতলায় ও পুরো তিনতলায় বাকি দাদারা পরিবার নিয়ে থাকতেন। দোতলাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন থাকত বলেই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল দক্ষিণে কারখানায় পৌঁছে যাওয়া কিংবা সন্ধ্যায় নির্জন প্রায় অন্ধকার দুটি ঘর দিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুভাষের ঘরে পৌঁছে যাওয়া। বর্তমানে রমেশ মজুমদার উল্লেখিত কক্ষগুলি হল মাঝের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁদিকের প্রথম ঘরটি অফিস ঘর, দ্বিতীয় ঘরটি লাইব্রেরি রুম এবং আরো একটি

কক্ষ যেটিতে বর্তমানে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর চেয়ারপার্সন/ডিরেক্টর/সেক্রেটারি ব্যবহার করেন। সম্ভবত সুভাষচন্দ্রের আসল ঘরটিকেই বিভক্ত করে ওই বিশেষ ঘরটির নির্মাণ হয়েছে। ওই পরপর ঘরদুটির দুপাশ দিয়েই দীর্ঘ বারান্দায় যাওয়ার দরজা আছে।

উপরের আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় এই সময় মাজননীর উপলব্ধি ও ভূমিকা যা ইতিহাসের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে হয়তো বা চিরকালের জন্য। মাতৃভক্ত সুভাষচন্দ্রের মর্ম যন্ত্রণা, একদিকে গর্ভধারিণী মা অন্য দিকে পরাধীন দেশমাতার প্রতি কর্তব্য দায়িত্ব—যা শুধুমাত্র কল্পনাতেই অনুভব করা সম্ভব। সুভাষকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, ভালোবেসেছেন মাজননী একটু বেশিই। ধর্মেকর্মে মতি আর সুভাষের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর জীবনধারা প্রভাবতী দেবীকে সুভাষের প্রতি দুর্বল এবং আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল তা পরবর্তীকালে নানা ঘটনায় স্পষ্ট হয়। সুভাষচন্দ্রও তাঁর মাতাঠাকুরানীর প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন তা বোঝা যায় যখন বাইরের ক্যামেরাম্যান দিয়ে মায়ের সঙ্গে ছবি তোলার মধ্যে। সেদিন ঘটনাচক্রে মেয়র সিদ্দিকি সাহেব এসে পড়ায় বড়দা সতীশ বসু আপ্যায়িত করেন কিন্তু অন্য কোনো দাদা-বৌদিদের জন্য নয়, স্রেফ মায়ের সঙ্গে ছবি তুলে রাখা এবং তা গভীর স্মিত হাসির মাধ্যমে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২৬ জানুয়ারি জানা গেল (এই খবর ওই নিকট স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়) সুভাষচন্দ্রকে তার ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে আনন্দবাজারের সুরেশচন্দ্র মজুমদার টেলিফোনে ভোর ৩টের সময় রণজিৎ বসুর কাছ থেকে সব শুনে পরদিন গৃহত্যাগের খবর আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ডে প্রকাশ করেন।[১৫৮]

সুভাষচন্দ্রের মাসীমা নিশাবতী দেবী স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন—'... তার হঠাৎ অন্তর্ধান হবার আগে আমি একদিন তাদের ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেইদিনই ওখানে শুনলাম যে সুভাষ হবিষ্যান্ন করেছে ও সেদিন থেকে আটদিনের জন্য মৌন গ্রহণ করবে। নিজের ঘরে আলাদা থাকবে। সেই ঘরের ভেতর পর্দা দিয়ে একটা আলাদা জায়গা করা হয়েছিল। যেখানে একটা কমোড (commode) রাখা ছিল। যাতে তাকে বাইরে কলঘরে পর্যন্ত না যেতে হয়। সেই ঘরে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। যেদিন সুভাষ অন্তর্ধান হয় সেদিন সারারাত টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এ যেন ভগবানই তাকে সাহায্য করেছিল। শুনেছি সেদিন রাত্রে লাঠি হাতে গেরুয়াধারী একজন সন্ন্যাসী সন্ধ্যার সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মনে হয় সেই গেরুয়াধারী লোকের পোষাক পরেই সুভাষ বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যাতে লোক তাকে চিনতে না পারে এইজন্য সে ক্ষৌরকার্য করত না অনেকদিন। তখন ইংরেজদের খুব কড়া শাসন ছিল। এলগিন রোডের বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সর্বদা গোয়েন্দা-পুলিশ থাকত। এমনকি তখন যে গাড়ি সুভাষদের বাড়িতে যেত তার নম্বর পুলিশ-গোয়েন্দার খাতায় উঠে যেত। তার মধ্যে থেকে যে কীভাবে সুভাষ অন্তর্ধান হয়েছিল ভেবে কুল পাই না।...'[১৫৯]

সুভাষজননী প্রভাবতী দেবী ওই আবহে বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের ব্রত উদযাপনের এবং ব্রিটিশের নিষ্ঠুর আচরণের আবর্তে কেমন ছিলেন? তাঁর মননের কথা বৃহত্তর বসু পরিবারের কেউ তেমনভাবে লিপিবদ্ধ করে না গেলেও তাঁর গুরুদেবের পার্ষদ স্মৃতিকথায় লিখেছেন সেদিনের গল্প—'...সুভাষজননী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলতে চাই; একথা তাঁরই মুখে শুনেছিলাম। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর C.I.D. বিভাগের একজন উচ্চ রাজকর্মচারী এসে তাঁকে প্রশ্ন করেন—সুভাষবাবু অসামান্য মাতৃভক্ত ছিলেন। আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে তিনি কোনো কাজেই হাত দিতেন না—আমরা জানি। তিনি অন্তর্ধানের পূর্বে আপনাকে নিশ্চয়ই বলে গিয়েছেন যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনি সেটা অনুগ্রহ করে আমাকে জানিয়ে দেবেন কি?' সুভাষজননী সেই রাজকর্মচারীটিকে বলেছিলেন—আপনার কথার উত্তর দেবার আগে আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন—আমার এই বাড়ির আশপাশ চারদিকে গোয়েন্দা দিয়ে আপনারা এমনভাবে ছেয়ে রেখেছেন যে একটা কাক-বকও আপনাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যেতে পারে না। এ অবস্থায় আমার ছেলে যে আপনাদের

সদাজাগ্রত সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও চলে যাবে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য, তাই আমার ছেলেকে আপনারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন আগে তার জবাব দিন'[১৬০]

উল্লেখ্য, সেই সময়কার বিস্তারিত গোয়েন্দা নথিপত্র পশ্চিমবঙ্গের নেতাজি ফাইল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়নি। শিশিরকুমার বসুর মহানিষ্ক্রমণ বইতে একটি ছবি দেওয়া হয় যে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর তাঁর কক্ষের ছবি সেখানে কোনো কমোড বা কিছুরই ছবি নেই। বোঝা যায় ছবিটি পরে সাজিয়ে তোলা। কোনো গোয়েন্দা বিভাগের ছবি নয়।

১৯৪১ সালের একটি ঘটনা বলেছেন হরিদাস মিত্র, যিনি ছিলেন বিবাহ সূত্রে এলগিন রোডের বসু বাড়ির আপনজন। সুরেশচন্দ্র বসুর কন্যা বেলা বসুর স্বামী 'একটি স্মৃতিচারণ' শীর্ষক ছোট্ট ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর ডেপুটি স্পিকার (পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার) এর সরকারি লেটার হেডে।[১৬১]

'সেটা বোধহয় ১৯৪১ সাল। আজ থেকে ৬/৭ বছর আগেকার কথা। আমি একটি নতুন ক্যামেরা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, নেতাজির মা যাঁকে আমরা 'মাজননী' বলে ডাকতাম, তাঁরই ছবি প্রথম তুলবো। তাঁকে এই অনুরোধ করলে তিনি খুব খুশী হলেন এবং আমি তাঁকে নেতাজি ভবনের গাড়ি বারান্দার ছাতে দাঁড়াতে বলাতে তিনি তখনই ছাতে না দাঁড়িয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন এবং পর মুহূর্তে দেখলাম তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একটি বাঁধান ছবি মাথায় করে নিয়ে, ছবি তুলবার জন্য দাঁড়ালেন। আমি অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম, সেদিন বুঝেছিলাম গুরুভক্তি কাকে বলে। আমি দীর্ঘদিন জেলে থাকায় এবং নেতাজি-ভবন থেকে নেতাজি পরিবারের লোকেদের অন্যত্র যাওয়ায়, সে অমূল্য ছবিটি কোথায় চলে গেছে জানিনা। কিন্তু এ ঘটনাটি আমার মনের গভীরে এমন দাগ কেটে রেখেছে যা কখনও ভুলতে পারি না।'—হরিদাস মিত্রের স্বাক্ষরিত এই মূল্যবান স্মৃতিগাথায় স্পষ্ট মাজননী তাঁর গুরুদেবের ছবি তাঁর শোবার ঘরে কোথাও স্থাপন করেছিলেন এবং দ্রুত নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। অনেক উঁচুতে টাঙানো থাকলে (এখন যেভাবে রয়েছে মিউজিয়ামে) তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না দ্রুত নামিয়ে আনা। হরিদাস মিত্র নেতাজির প্রেরিত সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনকে (ডা. পবিত্র মোহন রায় প্রমুখ) সাহায্য করার অপরাধে ফাঁসির আদেশ পান। শেষমুহূর্তে তা রোধ হয়েছিল। অনুমান করা যায় সুভাষের নিরুদ্দেশের কারণে হয়তো তাঁর আরও বেশি গুরুদেবের প্রতি নির্ভরতা বেড়ে গিয়েছিল, হয়তো আসনে রেখেই পুজোপাঠ করতেন যদিও তা সঠিকভাবে বর্তমানে বোঝার উপায় নেই কারণ মিউজিয়াম করতে গিয়ে অনেক কিছুই বদল করা হয়েছে যা ইতিহাসের স্বার্থে করা অনুচিত কাজ। তবে লেখকের মনে আছে আশির দশকের একেবারে প্রথমে নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা বসু একাধিক নেতাজির দুঃপ্রাপ্য ছবি, বিশেষ করে তৎকালীন যুগান্তর ও অমৃতবাজার (ইংরাজি দৈনিক) পত্রিকা দফতরের ছবিগুলি নিয়ে এসেছিলেন হাজরা মোড়ের সোম স্টুডিওতে তাঁর সঙ্গে নেতাজির মায়ের একটি ছবি ছিল যেটিতে প্রভাবতী দেবীর বয়সকালের ছবি ও ডান চোখটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে রি-টাচ করার দরকার ছিল। ললিতা বসু সেই সময় 'অল ইন্ডিয়া নেতাজি মিশন' স্থাপন করেছিলেন কোদালিয়াতে। স্টুডিওতে কৈশোরকালে সেদিন ললিতা বসুর সঙ্গেই গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় ললিতা বসু দিল্লি গেলেন আর ফেরত নিতে পারেননি সেই অমূল্য ছবি সম্ভার। সোম স্টুডিওর কর্ণধার বিমল সোম থাকতেন ভবানীপুরের সুবার্বান স্কুল রোডে (বর্তমানে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সরণি)।

শরৎ বসুর কন্যা প্রয়াতা গীতা বিশ্বাস হয়তো স্মৃতি বিস্মরণের কারণেই তাঁর 'পুরানো সেই দিনের কথা' (ফেব্রুয়ারি ২০০১) পুস্তকে লিখেছিলেন মাজননী প্রভাবতী দেবী সুভাষের গৃহত্যাগের আগে নিমাই সন্ন্যাস দেখেছিলেন—'রাঙাকাকাবাবুর দেশত্যাগের প্রস্তুতি চলছে। সে সময় 'নিমাই সন্ন্যাস' সিনেমাটি প্রদর্শিত হচ্ছিল। আমাদের মাজননী কখনও সিনেমা দেখতেন না। বাবা একদিন তাঁকে বললেন, 'শুনছি 'নিমাই সন্ন্যাস' ছবিটি খুব ভালো হয়েছে, তুমি, নাতি নাতনিদের নিয়ে বইটি দেখে এসো।' বাবা সব টিকিটের ব্যবস্থা

করেছিলেন। মাজননীকে নিয়ে আমরা অনেকে ছবিটি দেখতে গেলাম। মাজননী ছবিটি দেখে অভিভূত। নিমাই যখন গৃহত্যাগ করছেন, মাজননী খুব কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'আমার নিমাইও কোনোদিন এভাবে চলে যাবে।' অল্পদিনের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু দেশত্যাগ করলেন।' [১৬১(ক)], উল্লেখ্য, এমন দুটি তথ্যগত ভুল ওই পুস্তকে লক্ষ্য করা গেছে। যেমন ওই একই পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে অনশনে শহীদ যতীন দাস-এর মৃত্যুর সময় 'রাঙাকাকাবাবু তখন কারারুদ্ধ'। [১৬১(খ)] তথ্যটি সঠিক নয়। ৬৩ দিন অনশনে শহীদ যতীন দাস-এর মরদেহ কলকাতায় গ্রহণ ও শোক মিছিল পরিচালনা যাবতীয় সুভাষচন্দ্র বসুই করেন। অন্য ভুল তথ্যটি হল যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর প্রয়াণ এর পর তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে কারাবন্দী সুভাষ চিঠি লিখেছিলেন সুদূর বার্মার মান্দালয় জেল থেকে। আন্দামান জেল বলে উল্লেখ করেছেন গীতা দেবী [১৬১(গ)] হয়তো স্মৃতি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেনি বলেই।

গীতা বিশ্বাস তাঁর 'পুরানো সেইদিনের কথা' পুস্তিকায় মাজননী প্রভাবতী দেবী সম্পর্কে লিখেছেন—

'আমাদের মাজননী প্রভাবতী বসু ছিলেন তীক্ষ্ন বুদ্ধি সম্পন্না। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর ছেলেদের কোনোরকম পড়াশুনায় অবহেলা তিনি বরদাস্ত করতেন না। বাড়িতে সব কাজ নিয়মের সঙ্গে চলত। আমাদের মনে হত দাদাভাই যেমনই নরম, মাজননী তেমনি কড়া। কিন্তু এইসব গুণের দ্বারাই তিনি সংসার পরিচালনা করেছেন ও সন্তানদের গড়ে তুলেছিলেন। [১৬১(ঘ)]। এ প্রসঙ্গে একটি মজার কথা লিখেছেন গীতাদেবী—'...আমাদের মা জননীর কয়েকজন ছোটোভাই তাঁদের কাছে মানুষ হয়েছিলেন তাঁরা বয়সে জ্যাঠাবাবু বা বাবার থেকে ছোটো। আমার কাকাবাবুদের সমবয়সী ছিলেন। আমাদের কাকাবাবুদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাঁরা একসঙ্গে পড়তেন, একসঙ্গে শুতেন। পড়ার ঘরে পড়তে বসে তাঁরা খুব গল্প করতেন। কিন্তু মাজননীর কড়া নজর থাকত। তিনি পড়ার ঘরের সামনে যাতায়াত করে তাঁদের পড়ার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। মাজননী যখনই দেখতেন, তাঁর ছোটোভাই রণেন্দ্রনাথ দত্ত (Chartered Accountant) তাঁর একটি মুখস্থ করা কবিতা বলতে শুরু করতেন। তাঁর ধারণা ছিল মা জননী তো ইংরাজি জানেন না। তিনি চালাকিটা ধরতে পারবেন না। কিন্তু মাজননী সবই বুঝে তাঁকে বললেন তিনি কিছুই পড়ছেন না। তিনি বললেন 'কেন আমি তো ইংরাজি কবিতা পড়ছি।' মাজননী বললেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি, যখনই আসছি একই কবিতা পড়ে যাচ্ছ'; মাজননীকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য ছিল না। এই গল্প নতুন কাকাবাবুর (ডা. সুনীলচন্দ্র বসু) কাছে শুনেছি।' মাজননী প্রসঙ্গে এমনই একটি মজার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি—[১৬১(ঙ)] '...আমাদের দাদাভাই ও মাজননী ছিলেন উড়িষ্যাবাসী। বাবারাও স্কুল পর্যন্ত সেখানেই পড়াশুনো করেছিলেন। আমাদের বাড়ির লোকজন বেশিরভাগই উড়িষ্যার ছিল। একবার রাঙাকাকাবাবুর কাজ করছিল হরিয়া বলে একজন। হরিয়ার দোষ ছিল সে ছোটোখাটো কিছু জিনিস হস্তগত করত। রাঙাকাকাবাবু খুব গোছানো ছিলেন না। তিনি একদিন হরিয়াকে বললেন, 'দ্যাখ হরিয়া, আমার কিন্তু অনেক কাগজপত্র ছড়ানো থাকে, তুই এতে চক্ষুদান করিস না।' হরিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'আমি তো মার জিনিস ছাড়া কারও জিনিসে হাত দিই না।'...' [১৬১(চ)]

এলগিন রোডের বাড়ির সেই পড়াশুনোর ঘর যেখানে মাজননী প্রভাবতী দেবী সবার পড়াশুনোর দিকে মাঝে মাঝে নজর রাখতেন, একতলার রান্নাঘরের পাশেই ছিল পিছনের জায়গাটাতে যাবার পথে সেই ঘরগুলি একসময় ভেঙে ফেলা হয়। আজ প্রধান ফটক দিয়ে সোজা পিছনের মাঠে যেখানে একটি বড় হলঘর তৈরি করে নাম রাখা হয়েছে 'নেতাজি প্যাভিলিয়ন' সেখানে যাবার পথেই দেড়তলায় পড়াশুনো চলত। সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের অনেক পরে ঘরগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ প্রভাবতী দেবী পুরীর বিখ্যাত রথযাত্রায় থেকেছেন। বঙ্গদেশের সবচেয়ে বড় মাহেশ-এর রথযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন বলে জানা

যায়। রিষড়াতে ছিল শরৎ বসুর বাগানবাড়ি। গীতাদেবী লিখেছেন—'রিষড়ার অদূরে মাহেশ। সকলেই জানে মাহেশের রথযাত্রা বিখ্যাত। রথের সময় আমরা মাজননীকে নিয়ে মাহেশের রথযাত্রা দেখেছি। রিষড়ার G.T. Road এর উপর অবস্থিত। আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর হল তুলসীচন্দ্র গোস্বামী পরিবারের আদি বাসস্থান।...' [১৬১(ছ)] উল্লেখ্য একদা কংগ্রেসের বিগ ফাইভের অন্যতম ছিলেন, তুলসী গোস্বামী। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এক 'হট প্যাটিস' বিক্রেতা হাঁকডাক করে খাবার ফেরি করতে আসত। সুভাষচন্দ্রের বিশ্রামের সময় বাড়ির কচিকাঁচা, ভাইপো ভাইঝিরা অনেক সময়ই ঘিরে থাকত তাঁকে। তিনি হট প্যাটিস নিজে খেতেন এবং সবাইকে খাওয়াতেন। তবে দুপুরবেলা সেই লোকটি যাতে ডাকাডাকি করে মাজননীর ঘুম না ভাঙিয়ে দেয় সেই জন্য সুভাষচন্দ্র বলে দিয়েছিলেন 'সে যেন সময়মত এসে দাঁড়ায়। আমরা তার কাছ থেকে নিয়ে আসব। তাঁর ডাকে মাজননীর যদি ঘুম ভেঙে যায়, তাই এই সতর্কতা।' [১৬১(জ)] তিনি আরো লিখেছেন 'রাঙাকাকাবাবু নানা রকম ভাজাভুজি খেতে খুব ভালোবাসতেন। এটা হয়তো মাজননীর অবদান।' [১৬১(ঝ)] উল্লেখ্য সংগ্রামময় জীবনে সুভাষচন্দ্রের সুখী গৃহকোণ বা সুখী আহার-এর পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। চা-মুড়ি খেয়ে কাগজের অফিসের বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন। [১৬১(ঞ)] উত্তর কলকাতার সত্যনারায়ণ সাউ এর চপের দোকান তাঁদের পুরোনো স্মৃতি স্মরণে ২৩ জানুয়ারি প্রতিবছর সবাইকে বিনামূল্যে চপ খাওয়ান।

যাইহোক সেদিনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই যখন জানা গেল সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ। জানা যায় প্রভাবতী দেবী জল গ্রহণ ত্যাগ করেছিলেন এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রীতিমতো জেরা করে চলেছিলেন যে তাঁর সুভাষকে এঁরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন। মাজননী প্রভাবতী দেবীর শারীরিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না এই সময়। সুভাষচন্দ্রও তাঁর মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বিশেষ করে তাঁর বাবা জানকীনাথের হৃৎযন্ত্র বিকল হয়ে প্রয়াণের কারণে। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালে বাংলার হোম মিনিস্টার-এর কাছে অনুমতির আবেদন করেছেন তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাঁর মা তখন হৃদযন্ত্রের দুর্বলতার কারণে রীতিমতো অসুস্থ। তাঁকে ব্রিটিশ এলগিন রোডের বাড়িতে দেখা করতে দিতে চাইছে না। এই কারণে যে তিনি সেই সুযোগে বাড়ির পুরুষ আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন। সেই আকাঙ্ক্ষায় সুভাষকে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিতে তাঁরা নারাজ।[১৬২]

সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি জেলের কারাকক্ষ থেকে গৃহমন্ত্রীকে লিখেছিলেন কয়েকটি কারণ। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে কয়েকবছর আগে যখন তিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশের নজরবন্দীতে ছিলেন তখন তাঁকে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে মাকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ১৯৩৩ সালে তাঁর বাবা অসুস্থ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ইউরোপে নির্বাসিত থাকার কারণে আর বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পাননি। হৃদরোগে তাঁর পিতা প্রয়াত হন। ব্রিটিশের দ্বিচারিতা নিয়ে তিনি বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন। তাঁকে অযথা বন্দী করে রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।[১৬৩]

সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ যাত্রা জাতীয় মুক্ত সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন এক উজ্জ্বল বৈপ্লবিক অধ্যায় তেমনি সুভাষজননীর জীবনে ছিল বেদনাময় বিচ্ছেদ হাহাকারের নিঃশব্দ জীবনযাপন। সবচেয়ে ভালোবাসতেন, ভরসা করতেন 'সুবি'কে। গীতিকার, সুরকার, অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে সে সময় বহু কীর্তন ও ভক্তিগীতিতে মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত মান্না দে তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের জলসা ঘরে'তে উল্লেখ করেছেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সাক্ষাতের কথা।[১৬৪] এখনকার শেক্সপিয়র সরণি, সেদিনের থিয়েটার রোডের এক জাহাজবাড়ির গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে কাকার হাত ধরে

গিয়েছিলেন মান্না দে (প্রবোধচন্দ্র দে)। দেখেছিলেন তাঁর স্বপ্নের 'দিব্যকান্তি ব্যক্তিত্বশালী উজ্জ্বল পুরুষ নেতাজিকে'।[১৬৫] সালটা ছিল ১৯৩৭-৩৮।[১৬৬] দশবছর আগে দেবকী বসুর পরিচালিত 'চন্ডীদাস' ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অভিনয় ও তাঁরই কণ্ঠের 'ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে' দর্শক ও শ্রোতাদের মনে ঝড় তুলেছিল।[১৬৭] পরবর্তীকালে তাঁর দরদি কণ্ঠের সেই গান 'নবদ্বীপের শোভনচন্দ্র' সুভাষজননীর শুধু কর্ণে নয়, নিশ্চয়ই মর্মে প্রবেশ করেছিল—

'...পাতায় পাতায় বিরহব্যাথায় অধীর শিশির ঝরে....
গেছে চলে প্রাণ খালি করে প্রাণের নিমাই সন্ন্যাসী চলে—
....কাঁদে শচী মা জননী হারায় নয়ণমণি
কেঁদে বলে নিমাই-নিমাই কেহ তো কহেনা কথা
ব্যথা ভরা ব্যাকুলতা দশদিশি কাঁদে নাই নাই
বলে আঁখিধরে মা জননী বলে
নিমাই আমার নিমাইরে ও তুই কেন
গৃহ ছেড়ে গেলি—ভাসায় আমার সবারে
বিরহের পারাবারে—কেন গৃহ ছেড়ে গেলি নিমাইরে—'

সুভাষজননীর নয়নের মণি ছিলেন সুভাষ তা নানাভাবেই লক্ষ্য করা গেছে এ নিয়ে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণও হয়েছে কিন্তু সুভাষ কি তাঁর মাতাঠাকুরানীকে সমস্ত সত্য পরিকল্পনা বলতে পেয়েছিলেন? বোধহয় না, সুভাষচন্দ্রের এজন্য মর্মবেদনাও কম ছিল না অনুমান করা যায়। কারণ তিনি জানতেন তাঁর মায়ের হৃদয় বড় স্পর্শকাতর। অন্তর্ধান পরিকল্পনা হয়তো তিনি শারীরিকভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গে বিজয়রত্ন মজুমদার তাঁর 'আজাদ হিন্দের অঙ্কুর' বইতে ১৯৪১ সালের পরের একটি ঘটনা লিখেছেন :

কলকাতার কোনো একটি সিনেমা হলে চৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন করে ছবি দেখানো হচ্ছিল। যেখানে নিমাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন এবং পরদিন শচীমাতা নিমাইয়ের শোকে আকুল, তখন স্বাভাবিকই যে অনেক মায়ের চোখ শুকনো ছিল না। সেই প্রেক্ষাগৃহে সুভাষজননীও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। ছবির ওই জায়গায় এসে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে তিনি মূর্ছিত হয়ে যান। সুভাষের সঙ্গে তাঁর মুখের সাদৃশ্য দেখে পাশের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝেছিলেন তারপর সুভাষের জয়ধ্বনিতে সমস্ত এলাকা মুখর—ভিড়ে ভিড়ে চতুর্দিক লোকারণ্য।

কিন্তু উপায় কী! জীবনের বোধহয় এই-ই নিয়ম যে, যার জীবন সকলের জন্য তাকে কোনো দিনই ছোট একটি পারিবারিক গন্ডির মধ্যে ধরে রাখা যাবে না।[১৬৮]

এ প্রসঙ্গে জানা যায় ভবানীপুর হাজরার বসুশ্রী সিনেমা হলে প্রভাবতী দেবী কোনো এক আত্মীয়ার সঙ্গে নিমাই সন্ন্যাস সিনেমা দেখার পর বাড়ি ফেরার সময় সন্ধ্যায় ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখন প্রভাবতী দেবী বলে উঠেছিলেন শচীমাতা তো জানতে পেরেছিলেন তাঁর নিমাই কোথায় যাচ্ছে কিন্তু আমি তো জানতে পারলাম না আমার সুভাষ কোথায়'। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিদ্যালয় জীবনের শিক্ষাগুরু[১৬৯] বেণীমাধব দাসের কন্যা, বিপ্লবী বীণা দাস এক স্মৃতি চারণে লিখেছেন—'... এর পর সুভাষচন্দ্রের মহিমোজ্জ্বল জীবনে যখন এক প্রগাঢ় রহস্যের যবনিকা নেমে এলো বিভ্রান্ত আমরা বাবার স্নেহের অন্তর্দৃষ্টির কাছে উত্তর খুঁজেছি, বারে বারে বলেছি, 'তোমার কী মনে হয় বাবা?' সুস্পষ্ট উত্তর তিনিও দিতে পারেন নি, খালি বলেছেন, 'আমি যদি শুনি সুভাষ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে আমি অন্তত অবাক হব না। রাজনীতির আগে ও সন্ন্যাসের ডাক শুনতে পেয়েছিল। ওর জীবনের বড়ো সম্পদ 'আধ্যাত্মিকতা'।[১৭০]

উল্লেখ্য, সুভাষসুহৃদ চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৃদ্ধ বেণীমাধব দাস সুভাষচন্দ্রের ডাকে অন্তর্ধানের সাতদিন আগে এলগিন রোডের বাসভবনে দেখা করেন—'তারপর বৃদ্ধদ্বয় ফিরে এলেন—নীরব নিস্পন্দ। কোনো কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো না। তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ... অনুমান হয়, সুভাষচন্দ্র দেশ হতে শেষ বিদায় নেবার পূর্বে দুই গুরুর চরণের পুণ্যধুলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।'[১৭১]

সুভাষজননী সেদিন তাঁর সুভাষের শিক্ষাগুরুর আগমনকে নিয়ে অন্য কিছু কী আদৌ ভেবেছিলেন? প্রাপ্ত ইতিহাস এক্ষেত্রেও নিরুত্তর। তবে নেতাজিকে নিয়ে তাঁর বৃদ্ধা মা ও পরিবারের স্বজন সুহৃদদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে সুভাষচন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর ঝরিয়ার কাছে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং এ গুজবের অপমৃত্যু ঘটেছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। আবারো সেই একই পথে হেঁটে ১৯৪২ এর ২৫ মার্চ ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (বি.বিসি) রটনা করে যে পূর্ব এশিয়াতে বিমান ভেঙে পড়ে সুভাষচন্দ্র প্রাণ হারিয়েছেন।[১৭২] ফ্রান্সের ভিসি বেতারকেন্দ্র থেকেও অনুরূপ সংবাদ প্রচার করা হয়।

ব্রিটিশ মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসাবে সুভাষচন্দ্রের 'মৃত্যু'কে হাতিয়ার করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে নয়, ইউরোপের জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র এই সময় অত্যন্ত ব্যাস্ত ইন্ডিয়ান লিঁজিয়ান থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বিপ্লব সংগঠনের নানা কাজে। তাঁর পরিবার, বিশেষ করে মায়ের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রের ওপরও চাপ দেবার কৌশল নেয় তারা। গান্ধীজি সুভাষজননীর কাছে শোকবার্তাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়গুলিতেও এলগিন রোডের বাড়িতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা নজর অব্যাহত ছিল। সুভাষজননীর একটাই জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর 'সুভাষ বেঁচে আছে তো'? অবশ্য কিছুকাল পরে বার্লিন থেকে 'আমি সুভাষ বলছি' কণ্ঠস্বর তাঁকে স্বস্তি দিয়েছিল। পূর্ব এশিয়াতে বিমান ভেঙে মৃত্যুসংবাদ-এর বিরোধিতা করে জার্মান সংবাদ সংস্থা (ডি.এ.বি.) ও জাপানি সংবাদ মাধ্যম। স্বস্তি পান সুভাষজননী ও পরিজন।[১৭৩] তবু সুভাষজননী যে ক্রমশঃ মনের দিক দিয়ে একলা হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৩ সাল এলগিন রোডের বাড়িতে একের পর এক মৃত্যু শোকের বছর করে তুলেছিল। নেতাজির বড়দা সতীশচন্দ্র বসুর বড় ছেলে গণেশ মস্তিষ্কের অসুখে মারা যান। তাঁর ছোটো ভাই দ্বিজেন কারারুদ্ধ কিন্তু শেষকৃত্য করার জন্য জরুরি সরকারী অনুমতি দিতে নারাজ। অবশেষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায়—'...সারাদিন টানাপোড়েনের পরে বিকেলে পুলিশ পাহারায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে দ্বিজেন বড় ভাইয়ের শেষ কাজ করে আবার জেলে ফিরে গেল।'[১৭৪]

ওই বছরের মাঝামাঝি সুরেশচন্দ্র বসুর কন্যা ইলা সন্তান প্রসবের পরেই মারা যান। পুত্রসন্তানটি অসুস্থ থাকায় বেশিদিন পৃথিবীতে থাকতে পারেনি।[১৭৫]

এ দুটি বড় শোক মাজননীকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর হৃদয় নিতে পারে নি একের পর এক এমন আঘাত। উনি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। গৃহত্যাগের সকল বার্তা শান্তিনিকেতনে পৌঁছাবার পর ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহের 'নিরুদ্দেশের পথিক' ও 'দেশনায়ক' সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতী দেবীকে তাঁর বার্তা পাঠিয়ে সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানিয়েছিলেন। তিনিও ছয় মাসের শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কলকাতার স্বগৃহে কিছু স্বনামধন্য চিকিৎসকের শল্যচিকিৎসার ব্যর্থতার কারণে প্রয়াত হন।

শরৎ বসু কারাগারে, স্নেহের সুভাষ নিরুদ্দেশের পথিক। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পুত্র ডা. সুশীলচন্দ্র বসু মাজননীর চিকিৎসার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেন। কুন্নুর জেলে বন্দি শরৎ বসুকে আসার অনুমতি সেদিন ব্রিটিশ দেয়নি। ডিসেম্বরের শীতে প্রভাবতী দেবীর জীবনপ্রদীপের তেল শেষ হয়ে এল। গুরুগত প্রাণ সুভাষজননী অন্তিমপর্বেও সুভাষের সঙ্গে বিচ্ছেদ বেদনা বিস্মৃত হতে পারেন নি। প্রায় দুই দশক পরে এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে নেতাজির বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের বিপ্লবী মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত যিনি একদা জেলের মধ্যে

সুভাষচন্দ্রের প্রাণনাশের চেষ্টাকে রুখে দিয়েছিলেন, তিনি উত্তরবঙ্গের রহস্যকুঞ্জ শৌলমারী আশ্রমের রহস্যময় সন্ন্যাসী শ্রীমদ সারদানন্দজীর সামনে ব্যক্ত করেছিলেন সুভাষজননীর সেদিনের মৃত্যুশয্যায় বেদনাতুর উক্তি যা সেই সাধু সারদানন্দজীর চোখে জলের ধারা এনে দিয়েছিল।[১৭৬]

'...আমি মনে করি মাতা প্রভাবতীর মুখ দিয়ে সেদিন ভারতমাতা কথা বলেছিলেন। মা অসুস্থ হয়েছেন, শীতের রাত্রি, সবাই দরজা বন্ধ করে দিতে গেলেন। সবাইকে বাধা দিয়ে মা বললেন, ওরে দরজাটা বন্ধ করিস নি। ছেলেটা চলে গেছে, যদি ও ফিরে আসে, দরজা বন্ধ দেখলে হয়তো চলে যাবে, দরজাটা খুলে রাখ। সেই দরজা আজও খোলা আছে। মাতা প্রভাবতী মারা গেলেন। সেই দরজা এখনও খোলা আছে। ভারতের দুয়ার আজও খোলা আছে এবং ছেলে এসে গেছে।'

১৯৪৩ এর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। লিপিবদ্ধ করে যাননি সেই সময় কেউ। ভাষান্তরে বলা যায় সুভাষজননীর শেষ জীবনটি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য কেউই উদ্যোগ নিতে পারেন নি। যতদূর জানা যায়, ২৯ ডিসেম্বর[১৭৭] বুধবার রাতেই না ফেরার দেশে চলে যান সুভাষচন্দ্রের পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরানি প্রভাবতী দেবী তাঁর স্বামীর নির্মিত এলগিন রোডের বাড়িতেই যে বাড়িতে জানকীনাথ বসুও প্রয়াত হয়েছিলেন।[১৭৮] দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী সুভাষের মা (১৮৬৯-১৯৪৩) ইতিহাস হয়ে গেলেন, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষার কথা লিখে রাখার কেউ রইল না। সুভাষচন্দ্রের পিতৃ বিয়োগের পর জানকীনাথ বসুকে শেষ দেখা দেখতে পাননি। সেই শোক তিনি সংক্ষেপে 'জানকীনাথ বসু' শীর্ষক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে সামান্য হলেও অনুমান করা যায় একটু হালকা হয়েছিলেন। কিন্তু প্রভাবতী দেবীকে শেষ দেখা ও শেষ কাছে দুই পুত্র শরৎ ও সুভাষ কেউই থাকতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্র ঠিক কোন সময়ে খবর পেয়েছিলেন তা নিয়ে প্রামাণ্য সূত্র না থাকায় কিছুটা অনুমানের আশ্রয় নিতেই হবে। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় এলগিন রোডের বাড়ীতে অনেকে উপস্থিত ছিলেন সে অনুষ্ঠানের ছবিগুলি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাতৃবিয়োগে পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়াতে অনেক কিছুই সেদিনের অজানা রয়ে গেছে।

ভারতে আজাদ হিন্দের সিক্রেট সার্ভিসের গোয়েন্দা মারফত কিংবা ব্রিটিশ নেতাদের সূত্রে সম্ভবত ২৯ তারিখ রাতেই কিংবা ৩০ ডিসেম্বর খবরটি পেয়ে থাকতে পারেন। কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সর্বাধিনায়ক নেতাজির মনে? সে প্রসঙ্গে যাবার আগে মাজননীর আরও এক মর্মস্পর্শী চিঠি যা অনেককাল আগে মান্দালয়ে বন্দি সুভাষকে লেখা হয়েছিল। বহুকাল পরে সেই চিঠি আশির দশকের গোড়াতে প্রদর্শিত হয়েছিল বিপ্লবী ও লেখক কালীচরণ ঘোষের ৬ নং রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়ি প্রাঙ্গনে শরৎ বসু আকাডেমির উদ্যোগে। প্রদর্শিত সেই চিঠি ও অন্যান্য প্রদর্শিত বস্তু নিয়ে একদা নেতাজি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের পুত্রসম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবিজয় নাগ চিঠি লিখেছিলেন অনামী অজ্ঞাত সন্ন্যাসী ভগবানজির কাছে। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনে সেই চিঠি উদ্ধার করে কলকাতার অফিসে নিয়ে এসেছিলেন। ওই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি ছিল এরকম—[১৭৯]

'পুজোয় বসলেই মনে হয় তুমি দরজায় কড়া নাড়ছ, রাতে শুলে মনে হয় তুমি এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ আর মা বলছ, মা আমি এসেছি, কিন্তু কোনোটাই ঘটছে না সবই মনের ভুল।' ...মাজননীর লেখা এই পত্রটি শরৎ বসুর বর্তমান পুত্রকন্যারা যাঁদের হাতে চিঠি থাকার কথা কেন তাঁদের প্রকাশনায় আজও স্থান দেননি তা রহস্যময়। তবে ওই পত্রের উল্লেখিত অংশ পড়ে অনুমান করা যায় নিভৃতচারী সন্ন্যাসী দেশনায়ক ভগবানজির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জানা যায় সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব জানকীনাথ বসু ও মাতাঠাকুরানি প্রভাবতী দেবীর একসঙ্গে বসে থাকা ছবি বেশ শক্তপোক্ত করে বাঁধিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন চারণিকদের অর্থাৎ

তাঁর বাংলা ও কলকাতাস্থ ভক্তদের। বহুবছর পর নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনে ফৈজাবাদের রামভবনের আউট হাউসে ভগবানজির কক্ষ পরিদর্শন করেন এবং ট্রেজারিতে খুঁজে পাওয়া যায় সুভাষের পিতৃদেব ও সুভাষজননীর ছবি আরও পারিবারিক কিছু ছবি সঙ্গে। পূর্ব জীবনের স্মৃতি সন্ধানী হয়েছিলেন সন্ন্যাসী দেশনায়ক। সে এক অন্য অধ্যায়।[১৮০]

মাজননীর প্রয়াণ সংবাদ সুভাষচন্দ্রকে কতটা আকূল করেছিল তার একাধিক রকমের ভাষ্য পাওয়া গেছে। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন সময়টা ঘোর মহাযুদ্ধের। শত্রুপক্ষ সর্বাধিনায়কের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য সদাই তৎপর। মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি যুদ্ধের অন্যতম কৌশলও বটে। ১৯৪১ এর ৭ আগস্ট সুভাষচন্দ্রের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হন। রবি ঠাকুরের সুভাষ তখন কাবুল এর পথে নিরুদ্দেশের পথিক। ব্রিটিশ তাঁর সঠিক অবস্থান খুঁজে পেতে মরিয়া। বার্লিন রেডিও থেকে যখন আমি সুভাষচন্দ্র বসু বলছি বক্তৃতা ভেসে আসে তখন তিনি সদ্য প্রয়াত বিশ্বকবির নাম নেননি। কারণ তিনি জানতেন আবেগে যদি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কোনো কথা বলেন তা হলে রবি ঠাকুরের হাতে গড়া স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে অশান্তির ঝড় বইবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বদান্যতায়। তিনি আজাদ হিন্দের জাতীয় সংগীত রবিঠাকুরের গানকেই প্রাধান্য দিলেন। এমনকী পূর্ব এশিয়াতে আজাদ হিন্দ-এর সরকারি প্রকাশনাতে রবি ঠাকুরের প্রচ্ছদ চিত্রসহ বিশেষ সংখ্যা যা চীনা ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল এমনটা জানা যায়।[১৮১]

আজাদহিন্দ-এর যুদ্ধকালীন সময়ে কোনো এক পরিস্থিতিতে তিনি রবিঠাকুরের গান উদাত্ত কণ্ঠে আপন মনে গেয়ে উঠেছিলেন।[১৮২]

১৯৪৩ এ ভাইপো গণেশ, ভাইঝি ইলার অকালে প্রয়াণ সংবাদ তিনি যথাসময়ে পেয়েছিলেন কিনা জানা না গেলেও মাতৃদেবী বিয়োগের বার্তা পৌঁছনোর কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করছি—

'... মা জননীর মৃত্যুর খবর তাঁর কাছে পৌঁছেছিল জানি, কলকাতা থেকেই এক গোপন বার্তার মাধ্যমে। দেশে ফেরার পরে দেবনাথ দাস বলেছিলেন। একদিন যথারীতি কাজকর্মের পরে অনেক রাত পর্যন্ত রাঙা কাকাবাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসেছিলেন। হয়তো এমনিতে কারুকে কিছু বলতেন না। দেবনাথবাবু বলে ফেলেন 'আজ আপনাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শুয়ে পড়ুন।' উত্তরে রাঙাকাকাবাবু বলেন, 'না, আমি ক্লান্ত নই, আজ খবর পেয়েছি আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।'[১৮৩] আজাদ হিন্দ-এর সদস্য দেবনাথ দাস কলকাতায় নেতাজিভবনে গড়ে ওঠা নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে যুক্ত ছিলেন সেখানেই নেতাজির ভাইপো শিশিরকুমার বসুকে একথা জানিয়েছিলেন। যদিও কবে কোথায় কখন এমন আলোচনা হয়েছিল তা বিস্তারিত বলা নেই।[১৮৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি গোয়েন্দা সংস্থা হিকারী কিকান-এর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইসোদা জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের মাতৃদেবী বিয়োগ সম্পর্কে—'আমি মিঃ বোসকে শোকজ্ঞাপন করতে গিয়েছিলাম। বোস জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর মায়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। চোখে তাঁর অশ্রু। নারীসুলভ এমন কমলতা বসুর মধ্যে সেই প্রথম ও শেষবার দেখেছিলাম।'[১৮৫]

বাংলার ঢাকা জেলের গোলমালের খবর ১২ ঘণ্টা পরেই বেতার বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন।[১৮৬] এর থেকে অনুমান করা যায় বাংলা ও ভারতের অভ্যন্তরের সব খবরই তাঁর কাছে যেত। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ প্রকাশ্যে বড় করে তুলে ধরতেন না তিনি—'এইখানেই সুভাষ চরিত্রের বৈশিষ্ট।[১৮৭]

'সুভাষচন্দ্রের মাতৃ বিয়োগের পর আমরা একাধিক দিন আজাদ হিন্দ স্টেশন থেকে বেতার যোগে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু কোনোদিন এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ করতে শুনিনি। শুধু স্নেহময়ী মাতৃদেবীর কথাই

নয়, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনো ঘটনার উল্লেখমাত্রও তিনি কোনোদিন করেননি। নেতাজির মাতৃভক্তি প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দের ডেপুটি কোয়ার্টার মাস্টার[১৮৮] জেনারেল লে.ক. প্রিয়নাথ দত্ত ২২ এপ্রিল ১৯৪৬এ সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজির মাতৃভক্তি প্রসঙ্গে বলেন—'...নেতাজিকে অত্যন্ত গোপনে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি সেই কারণে তাঁর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসতে পারেন নি। জননীর পায়ের ধূলা গ্রহণ করতে তিনি সেই গভীর রাত্রে তিন তিনবার তাঁর ঘরে যান, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে প্রত্যেকবারই আত্মসংবরণ করে ফিরে আসেন। নেতাজি যখনই একথা বলতেন, তখনই তাঁর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত।'[১৮৯] কবে কোথায় কখন কী প্রসঙ্গে নেতাজি কথাগুলি বলেছিলেন তা লে.ক. দত্ত জানাননি। কত তারিখে, রাত কটার সময় সুভাষচন্দ্র তাঁর মা'কে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন এ সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি। নেতাজির গৃহত্যাগ সম্পর্কে নানা তথ্য উঠে আসছে। সম্ভবত ভোররাতে সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ করেছিলেন।[১৯০] সেক্ষেত্রে তিনবার তাঁর জননীর ঘরে প্রবেশের চেষ্টা বাস্তবসম্মত এবং এই বক্তব্যে নিশ্চিত যে তাঁর মায়ের ঘরে প্রবেশের জন্য খিল দেওয়া দরজা ছিল না। যদিও সেদিন খিল দেওয়ার গল্প শিশির বসু তাঁর বই 'বসু বাড়ি'তে উল্লেখ করেছিলেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান সুভাষচন্দ্র বসু তিনদিনের জরুরি সফরে পৌঁছান আন্দামানের লাম্বার লাইন বিমান বন্দরে ২৯ ডিসেম্বর। এরপর আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেল পরিদর্শন। আন্দামানের নামকরণ শহীদ দ্বীপ ও নিকোবরের নামকরণ স্বরাজদ্বীপ ঘোষণা। আন্দামান ক্লাবের সামনের জিমখানা ময়দানে অখণ্ড ভারতের চরকা শোভিত আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলন। দীর্ঘ প্রাণবন্ত ভাষণ প্রদান বিশাল জনসভায়। আগের দিন বাজারের কাছে ব্রাউনিং ক্লাব প্রাঙ্গণ যেটিতে আন্দামানের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সদর কার্যালয় ছিল। বর্তমানে নেতাজি ক্লাব। লেখক সাম্প্রতিককালে গিয়ে দেখেছেন যে ওই ক্লাব আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলেও যে সুন্দর ছাতার মত জায়গায় তিনি বসেছিলেন সেটি আছে। বিশাল লৌহের পতাকা দন্ডটি আজও ব্যবহৃত হয়। সামনেই রয়েছে নেতাজি হল ও আজাদ হিন্দের প্রধান সেনা জনলোকের বাসগৃহ। ইতিহাস যেখানে কথা বলে আজও, তবে রসআইল্যান্ড (বর্তমানে নেতাজি দ্বীপ)টিতে যে কমিশনার হাউসে তিনি রাত্রিবাস করেছিলেন। উড়েছিল আজাদি পতাকা। আজ নিদারুণ উপেক্ষায় হারিয়ে গেছে সেই গৃহ। নানা সামগ্রী চুরি হওয়ার শেষে এক ধ্বংসস্তূপ যেখানে বিশাল বিশাল গাছ, শ্যাওলা আর সাপখোপের আস্তানা হয়ে আত্মবিস্মৃত জাতির এতে যেন বিদ্রুপ ঘোষণা করবে। নেতাজির চোখে কালো চশমা বিশেষ দেখা যায় না। মিশরের পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে তোলাহরিতে ও সমুদ্রবক্ষে ইউরোপ থেকে এশিয়া আসার পথে আবিদ হাসানের সঙ্গে ছবিতে দেখা যায় চোখে তাঁর কালো চশমা হয়তো রৌদ্রের উত্তাপ ও ঝলকানি থেকে কিছুটা আড়াল করতে অমন রোদচশমা পড়েছিলেন। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বর সেলুলার জেল পরিদর্শনকালে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নেতাজির চোখে কালো চশমা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রণাকে কি সুভাষচন্দ্র আড়াল করেছিলেন সেদিন? সরকারি নথিপত্রে এখনো এমন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। নেতাজির অগোচরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ-এর কিছু সদস্যদের ওপর জাপানি সৈনিকেরা ব্রিটিশ গোয়েন্দা সন্দেহে অত্যাচার চালায়, প্রাণহানিও ঘটে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সে এক অন্য অধ্যায় যেখানে ১৯৪৪ এর ৩০ জানুয়ারি পোর্ট ব্লেয়ারের অদূরে হামফ্রেগঞ্জ চোখ বেঁধে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের ৪৪জনকে গুলি করে হত্যা করেছিল জাপানি সেনারা স্রেফ ব্রিটিশ স্পাই সন্দেহে।[১৯১] নেতাজি দ্রুত তোজোকে জানান, তিন বিচারক পরিদর্শন করে, ৬০০ মানুষ মুক্ত হন সেলুলার জেল থেকে।[১৯২]

সুভাষজননীর শ্রাদ্ধপর্ব সম্পর্কেও খুব বেশি তথ্য উঠে আসেনি যেমনটা জানকীনাথ বসুর প্রয়াণের পর হয়েছিল। নেতাজি সিঙ্গাপুর ফিরে গিয়েছিলেন? সেখানে কী ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রাদ্ধশান্তি, পূজাপাঠ কিছু করেছিলেন। এ সম্পর্কে অনুমান নির্ভর হতেই হবে কারণ প্রকাশ্যে তেমন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। হিসাবমত ৯ অথবা ১০ জানুয়ারি কোনো ধর্মীয় নীতি তিনি পালন করেছেন কিনা জানা না গেলেও ৬ জানুয়ারি আন্দামানে চিফ কমিশনার পদে নিয়োগ ও আন্দামান সফরের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছেন বার্মা থেকে। ৮ জানুয়ারি অর্থাৎ দু'দিন পর নেতার বক্তব্যটি 'গ্রেটার এশিয়া' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। আন্দামানের 'কালাপানি' সংগ্রহশালা ও হামফ্রেগঞ্জের সংগ্রহশালাতে রক্ষিত নথিতে নেতাজির মাতৃদেবী সম্পর্কিত কোনো খবর দেখা যায়নি। সিঙ্গাপুর মহাফেজখানার কিছু পত্রপত্রিকা ও অন্য নথি যেগুলি আজাদ হিন্দের নব্বই ঊর্ধ্ব সদস্য জন লোবোর কাছে সংরক্ষিত। লেখককে ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছিলেন তাতেও প্রভাবতী দেবীর প্রয়াণে নেতাজি কোনো ধর্মীয় রীতি পালন করেছেন বলে খবর দেখতে পাইনি। অনুমান করা যায় এটি ব্যক্তিগত স্তরেই তিনি পালন করে থাকবেন। গোয়েন্দা শত্রুপক্ষ অত্যন্ত সজাগ ছিল, এলগিন রোডের বাড়ির কার্যকলাপ নিয়ে দীর্ঘদিন নজরদারির খবর জানা যায়।[১৯৩] নেতাজির পক্ষে মাতৃদেবীর প্রয়াণ খবর ব্রিটিশকে বুঝতে দিলে কিংবা তিনি কোনো সূত্রে বার্তা প্রেরণ করলে ব্রিটিশ গুপ্তচরদের সুযোগ এসে যেতে পারত, নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হত আই এন এ সিক্রেট সার্ভিসে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, লালকেল্লার বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হবার কিছুদিনের মধ্যেই আজাদ হিন্দের মিঃ কৃষ্ণাণ রাজ পালটা লাহোর থেকে ১৯৪৬ সালে 'মাই অ্যাডভেঞ্চার উইথ দ্যা আই.এন.এ' বইটি প্রকাশ করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করছি—'তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন ভারত থেকে বার্মার যাত্রাপথে কোনো সংঘাত প্রতিরোধ কিংবা সমস্যা হয়েছিল কিনা? আমরা আমাদের যাত্রাপথের পুরো ঘটনা জানালাম এবং তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম কলকাতার বন্দিদশা থেকে কীভাবে অন্তর্ধান করলেন। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ভারতের মানুষজন আমার এই অন্তর্ধান নিয়ে কী বলছে? আমি জানালাম এ ব্যাপারে ভারতে বইতে থাকা নানা গুজব ও রটনার কথা। তারপর নেতাজি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পরিবারের কথা। আমরা বললাম মিঃ শরৎ বোস অসুস্থ ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের কারাগারে রয়েছেন। আমরা এও বললাম তাঁর মায়ের দুর্বল শরীর এবং তিনি কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর জন্য। যখন আমি তাঁর জন্য মায়ের দুশ্চিন্তার কথা জানালাম, তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে তীব্র দুঃখের ছায়া। কলকাতা পুলিশের কাজকর্মের ব্যাপারে জানালাম তাদের কাজকর্ম, তারা যতক্ষণ না জানতে পেরেছে আপনি নিশ্চিতভাবে দেশের বাইরে, ততদিন যতদূর পেরেছে তল্লাসি অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে।[১৯৪]

ভারত থেকে মুষ্টিমেয় যে কয়জন চূড়ান্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বার্মায় ১৯৪২ এ আই.এন.এ.-তে যুক্ত হতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিঃ পালটা অন্যতম ছিলেন বলে জানিয়েছেন গ্রন্থটির মুখবন্ধে প্রথম আই.এন.এর প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন মোহন সিং। নেতাজির সঙ্গে কত তারিখে সাক্ষাৎ হয়েছিল বইটিতে উল্লেখ করা হয়নি। হাতে গোনা কয়েক জনের বিশ্বাসঘাতকতা নেতাজির যুদ্ধ জয়ের পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ রূপে সার্থকতা এনে দিতে পারেনি। অখণ্ড ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার ধুলো মেখে তাঁর মায়ের পায়ে প্রণাম করার স্বাভাবিক বাসনা পূরণ হল না চির আশাবাদী সংগ্রামী ত্যাগী দেশনায়কের।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান, মা জননীর প্রয়াণ বসু বাড়ির সাজানো সংসারের ওপর দিয়ে পরবর্তীকালে অন্তঃকলহের ঝড় বয়ে যায়। সম্পত্তিগত শরীকি বিবাদ, ব্রিটিশ চক্রান্ত, রাজনীতির লড়াইতে এলগিন রোডের গৌরবময় ভূমিকাকে কিছুটা হলেও কালিমালিপ্ত করে। এমনকী পরবর্তী প্রজন্মের ভিতর ও তাঁদের কারুর কারুর বিবাহের পর বসু বাড়ির ঐতিহ্য 'গ্রহণ' শুরু হয়। আলোচনার অনেক কেন্দ্রতে মাজননী প্রভাবতী

দেবীকেও টেনে আনা হয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে নানা আরোপ তাঁর ওপর হয় যার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর আপ্তসহায়ক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভাইঝি ও শরৎ বসুর পুত্রবধূ, শিশির বসুর স্ত্রী কৃষ্ণা বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'আমি যখন বধূ বেশে এক নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে সূর্য অস্ত গিয়েছে... বসু বাড়িতে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে শুনে আমার এক পরমাত্মীয়া বলেছিলেন, জানোতো প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।... এ বাড়িতে এসে থেকে বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা শুনতাম—'কেন' জিজ্ঞাসা করলে জবাব পেতাম, 'মাজননীর বারণ'। যেমন এক পরিবারে আমার ননদের বিয়ের কথা হওয়াতে শুনলাম 'দত্ত' হলে চলবে না, দত্তদের সঙ্গে বৈবাহিক কাজ 'মাজননীর বারণ'। শুনে বেজায় অবাক হয়েছিলাম, মাজননী প্রভাবতী নিজে হাটখোলার দত্ত পরিবারের মেয়ে, কেউ বলতে পারবে না তাঁর সুখের সংসার নয়।... আবার এ বাড়িতে ছোটো ছেলেমেয়েদের কোনও ধুমধাম করে জন্মদিন পালন করা নিষেধ। সেও 'মা-জননীর বারণ'। আমাদের বাড়িতে আবার বেশ ঘটা করে জন্মদিন হত।... মা জননীর নিষেধ মেনে আমার শিশুপুত্রের প্রথম জন্মদিন নীরবে কেটে গেল। কিন্তু তার দ্বিতীয় জন্মদিন লন্ডনে আর তৃতীয় জন্মদিন যখন বস্টন শহরে হল, তখন আর নিষেধাজ্ঞা মানা গেল না।...'[১৯৫]

উক্ত স্মৃতিভাষ্যে 'মা-জননীর' নামে যাই উচ্চারিত হোক। তবে ধুমধাম করে জন্মদিন পালন যদি প্রভাবতী দেবী বারণ করে থাকেন তার নেপথ্যে ছিল তাঁর কঠোর বাস্তববোধ। একান্নবর্তী পরিবারে যেখানে মামা ভাগ্নে ভাই বোনদের বৃহৎ পরিবার সেখানে ঘটা করে জন্মদিন উদযাপন নিশ্চয়ই মনস্তাত্ত্বিকভাবে মঙ্গলজনক হত না।

১৯৮৪ সালের জানুয়ারি ব্রিটেনের গ্রানাডা টেলিভিশন নেতাজির জীবন অবলম্বনে 'দ্যা ওয়ার অবদি স্প্রিংগিং টাইগার' তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। তথ্য বিকৃতির কারণে দেশ জুড়ে ঝড় ওঠে। বৃহত্তর বসু পরিবারেও ওই নিয়ে অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে এসে যায়। জানা যায় অনেক গোপন হিংসা, কুৎসা ও ষড়যন্ত্রের কথা। বিস্তারিত সে প্রসঙ্গে না গিয়ে উল্লেখ করি শরৎ বসুর ছেলেদের মধ্যে এবং নেতাজির অন্যান্য ভাইপো ভাইঝিদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ, দোষারোপের ভিতর বাদ যাননি মাজননী ও এলগিন রোডের ওই বাড়িটির প্রসঙ্গও। ব্রিটিশ কৌশলে এলগিন রোডের বাড়িটির কিছু অংশ যেটি সুভাষচন্দ্রের ভাগে ছিল সেটিকে নিলাম ডাকা হয়। জানকীনাথ বসুর তৈরি ওই বাড়ি আনন্দবাজারের সম্পাদক সুরেশ মজুমদার (পরবর্তীকালে অশোক সরকার) দুটি শেয়ার নিজের নামে নেন ও দুটি শেয়ার শরৎ বসুর নামে লিখেছেন। বাড়ি সংলগ্ন জমি শরৎ বসু কিনে নেন। এলগিন রোডের বাড়ি ব্রিটিশের বাজেয়াপ্ত করণের হাত থেকে বাঁচলেও সেখানকার বাসিন্দাদের চলে যেতে বলেন। সুরেশ বসু ও সুনীল বসুর পরিবারকে এলগিন রোডের ওই বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। শরৎ বসু নেতাজি ভবন বানানোর ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন।[১৯৬] উল্লেখ্য এলগিন রোডের বাড়ি জানকীনাথ বসু চার ছেলে সতীশ, সুধীর, সুভাষ ও শৈলেশের নামে করে যান বাকি ছেলেদের কটক, ভুবনেশ্বর, পুরীর বাড়ি ও বাগান বাড়ি ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছিলেন। সেই সময় ভাইদের মধ্যে কোনো সোরগোল হয়নি এলগিন রোডের বাড়ি নিয়ে। 'মাজননী প্রভাবতী দেবীর প্রয়াণের পর এলগিন রোডের বাড়ি বিক্রি রহস্যতে উঠে এসেছে নেতাজির হাতের লেখা নকল করে লেখা চিঠি সুরেশ বসুর এক পুত্র কল্যাণ বসুর নাম।[১৯৭] চিঠির মর্ম ছিল এই, আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমার স্নেহের ভাইঝি ইলার নামে লিখে দিয়ে গেলাম এবং সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আরো কিছু নির্দেশ। ইংরাজিতে লেখা চিঠি পড়ে শরৎ বসু, বড়দা সতীশ বসুর সন্দেহ হয়। 'এত ভুল সুভাষ লিখতে পারে না। ওখানেই সব সম্ভাবনা বাতিল করে দিলেন। সুভাষ বসুর চিঠি বা উইল বলে কল্যাণ যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। কল্যাণ কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়েনি, সে দরবার

করেছিল মহাত্মা গান্ধীর কাছেও। ...সেই জাল উইল নিয়ে এলে দেখা গেল সতীশ যে যে ইংরাজি ভুল দেখে 'সুভাষের চিঠি নয়' বলে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, ঠিক সেই সেই জায়গাতেই গান্ধীজি লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছেন। ...ওখানেই মিটে গেল। 'সুভাষের উইল' নিয়ে সোরগোল। তবে এ ঘটনা বসু পরিবারের লোকেরা আজও সযত্নে চেপে রাখতে চান। জেনেও না জানার ভান করেন।[১৯৮]

এ প্রসঙ্গে ভাইপো অরবিন্দ বসু জানিয়েছেন—'...সুভাষচন্দ্র যখন মহানিষ্ক্রমণের জন্য তৈরি, ঠিক সেই দিনই সকালবেলা ওর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাক্ষী ইলাকে ডেকে বলেন 'ভ্রাতাকে (অরবিন্দ) ডেকে পাঠাও। অরবিন্দ কাছে যেতেই বললেন, 'শিগগিরই যাও নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে ডেকে আন। আমি ইলার নামে আমার সব সম্পত্তি উইল করে যাব'। অরবিন্দ নৃপেন্দ্রবাবুকে ডেকে আনার পর নৃপেন্দ্রবাবু যখন ঘরে বসে প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে কথা বলছেন, তখন রাঙাকাকাবাবু আবার ডেকে পাঠালেন, এবার ফিসফিস করে বললেন, 'নৃপেনবাবুকে কিছু বলেছ না কি?' অরবিন্দর নেগেটিভ উত্তর শুনে উনি স্থির হলেন—ব্যাস, ওকে আমার কাছে ডাকতে হবে না। এমনি চা, জলখাবার খাইয়ে বিদায় দিয়ে দাও। এখন এই মুহূর্তে উইল করতে গেলে অহেতুক সন্দেহ হতে পারে, আমি কোনো ডকুমেন্ট রেখে যেতে চাই না।' এই ঘটনার কোনো সাক্ষী না থাকায় বসু বাড়ির অন্যান্য মহলে আজও স্বীকৃতি পায়নি ইতিহাসের এই টুকরো।[১৯৯]

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা হেমন্ত বসু আততায়ীর হাতে খুন হন। তাঁর মৃতদেহ যখন নেতাজি ভবনে আনা হয় ১৯৭১ সালে তখন প্রথমে মালা দিতে যান অমিয় বসু। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন ভাই শিশিরকুমার। নিজেকে সামলে অমিয়বাবু রুখে দাঁড়ালেন, 'এটা কী হল?' শিশিরবাবু উত্তর দিলেন, আমি নেতাজি ভবনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। কাজেই মালাটা আমারই আগে দেওয়া উচিত'।... নেতাজি ভবনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে গেছেন একে একে শরৎবাবুর সব ছেলেমেয়েরাই।[২০০]

শুধু নেতাজি ভবনে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি নয়, নেতাজির তথাকথিত বিবাহগল্প নিয়েও বিবাদ আছে। মাজননীকে লুকিয়ে সুভাষচন্দ্র গোপনে বিবাহ করেছিলেন এমন গল্প মেনে নিতে চাননি পরিবারের অনেকেই। ভাইপো দ্বিজেন বসু প্রশ্ন তুলেছেন—'এমিলি শেঙ্কেলকে যে রাঙাকাকাবাবু বিয়ে করেছিলেন সেরকম অফিসিয়াল কোনো ডকুমেন্ট শেঙ্কেলের কাছে আছে কি? আর অনিটা যদি ওদেরই মেয়ে হবে তবে অনিটার নাম অনিটা ব্রিজিট লেখা হয় কেন? অনিটা যখন প্রথম ভারতবর্ষে এল তখন ওর পাসপোর্টে অনিটা বসু লেখা হয় নি কেন? কেন লেখা ছিল অনিটা ব্রিজিটি? আসলে ওরা কিন্তু ওঁদের ব্যাপারে যথেষ্ট ফারম রয়ে গেছে, বসু বাড়ির লোকেরাই শুধু এদের নিয়ে হইচই করেন।'[২০১] পারিবারিক অসন্তোষের এই সময় খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন জানকীনাথ বসুর বড়মেয়ে প্রমীলা মিত্রের মেয়ে অরুণা সোম (প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমের মা)। তিনি সেই সময়ের এলগিন রোডের (মামা বাড়িতে থাকতেন) সংসারের সাক্ষী। উনি বলেছেন, 'সে বড় এক দুঃসময় গেছে। দাদাভাই-র মৃত্যুতে গোটা পরিবারটাই যেন পিতৃহারা হল। সেইসময় যখন দায়িত্ব নেওয়ার কেউ নেই, তখন মেজমামাবাবুর ওপরেই দায়িত্ব এসে পড়ল। সংসারে তখন কর্তার অভাব বটে, কিন্তু মানুষের অভাব তো নেই। মেজমামাবাবু তখন নিজেও আলাদা এক সংসারের কর্তা। ফলে তাঁর পক্ষেও ঠিক সমদর্শী হয়ে এত বড় সংসারের দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল না। কেউ কেউ যেন ঠিক খুশি হতে পারছিল না। দৈনন্দিন জীবনে এই রকম ছন্দপতন অবশ্য সব সংসারেই হয়ে থাকে। সেই থেকেই বসু পরিবারের তাল কাটা শুরু হল। গুটিকয়েক ব্যাপারে মাজননী (প্রভাবতী দেবী) নিজেও মেজমামাবাবুর ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। সব খবরই হয়তো রাঙামামাবাবুর (সুভাষচন্দ্র) কানে পৌঁছুত। সেই সময়কার এক চিঠিতে উনি নাকি এলগিন রোডের বাড়ির পরিস্থিতি শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। মার মুখে আমরা এসব কথা জেনেছিলাম, অবশ্য তার জন্য বাহ্যিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের

অবনতি কিছু ঘটেছিল বলা যায় না।[২০২] শরৎ বসুর উডবার্ন পার্ক ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক গৃহ এলগিন রোডে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শরৎ বসুর কন্যা চিত্রা ঘোষ সঞ্চালক লেখককে জানিয়ে ছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের মেজবৌদি বিভাবতী বসুকে সুভাষচন্দ্র নাকি বলেছিলেন— আমাকে তাড়িয়ে দিলেন বৌদি।[২০৩]

নির্বাসন থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯৩৮ এর ২৪ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র যখন আবার কলকাতায় এলেন, তখন কিন্তু তিনি আর মেজদাদার সঙ্গে উডবার্ন পার্কে রইলেন না, পৈতৃক গৃহ এলগিনে এসে উঠলেন। শরৎ বসুর ছেলে ডাঃ শিশির বসু অবশ্য এই মত পরিবর্তনকে বলেন, 'আমাদের মাজননীর ইচ্ছানুসারে তিনি আমাদের সাবেক বাড়ি ৩৮/২ এলগিন রোডে বাস করতে লাগলেন। সুরেশচন্দ্র বসুর ছেলেরা (রণজিৎ বসু, অরবিন্দ বসু প্রমুখ) এই সময় এলগিন রোডেরই বাসিন্দা ছিলেন। ওঁরা বলেন, 'সুভাষচন্দ্র বিশেষ কোন কারণে উডবার্ন পার্ক থেকে ভীষণ মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন, ফলে তিনি এসে এলগিন রোডে দাদাভাই-র ঘরেই নিজের জায়গা করে নিলেন।[২০৪] এই দাদা-ভাইয়ের ঘরেই থাকতেন সুভাষ।

উল্লেখ্য, উডবার্ন পার্ক থেকে লেখা সুভাষকে, মাজননীর কোনো চিঠিরই সম্পূর্ণ প্রকাশ করা কেন হল না তা রহস্যের। আরো রহস্যের শিশির বসুর প্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই এক স্মৃতিকথামূলক বইতে তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা বসু লিখেছেন—'... মা-জননী প্রভাবতী শরৎচন্দ্র বসুকে বলেছিলেন, শিশির যোগভ্রষ্ট ঋষি। ইংরেজের কারাগারে নীরবে অত্যাচার সহ্য করার শক্তি দেখে শরৎচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছিলেন, মাজননী ঠিক কথাই বলেছিলেন।'[২০৫]

কোথায়, কখন, কোন আচরণের প্রেক্ষিতে মাজননী এমন কোনো কথা আদৌ বলেছিলেন কী না তা ভাববার। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে শিশির থাকতেন তাঁর পিতৃগৃহে। মাজননী এ বাড়িতে অল্পদিনই কাটিয়েছেন। বসু পরিবারের বাকি অনেক ভাইপো ভাইঝি ত্যাগ কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে মাজননীর এমন কোনো উক্তির কথা জানা যায় না। তবে শিশির কুমার কেন কোন প্রেরণায় নাস্তিক হয়েছিলেন[২০৬] তার প্রেক্ষিতে এমন উক্তি কিনা তা সম্ভবত আজ আর জানা অসম্ভব। সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ নিয়ে ভাইপোদের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে কৃতিত্ব নেবার প্রতিযোগিতার এক অস্বাস্থ্যকর ভাবনা। নেতাজির কে কত কাছের ছিলেন এমন প্রতিষ্ঠা পাবার লড়াই। তবে অরবিন্দ, দ্বিজেন, শিশির সকলেই নেতাজির স্নেহের ভাইঝি ইলার কথা উল্লেখ করেছেন। এর কারণ নাকি ওঁরা বলেন 'ইলা বেঁচে থাকলে এ জিনিস প্রকাশ পেত না। ভাগ্যিস ও মারা গিয়েছিল তাই।'[২০৭]

'এই নিদারুণ পরিহাস থেকেই বোঝা যায়—বসু বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের পারস্পরিক সম্পর্ক আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে অরুণা সোম বলেন 'দাদাভাই, মাজননী বা তাঁর ছেলেমেয়েরা চলে যাওয়ার পর বসু বাড়ি থেকে যা কিছু ভালো সবই বিদায় নিয়েছে। এখন চলছে অলক্ষ্মীর রাজত্ব। এর ঘাড়ে দোষ চাপান, ওর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটান এই সব কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলায় বসু পরিবার এত বেশি মত্ত যে ইতিহাসের আসল তথ্য আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। বেশিরভাগ বসুদেরই ক্ষোভ যে, দেশের জনগণ যাদের মাধ্যমে নেতাজি বা বসু বাড়ির ইতিহাস জানছে তারা নিজেরাই বসু বাড়িকে সেভাবে জানে না, চেনে না। কোনোদিন জানতেও চায়নি। আজ নেতাজিকে পুঁজি করে ব্যবসায় নেমেছে। এদের সোচ্চার অভিযোগ শিশির বসু ও কৃষ্ণা বসুর বিরুদ্ধে। ওঁরা নাকি তথ্যের বিকৃতি ও মনগড়া গল্প লিখে ইতিহাসকে বিকৃত করছেন। এতদিন ওঁরা সবাই প্রায় চুপচাপ ছিলেন। তবে গ্রানাডা টেলিভিশনের তথ্যচিত্র ওঁদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে খুব শিগগিরই বসু পরিবারের লোকেরা হাতে তুলে নেবেন কলম—যা দিয়ে রচনা হবে নতুন করে বসু বাড়ির ইতিহাস।[২০৮] না, এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেনি বাস্তব ক্ষেত্রে। শরৎ বসুর

পুত্রকন্যা ও তাঁর নাতি নাতনিরাই কেবলমাত্র বই লিখেছেন এবং দেশি-বিদেশি লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন তাঁদের ইতিহাস, শরৎ-সুভাষের অন্তরঙ্গতার ইতিহাস। এমনকী তথাকথিত 'বিবাহ-প্রেমপর্ব-চিতাভস্ম' ইত্যাদি নানা ইতিহাস অসিদ্ধ ব্যাপারে অসঙ্গতিপূর্ণ লেখনী। যেখানে নেতাজির মা ব্রাত্য। পল্লবিত হয়েছে ওইসব বই-এর ওপর ভিত্তি করে নানা তথ্যচিত্র সিনেমা সিরিয়াল। সত্য হারিয়ে গেছে পারিবারিক ঔদাসীন্যতার পাশাপাশি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। নেতাজি জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে নিরোদচন্দ্র চৌধুরী বেফাঁস বলে ফেলেছিলেন নেতাজি রিসার্চব্যুরোরে ভূমিকা নিয়ে। তিনি বলেছিলেন নেতাজি এখন বাঙালি পণ্য হয়ে উঠেছে। নেতাজির বিবাহকাহিনি মিথ্যা, শরৎ বসু ও শিশিরকুমার আদৌ জানতেন না নেতাজির গৃহত্যাগের পরিকল্পনা ইত্যাদি। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ব্রাত্য হন নিরোদচন্দ্র চৌধুরী নেতাজি রিসার্চব্যুরোতে অর্থাৎ এলগিন রোডের নেতাজি ভবনে। তিনি ভাবনাচিন্তার অনেক উপাদান রেখে গেছেন আগামী গবেষণার জন্য।

জানকীনাথ ও প্রভাবতী দেবীর বৃহত্তর সংসারের নানা সদস্য বিভিন্ন সময়ে যে টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা লিখে রেখে গেছেন তা কালের বিচারে মহামূল্যবান, আর সেইসব উপাদান যথাসাধ্য সংগ্রহ করেই গেঁথে তোলা হল আমাদের সকলের প্রিয় নেতাজির সবচেয়ে আপনজন পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরানির জীবনমাল্য।

শেষ করার আগে ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে পুরুলিয়ার ঝালদায় সুভাষচন্দ্রের এক ভাষণ উল্লেখ করছি —"আমার পৌঁছাতে বিলম্ব হল। গতকালও আমি অসুস্থ ছিলাম—আমার মা আমাকে অসুস্থ অবস্থায় পুরুলিয়া আসতে নিষেধ করেছিলেন। আমি না এলে আপনাদের অমর্যাদা হত। তাই আমি মাকে বললাম 'মা আমি কথা দিয়েছি পুরুলিয়া যাব, ওনারা প্রচার করেছেন, জনসভা করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। আমার কথার খেলাপ হলে তোমারও মর্যদা ক্ষুণ্ণ হবে। মানুষ বলবেন কথার মূল্য রাখেন না যিনি তাঁকে কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন?" [২০৮(ক)]।

শেষ করব দেশত্যাগ পরিকল্পনায় মাতা-পুত্রের এক গভীর গোপন বেদনাময় অনিন্দ্যসুন্দর কৌশল কাহিনির উল্লেখ করে। মহানিষ্ক্রমণ সম্পর্কে অরবিন্দ বসুর ভাষ্যে উঠে এসেছে, যা একদা রণজিৎ বসুর মুখেও শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল লেখকের—

'১৯৪০ এ জুলাই মাসে রাঙাকাকাবাবু যখন জেলে। তখন একদিন হঠাৎ আমায় বলে বসলেন —'মাজননীকে বল অসুস্থ হতে।' আমি তো কিছুই না বুঝতে পেরে মাজননীকে এসে বললাম। মাজননী শুনে একটু হাসলেন। 'সুবি'র কথা অনুযায়ী মাজননী তো অসুস্থ হলেন, তাঁর আবদার হল 'আমার যদি কিছু একটা ভালো-মন্দ হয়ে যায়, তবে তো আর ছেলেকে দেখতে পাব না। ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হোক। অনুমতি মঞ্জুর হল। প্যারোলে রাঙাকাকাবাবুকে প্রায় রোজই বাড়ি নিয়ে আসা হতে লাগল। একদিন উনি বাড়িতে এসে আমায় হঠাৎ বললেন, 'ফজলুল হক সাহেবকে লাইন লাগাও'। ইংরিজিতে বলবে আপনার সঙ্গে 'জেল বার্ড' (Jail bird) কথা বলতে চাইছে। এইভাবে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ হল। হক সাহেব ওঁকে বললেন 'তুমি অনশন কর।' উনি তারপর থেকে জেলে অনশন শুরু করলেন। ২৯ নভেম্বর থেকে রাঙাকাকাবাবু অনশন শুরু করলেন। ৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন বিনা শর্তে ওঁকে মুক্তি দিতে।'[২০৯]

এরপর এলগিন রোডের নজরবন্দী থেকে স্বাধীনতার সন্ধানে উড়ে গেল 'জেলের পাখি', মাজননীর বড় আদরের, বড় কাছের সুভাষ। দেশভাগ আর পারিবারিক ঝড়ে সে নীড় হারিয়ে গেল। বিশ্বের দেশপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ে নীড়হারা স্বাধীনতা সন্ধানী সুভাষ চিরস্থায়ী জায়গা করে নিলেন। হয়ে উঠলেন স্বাধীনতার নিজস্ব ও শেষ কণ্ঠস্বর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাঁরা ছিলেন সুভাষের মাতৃসমা

মাতৃ জাতির প্রতি আকৈশোর সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধাভক্তি বরাবরই ব্যতিক্রমি। তাঁর জীবনদর্শন ও ব্যবহারিক জীবনে গভীরভাবে লক্ষ্য করা গেছে। ভাইঝিদের প্রতি স্নেহ, কনিষ্ঠা কিংবা সম্পর্কে বড় দিদি বা বউদিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তির নানা টুকরো স্মৃতি বিভিন্নজনের স্মৃতিকথায় আজও উজ্জ্বল যা সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বল চরিত্রের মূল্যায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে-বিদেশে তাঁর কাজের সূত্রে নানা মহিলার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের ছোট ছোট মূল্যায়নে উঠে আসে তাঁর মেধা-মনীষাদীপ্ত বিপ্লবী সত্তার পাশাপাশি স্নেহময় দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের অনন্য সমন্বয়ের এক সুভাষচন্দ্রকে। আজাদ হিন্দ পর্বে চরম বিপর্যয়ের মুখে রেজিমেন্টের মেয়েরা যাতে ঘরে ফিরে যেতে পারে নিরাপদে তার গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন নিজের প্রাণহানির বিপদ তুচ্ছ করে।[১]

ছোটবেলার পি.ই. স্কুলের শিক্ষিকা মিস সারা লরেন্সকে ছাত্র সুভাষ শ্রদ্ধা করতেন ও মাতৃতুল্যা জ্ঞান করতেন। তিনি লিখেছেন—'শিশুমন উপলব্ধি করার মত তাঁর এই রকম একটা দরদী হৃদয় ছিল যে, আমরা তাঁর প্রতি অদম্য একটা আকর্ষণ বোধ না করে পারতাম না। তিনি না থাকলে, যখন ইংরাজিতে আমি মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারি না। তখন এত সহজে এগিয়ে যেতে পারতাম কিনা আমার সন্দেহ আছে।'[২]

বাল্যকালে সুভাষের খিদে পেলে কান্নাকাটি করতেন না। এককোণে দাঁড়িয়ে মুখে আঙুল দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন। যদি মা এর চোখ এড়িয়ে যেত, তাঁর ধাইমা সারদা ঠিক বুঝতে পেরে যেতেন সুভাষের খিদে পেয়েছে। সুভাষকে অসম্ভব স্নেহ করতেন এই সারদা, বাড়িতে বড়রা সুভাষকে 'সুবি' বলে ডাকতেন।[৩]

এই সারদার কথা কিছু পারিবারিক পত্রে সুভাষচন্দ্র উল্লেখকরে জানতে চেয়েছেন সে কেমন আছে।

ছোটবেলায় অন্ধকারে সুভাষ ধ্যান করতে বসেছিলেন এমন সময় মশারি টাঙাতে এসে এই সারদা অন্ধকারে সুভাষকে দেখতে না পেয়ে বিপত্তি ঘটেছিল।

সুভাষচন্দ্রের মাসিমা নিশাবতী বসুর স্মৃতিকথায় জানতে পারা যায়—'সারদা নামে আমার দিদির এক পুরোন দাসী ছিল। সে সুভাষকে খুবই ভালবাসত, সুভাষও তাঁকে মাতৃসমা দেখত। একবার, দিদি-জামাইবাবু তখন কটকে, সুভাষ এলগিন রোডের বাড়িতে; সুভাষের টাইফয়েড হল। সারদা তখন সুভাষকে অক্লান্ত সেবা করেছিলেন। আমার স্বামী ৺যতীন্দ্রনাথ বসু ডাক্তার ছিলেন। ভবানীপুরে সুভাষদের বাড়িতে প্রত্যহ তিনি যেতেন। তিনি সারদাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে সুভাষকে বলেছিলেন সে দিদিদের কোন আত্মীয় হবেন। সারদা সুভাষকে খুবই যত্ন করত। সুভাষ যখন একবার গুরু খোঁজার জন্য বাড়ি থেকে চলে যায় তখন যে সারদানন্দ নাম নিয়েছিল। এমনই ছিল তার সারদার প্রতি টান।'[৪]

মেজদাদা শরৎ বসুর কন্যা গীতা বিশ্বাসের স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে সারদার অতীত জীবনের এক টুকরো ছবি—'...বাড়িতে এতজন লোক, তবুও জীবজন্তু, বাগান ইত্যাদির তদারক মা জননী নিজে করতেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিশ্বস্ত ও দক্ষ কাজের লোক অনেক থাকত। তাদের দু-তিনজনের কথা আমাদেরও মনে আছে, যথা সুদাম, ইন্দ্রা প্রমুখ। সুভাষচন্দ্রকে মানুষ করেছিলেন সারদা—তাকে বাড়ির কাজের লোকের

মধ্যে ধরা হত না। সে সংসারেরই একজন ছিল। সুভাষচন্দ্রের ওপর তার বিশেষ দাপট ছিল। প্রতি শীতকালে সে তাঁর কাছ থেকে একটি গরম শাল উপহার নিত। সারদাকে আমরা বুড়ো দিদি বলে ডাকতাম। আজীবন যে আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে গেছে। মা জননীর কাছে শুনেছি যে একটি দলের সঙ্গে পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা দেখতে এসেছিল। ভিড়ের মধ্যে সে তার দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর মা জননীর কাছে এলে তিনি তাকে আশ্রয় দেন। তার আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে মা জননী কোনোদিন কিছু জানতে পারেন নি। তবে তাকে দেখে কোনো ভদ্র পরিবারের বলেই মনে হত। বাবা-কাকাবাবুদের কাছে শুনেছি তার হাতের রান্না অপূর্ব ছিল। আমরা তাকে অনেক বৃদ্ধা অবস্থায় দেখেছি। তবে তার স্নেহযত্ন খুবই পেয়েছি। তাঁর বক্তব্য ছিল রাঙা কাকাবাবু জীবনে কিছুই করলেন না। চাকরিতে থাকলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতেন। তাঁর বার বার কারাবরণে খুব দুঃখ পেতেন...'[৫] সুদূর মান্দালয়ে জেলে, কটকে কৈশোর বেলার সেই সারদার কথা সুভাষচন্দ্র ভুলে যাননি, পারিবারিক পত্রে লিখেছেন—'...সারদার কথা প্রায় মনে হয়। সে এখন কেমন আছে? তার এখন প্রধান অবলম্বন কি? ছাগল না বেড়াল, না পাখি, না ছেলে মেয়েরা? কাকে নিয়ে বেশি থাকে?'[৬]

'বালক সুভাষচন্দ্র যেদিন কটকের ইংরেজ মিশনারিদের স্কুল ছেড়ে র‍্যাভেনস কলেজিয়েট স্কুলে এলেন। হ্যাট-কোট পরা ছোট্ট সাহেবটির সেদিন এক নতুন জগতে উত্তরণ। শুভ্র ধুতি চাদর পরিহিত আত্মমর্যাদায় উন্নত মস্তক প্রধান শিক্ষক মহাশয় সেদিন সেই নবাগত উজ্জ্বলমূর্তি বালকটির হাত ধরে পৌঁছে দিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্দরমহলে—জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতির পুণ্যদেউলে।'[৭] এমন সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন অগ্নিযুগের বিপ্লবকন্যা, সুভাষচন্দ্রের 'মাস্টারমশাই' বেণীমাধব দাসের কন্যা বীণা ভৌমিক (দাস) তাঁর স্মৃতিচারণে। বিদ্যালয় জীবনে বেণীমাধব দাসের শ্রেষ্ঠ গৌরব সুভাষচন্দ্র তাঁর শিক্ষাগুরুকে কটকে বেশিদিন পাননি। হঠাৎই তাঁকে বদলি করা হয় কৃষ্ণনগরে। কিন্তু কলকাতার বাড়ি থেকে অন্তর্ধানের আগে পর্যন্ত বেণীমাধব দাসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। যে কয়জন সুভাষচন্দ্রকে দাদা হিসাবে সম্বোধন করতে পারতেন তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে তাঁরা হলেন বেণীমাধব দাস ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র কন্যারা এবং উভয় গুরুপত্নীদের তিনি মাতৃজ্ঞান করতেন। রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যে মাঝে মধ্যেই বেণীমাধব দাসের বাড়িতে চলে আসতেন। এ প্রসঙ্গে বীণাদাস লিখেছেন যে তাঁদের ইচ্ছা করত ওই সুযোগে একটু দেশের কথা আলোচনা করার কিন্তু বাবা বারণ করতেন এবং বলতেন, 'ও আমার কাছে কচ্চিৎ কখনও আসে একটু জুড়োতে—এর মাঝেও তোদের এই সব রাজনীতির কচকচি।'[৮] আর একদিন সুভাষচন্দ্র গেছেন তাঁর 'মাস্টারমশাই' এর বাড়িতে। সে দিন তিনি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে বেণীমাধব কন্যা বীণার ভাষ্যে —'...বাবা বাড়ি ছিলেন না। মা'র ও আমাদের সঙ্গে গল্প করে অনেকটা সময় কেটে গেল। মা তাঁকে এক গেলাস সরবত করে দোকান থেকে ভালো মিষ্টি আনিয়ে খাওয়ালেন। একটু পরে বাবা এলেন। গুরু-শিষ্যের দু'জনেরই মুখ স্নেহে হাস্যে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—তাঁদের প্রগাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ সেই ছবি এখনও যেন চোখে ভাসে। বাবা মাকে বললেন—'কই সুভাষের খাবার জোগাড় করো, এত বেলায় না খেয়ে যাবে নাকি?' আগে থেকে কোনো যোগাড় ছিল না, বাড়ির যা সামান্য রান্না তার সঙ্গেই তাড়াতাড়ি অল্পকিছু যোগ করে নিয়ে তাই দিয়েই তাঁকে খেতে বসানো হল। বাবা আমাদের বললেন 'এই সঙ্গে কিছু লুচি ভেজে দে'। সুভাষবাবু পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে পরিপাটি করে যা দেওয়া হল সব খেয়ে নিলেন। বাবার তাতেও তৃপ্তি নেই, ভাঁড়ার ঘর থেকে কয়েকটি কমলালেবু বের করে আনলেন। এবার সুভাষবাবু হেসে বললেন, 'আর কিন্তু চলবে না' বাবা বললেন 'আচ্ছা তবে পকেট!' 'তাতে অবশ্য আপত্তি নেই' বাবার সামনে সুভাষচন্দ্রের যেন অন্য মূর্তি ফুটে উঠত। সেখানে যেন তিনি আবার তাঁর হারানো কৈশোর ফিরে পেতেন। সব ভাবনা চিন্তা, সমস্যার ভার নামিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত আনন্দে বাবার স্নেহের অমৃত অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করতেন। সবচেয়ে

ভালো লাগত বহু জনসমাগমের মাঝেও সুভাষচন্দ্র যখন আভূমি নত হয়ে শুধু বাবাকে নয় আমাদের মায়েরও পায়ের পদধূলি গ্রহণ করতেন। এই বিনয়-নম্র শ্রদ্ধাবনত মূর্তিটির দিকে চেয়ে ভাবতাম এও কি তাঁর প্রথম জীবনে বাবারই শিক্ষার দান? বিনয় যে বাবার চরিত্রের এক বড় দিক। বাবাকে দেখতাম তাঁর সব চিঠির শেষে নামের স্বাক্ষরের সঙ্গে লিখতেন: বিনয়াবনত বেণীমাধব।'[৯] মাতৃসমার পদধূলি নেবার বর্ণনা পাওয়া যায় বেণীমাধব দাসের আরেক কন্যা কল্যাণী ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায়। সেদিন পার্ক সার্কাস ময়দানে ১৯২৮ সালের সেই বিখ্যাত জাতীয় কংগ্রেস-এর অধিবেশন। 'সুভাষবাবু জি. ও. সি. সবাই ভয় করে চলেছে তাঁকে। সন্ত্রস্ত হয়ে থাকছে। একদিন দেখি তিনি প্রায় দৌড়ে দৌড়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর কাকে যেন প্রণাম করলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখি আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপে দিদিরা ঢুকছেন। সুভাষবাবু গুরুপত্নীকে প্রণাম করে নিয়ে আসছেন।'[১০]

এক অজ্ঞাত মাতৃসমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার বর্ণনা পাওয়া যায় কল্যাণী দেবীর ওই স্মৃতিকথায় —'একবার কোথায় খুব দুর্ভিক্ষ না বন্যা হল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান করতে করতে পুরানো কাপড় ও অর্থ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। সামনে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ার পর—ওপর থেকে ইংরাজ কি এংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা চাকরকে বলে দু-তিনটে এ্যালশেসিয়ান কুকুর ছেড়ে দিলেন। আমরা পিছন ফিরে নীরবে বাইরে চলে এলাম। তাড়ার চেয়ে অপমানটাই বেশি লেগেছিল। হয়তো সুভাষবাবুর কানে সে খবর পৌঁছেছিল। বিকেলে আমাদের ছোট্ট শোভাযাত্রার সামনে এসে তিনি চলতে শুরু করলেন। সামনের ফুটপাত থেকে একটি ছিন্ন-বস্ত্রা বৃদ্ধা ভিখারী হাত নেড়ে তাঁকে ডাকলেন। আঁচলে বাঁধা একটি দশটাকার নোট তাঁর হাতে দিলেন। বললেন—'তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভালো লোক। আমি জীবনে যা জমিয়েছি সব তোমায় দিয়ে গেলাম।' ভালো লোকটি তাকে প্রণাম করলেন পা ছুঁয়ে'।[১১]

বিলেত থেকে আই সি এস এর যাবতীয় পিছুটান বিসর্জন দিয়ে ভবানীপুরে দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে আসেন এবং রাজনৈতিক গুরুশিষ্যের সম্পর্ক যেমন দৃঢ় হয়েছিল তেমনি গুরুপত্নী বাসন্তী দেবীকেও সুভাষচন্দ্র মাতৃসমা জ্ঞান করতেন। দেশবন্ধুর দার্জিলিং-এর স্টেপএ্যাসাইড-এর বাড়িতে রহস্যময় মৃত্যুর পর জেলবন্দি সুভাষচন্দ্র সুদূর মান্দালয় জেল থেকে এক মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন তাঁরই এক সহমর্মী সহকর্মী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে, যাঁকে সুভাষচন্দ্র অনুরোধ করেছিলেন দেশবন্ধুর জীবনী লিখতে এবং উত্তরকালের সে অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল। মান্দালয় জেল থেকে ২০/২/২৬ তারিখে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে সুভাষচন্দ্র বাসন্তী দেবী সম্পর্কে লিখেছিলেন—'দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ করিলে যদি আর একজনের কথা না বলা হয় তবে কিছুই বলা হইল না। যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্তিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়ার ন্যায় সর্বদা দেশবন্ধুর পার্শ্বে থাকিতেন, তাঁহাকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকি থাকে কে বলিতে পারে?

ভোগের অত্যুচ্চ শিখরে যিনি হিন্দুরমণীর আদর্শ লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনো দিন বিস্মৃত হন নাই—বিপদের ঘনান্ধকারে যিনি হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বলচিত্ত স্থৈর্য ও ভগবদ্বিশ্বাস হারান নাই—সেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা। তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন তরুণীদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন, শুধু তরুণদের মাতা নয়—তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙালির হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তাঁহার চরণে সমর্পিত'।[১২]

উল্লেখ্য প্রয়াত দেশবন্ধুর পুরুলিয়া বসতবাটি The Retreat (বর্তমানে মাতৃদেবী নিস্তারিণী দেবীর নামাঙ্কিত কলেজ)-এ অসুস্থ সুভাষচন্দ্র বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে ঐ গৃহে দু'দিন করে থেকে ছিলেন। [১২(ক)]

সুভাষের মতো তরুণ দেশবন্ধু অনুরাগীদের সঙ্গে 'ঝগড়ার মিটমাট হতো মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায়'[১৩] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি—'রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচে গেছে।' উল্লেখ করে কারারুদ্ধ সুভাষ মান্দালয় জেল থেকে অকপটে উল্লেখ করেছেন দেশবন্ধু হারানোর যন্ত্রণার কথা।[১৪] রাজবন্দী সুভাষকে দেশবন্ধু প্রয়াণে বাসন্তী দেবী লিখেছিলেন—'মনে হল যেন দিনের শেষসূর্য আমারই সিঁদুরের রঙে রাঙা হয়ে অস্ত গেল।' [১৪(ক)]

বাসন্তীদেবীর স্মৃতিচারণে এক অন্য সুভাষকে খুঁজে পাওয়া যায়। দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর তিনি সেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে আর থাকতে পারেননি। জীবনের একটা পর্বে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই মাতৃসমার স্নেহের সম্পর্কের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন শ্রীমতী সুতপা চক্রবর্তী।[১৫]

সেই অনুলিখনে প্রভাবতী দেবী ও বাসন্তী দেবীর সুন্দর সম্পর্কের ছবি ধরা পড়েছে ''আজ সুভাষের জন্মদিন। তাই ওর কথাই আজ সকাল থেকে খালি বার বার মনে পড়ছে।

সুভাষ সেই যে গেল—আর এল না। ও যে নেই একথা ভাবা এখনও আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের। কিন্তু ও যে আছেই একথাই বা আর কি করে জোর করে বলি! শুধু আমি তো নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষ তো ও কথা ভেবে এখনও দিশেহারা।...

কেমন খ্যাপাটে ছিল ও, শোনো। আমার ওপর ওর যত জেদ, যত আবদার, যত অভিমান। বলা নেই, কওয়া নেই, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরত ফিরত। রাত ১১টার পরে দুম করে এসে হাজির আমার কাছে। এসেই হুকুম—'শীগগির খেতে দিন, ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

আমি বলি, 'ওমা, সেকি কথা! খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ—কাজের লোকেরা সব পাট চুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গেছে। এখন আমি তোমার জন্য রান্না করতে বসি আর কি!'

বাবু কি আর সে কথা শোনেন! আবদার ধরে বসেছেন—'কেন, ভাতে ভাত খাব।'

তবু বোঝাই, 'ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ওদিকে যে তোমার মা না খেয়ে-দেয়ে খাবার নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে।'

কিন্তু বৃথা অনুরোধ। শেষপর্যন্ত ঐ রাত্রে যা হোক দুটো সেদ্ধ করে আমাদের পূর্ব বাংলায় যাকে বলে ভাতে ভাত রেঁধে, পেট ঠান্ডা করে না দেওয়া পর্যন্ত আমারও রেহাই পাবার কোনো উপায় ছিল না। তাই বুঝি ওর মা আমাকে প্রায়ই একথা বলতেন—'ওর আমি জন্মই দিয়েছি—কিন্তু ওর মা তো আপনি।'

এমনিতে সঙ্কল্পে কঠোর হলেও মনের ভেতরে ওর যে কী আশ্চর্য কোমলতা ছিল তা হয়তো তোমরা অনেকেই জানো না।

ও যখনই যেখানে যেত, ওর পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত। একদিন রাত্রে ও আমাদের বাড়ি এসেছে—এসেই যেমন অভ্যেস, খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়া—কিছুটা বিশ্রাম, এই অবকাশে বোধ হয় নতুন কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। সেদিন, লক্ষ্য করলাম বাড়ির বিপরীত দিকের ফুটপাথে একজন ঠিক ঘোরাঘুরি করতে লেগে গেছে। আমি সুভাষকে কিছুতেই বাড়ি পাঠাতে পারছি না। বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

শেষে বলি—'হ্যাঁ, সুভাষ, তুমি তো দিব্যি এখানে পড়ে রইলে আর ওই বেচারা যে তোমার জন্যে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে—ও তো নড়তে পারছে না ডিউটি ফেলে।'

সুভাষ মজা পেয়ে বলে উঠল, 'ভিজুক ব্যাটা দাঁড়িয়ে, যেমন পেছনে লেগেছে।'

আমি বলি, 'তা ওর কী দোষ বলো। বেচারার চাকরি বাঁচাতেই না এই কষ্ট। কিন্তু ওর তো বাড়িতে স্ত্রী কিংবা মা আছে, ছেলেমেয়ে কিংবা ভাই বোন আছে। ভেবে দেখো তো, ওর জন্য তাদেরও কত ভাবনা হচ্ছে'—

এটুকু বলতেই দেখি সুভাষের চোখ সজল, কোনোমতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে, চোখাচোখি হতে হয়ত বা একটু লজ্জিতও হল। আমি ওর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম—অন্যের কষ্ট ও যে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না—এমন কি কানে তেমন কিছু শোনামাত্র ওর মন যেন ব্যথায় গলে পড়ত।...

সেই সুভাষ।

তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে।—ঠিক করলাম আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব সে আন্দোলনে।

সুভাষ তো কিছুতেই রাজী হবে না। অথচ সে তখন 'বি পি সি সি'র প্রেসিডেন্ট। তার অনুমতি না নিয়ে আমাদের যাওয়াও চলে না। সে বলে, 'আগে আমরা যাই, তারপর তো মেয়েরা। এখনও আপনাদের যাওয়ার সময় হয়নি।'

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি—কিন্তু সে কি বোঝে! অনেক করে বুঝিয়ে শেষে রাজী করালাম। ৬ই মে আমরা আন্দোলনে যোগ দিলাম। ওঁর সম্মতি তো আগেই পেয়েছি। আমি আমার ননদ ঊর্মিলা দেবী আর সুনীতি মিত্র গ্রেফতার হলাম।—আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল বটতলা থানায়।

এদিকে আমাদের গ্রেফতারের খবর পেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বটতলা থানা ঘেরাও করে ফেলেছে। দারুণ উত্তেজনা। সেই জনতাকে কোনো শক্তি দিয়ে রোখা যাচ্ছে না।

পুলিশ অফিসারকে বললাম, আমাদের বাড়ির গাড়ি আনার ব্যবস্থা করে দিতে—সেই গাড়িতেই আমি জেলে যাবো, নইলে ওঁদের গাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ধাক্কা ওঁরা সামলাতে পারবেন না।

আমরা লালবাজারে এলে একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার জানালেন, আমরা যদি লিখিতভাবে শপথ করি আন্দোলনে আর যোগ দেবো না, তবেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। মজার কথা শোনো, শপথই যদি করবো তবে গ্রেফতার হলাম কেন!

কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহা বিপদে, একদিকে স্বাধীনতাকামী ক্ষুব্ধ দেশবাসী—আর একদিকে আইন। যা হোক, আমাদের জেলে পাঠানোই সাব্যস্ত হ'ল।

গেলাম জেলে।

ওমা, রাত দুটোয় হাঁকাহাঁকি।

কী ব্যাপার?

মুক্তির আদেশ এসে গেছে। চলে যেতে হবে।

জেলের অধ্যক্ষকে বললাম—'রাতটা কাটুক, কাল সকালেই না হয় যাবো।'

কিন্তু না, গভর্নরের আদেশ অবিলম্বে মুক্তির।

রাত দুটোয় অগত্যা বাড়ি।

আমাদের দেখে উনি তো অবাক, সেই সঙ্গে মহা ক্ষুণ্ণও হলেন।

—'ফিরে এলে?'

—'কী করবো? ছেড়ে দিলে যে'।

রাত দুটোয় সুভাষও কোত্থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছে। মুখ তার তখনও কালো, সে মুখে কালবৈশাখীর গভীর অন্ধকার।

বুঝলাম, সুভাষ তখনও শান্ত হয়নি।

হেসে বললাম—'কি, এবার হয়েছে? ফিরে তো এলাম; আর কেন?'

কালবৈশাখীর মেঘ সরে গেল, শুরু হ'ল বর্ষণ। সুভাষের সে কী কান্না! কী ভালোই সে বাসতো আমাকে!...

সুভাষ কিন্তু খুব ভালো রাঁধতে পারতো, তা জানো? ওঁর জন্য দিনের খাবার তো আমিই তৈরি করে নিয়ে যেতাম—রাত্রে ওঁর রান্না জেলের মধ্যে সুভাষ তৈরি করে নিতো। আর আমার কাজ কি শুধু রোজ সকালের খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া? রোজই সুভাষের ফর্দ থাকতো—বাজার থেকে এটা আনা চাই, ওটা আনা চাই। আর তার চাই বললেই তো সে এক প্রচণ্ড দাবি হয়ে দাঁড়ানো!

অবশ্য মায়ের মতো বলে ছেলের আবদার ছিল যেমন, তেমনি বন্ধুর মতো তার মনের গোপন কথাগুলোও আমার কাছেই বলা চাই। ওর দুর্বলতা কোথায়, কতটুকু—তা ও আমার কাছে গোপন করতে পারতো না—এই জন্য কতো সময় কতো যে আমরা হাসি-ঠাট্টাও করেছি।

আজ সে সব দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে।"

নেতাজির মাতৃসমা বাসন্তী দেবীকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন নেতাজির ভাইঝি গীতা বিশ্বাস। তাঁর 'পুরানো সেই দিনের কথা' পুস্তিকায় এ প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতিচারণা খুঁজে পাওয়া যায়। বাসন্তী দেবীকে গীতা দেবী ঠাকুমা বলে ডাকতেন। 'সুভাষচন্দ্রের দেবতুল্য শিশু সুলভচরিত্র ঠাকুমার মন জয় করে নিয়েছিল। দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য তাঁরও পুত্রবৎ হয়ে যান। তাই সর্বদাই তাঁর মুখে সুভাষচন্দ্রের কথা। আমরা ছোটো বয়স থেকে যখনই তাঁর কাছে যেতাম সব থেকে ভালোবাসতেন তিনি সুভাষের গল্প করতে। বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে আধার করে শুধু তাকেই সুভাষের গল্প শুনিয়ে গেছেন বলে মনে করি না।'[১৫(ক)]

কলকাতা কর্পোরেশনে মুখ্য প্রশাসক হিসাবে সুভাষচন্দ্র যোগ দিলেও তিন হাজার টাকার জায়গায় অর্ধেক বেতন নিতেন এবং সে অর্থও সমাজ সেবায় প্রায় সবটাই ব্যয় করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে গীতা দেবী একটি সুন্দর স্মৃতিচারণা করেছেন—'ঠাকুমার (বাসন্তী দেবী) সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ছিল। দেশবন্ধু যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন সুভাষচন্দ্রকে Chief Executive Officer করতে চাইলেন। রাঙাকাকাবাবুর এতে ঘোরতর আপত্তি। তিনি বললেন তিনি কি চাকরি ছেড়েছেন, আবার চাকরি করার জন্য? দেশবন্ধু বাসন্তী দেবীকে বললেন সুভাষকে বুঝিয়ে সম্মত করাতে। বাসন্তী দেবী সুভাষকে বললেন 'দ্যাখ সুভাষ, তোর যদি টাকার না দরকার থাকে, ও টাকা আমাকে দিয়ে দিস। আমার টাকার খুব প্রয়োজন আছে।' দেশবন্ধুর দেশের কাজে সর্বদাই টাকার প্রয়োজন। এই কথাগুলি ঠাকুমার কাছেই শোনা। রাঙাকাকাবাবু চাকরি নিলেন। [১৫(খ)] জেলের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের দুর্গা পুজো করার আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে বার্মার জেলেও তিনি সহবন্দীদের নিয়ে পুজোর অধিকার আদায় করেছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনের থেকে। এ প্রসঙ্গে গীতা দেবীর স্মৃতিভাষ্য—'ঠাকুমার কাছে শুনেছি সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্যরা জেলের মধ্যে পূজা করেছিলেন; বলেছিলেন 'সুভাষচন্দ্রের সে চেহারা তিনি কোনোদিন ভোলেননি। খদ্দরের ধুতিপরা, গায়ে গেরুয়া চাদর, কপালে হোমের টিকা। সৌম্যকান্তি, প্রশান্ত সে চেহারা দেখে ঠাকুমার মনে হয়েছিল ভগবানের দূত। এই বর্ণনা ঠাকুমার মুখে শোনা। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রাঙাকাকাবাবু প্রায়ই ঠাকুমার কাছে যেতেন। সারাদিন তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতেন সেজন্য রাত্রে তিনি যেতেন ও ঠাকুমার কাছে খাওয়ার বায়না করতেন। ঠাকুমা যদি তাঁকে বলতেন যে অত রাত্রে তাঁর খেতে দেবার কিচ্ছু নেই, রাঙাকাকাবাবুও তাঁকে 'ফ্যানাভাত' করতে বলতেন। ঠাকুমা তৈরি করে দিলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে তিনি বহুক্ষণ ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করতেন...।'[১৫(গ)]

একদা বৃদ্ধা বাসন্তী দেবীর মুখে বসানো হয়েছিল এবং বিশ্বাসযোগ্য করে মিথ্যা বোঝানো হয়েছিল যে সুভাষচন্দ্র বসু ঘনঘন বিদেশ যেতেন নাকি প্রেমিকা এমিলি শেঙ্কেল-এর সঙ্গে দেখা করতে এবং জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা ব্রিজেট শেঙ্কেলকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বলা হয়েছিল ইনিই 'সুভাষ কন্যা অনীতা'। বৃদ্ধা বাসন্তী দেবীর কাছে এই গল্প বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অ্যানিটার সঙ্গে থাকতেন দাবিদার পরিবারের

কয়েকজন। একদা 'নারীজগৎ' পত্রিকার সম্পাদিকা হেনা চৌধুরী লেখককে জানিয়েছিলেন যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি বাসন্তী দেবীর অ্যানিটাকে সমর্থন প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে কৃষ্ণা বসু তাঁকে এইসব লিখতে বলতেন তাই লিখতেন। উল্লেখ্য হেনা চৌধুরী নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কৃষ্ণা বসু (চৌধুরী)র খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) এর প্রাঙ্গণে লেখকের কাছে হেনা চৌধুরীর স্বীকারোক্তি পরবর্তীকালে রেকর্ড করা যায়নি কারণ কিছুদিন পরেই তিনি প্রয়াত হন। তবে নেতাজির ভাইঝি গীতা বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিচারণে কোথাও সুভাষচন্দ্রের মিথ্যা সাজান বিবাহ গল্পকে গুরুত্ব দেননি। যদিও ওই পরিবারের বধূ কৃষ্ণা বসু (চৌধুরী) তাঁর নানা বইতে বাসন্তী দেবীর জবানীতে 'সুভাষচন্দ্রের বিবাহ কন্যা'র গল্প গাথা প্রচার করে গেছেন। গীতা বিশ্বাস তাঁর লেখনীতে তুলে এনেছেন সুভাষ বিহনে মাতৃসমা বাসন্তী দেবীর শেষ জীবনের এক হৃদয়বিদারক চিত্র—'রাঙাকাকাবাবু দেশ থেকে চলে যাবার পর বাসন্তী দেবী একবার খুব অসুস্থ হন, তাঁর stroke হয়েছিল। বাড়ি ভর্তি লোক তাঁকে দেখবার জন্য আসছেন। কিন্তু তাঁর ঘরে যাবার অনুমতি ডাক্তাররা দিচ্ছেন না। তাঁদের বাড়ির চিকিৎসক ছিলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। বাবা পাশের ঘরে বসে আছেন। প্রায় অচেতন অবস্থায়ও ঠাকুমা বাবার গলা বুঝতে পারলেন ও জড়ানো কথায় বাবাকে তাঁর কাছে ডেকে দিতে বললেন। এ রকমই ঠাকুমার প্রাণের সম্পর্ক ছিল বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে। রাঙাকাকাবাবুর দেশত্যাগ ও বাবার পরলোক গমনে তিনি খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তবে তিনি এ কথা বলতেন যে সুভাষচন্দ্র কখনোই সন্ন্যাসী হয়ে যাননি, দেশের কাজেই তিনি গেছেন। পরে যখন আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, বয়সের ভারে ও নানা আঘাতে তাঁর স্মৃতিশক্তি বিলোপ হয়েছিল। সুভাষ যে দেশে নেই, সেটা ভুলে যেতেন। আমাদের দেখলে বলতেন, 'সুভাষকে বলিস তো, এত কি কাজে ব্যস্ত, যে আমাকে একবার দেখতে আসতে পারে না?' আমাদের খুব কষ্ট হত।'[১৫(ঘ)] গীতা বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যাচ্ছে 'স্মৃতিশক্তি বিলোপে'র সুযোগ নিয়েই তার জবানিতে 'সুভাষচন্দ্রের বিবাহ-কন্যার' গল্প ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন—'গুরুজন কেউ এলে রাঙাকাকাবাবু আমাদের শেখাতেন তাঁদের প্রণাম করতে। বিশেষ করে মনে আছে বাসন্তী দেবী যখন আসতেন, আমরা তাঁকে প্রণাম করেছি কি না বারবার জানতে চাইতেন। তিনি নিজেও সর্বদা তাঁকে প্রণাম করতেন।'[১৫(ঙ)]

নেতাজি রচনাবলীতে প্রকাশিত বাসন্তী দেবীকে শেষ চিঠিটি লিখেছিলেন সুভাষ ওয়ার্ধা থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ সালে। তখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি হয়েছেন।

'শ্রীচরণেষু

মা!

আমি আজ কলিকাতায় রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে ১১ই রওনা হব। হরিপুরায় ১৩ই তারিখে পৌঁছিব।

আপনি কি হরিপুরায় যাবেন না? গেলে আমি খুব সুখী হব। তার কারণ আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। যাঁর চরণে বসে রাজনীতি শিক্ষা করেছি—আজ তিনি নেই। থাকলে কত আনন্দ করতেন। বেশি কথা লেখার প্রয়োজন নেই—আপনি বুঝবেন। শীঘ্র উত্তর দিবেন (যদি কলিকাতার বাহিরে থাকেন—কারণ আমি ১১ই রওনা হব।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন—

ইতি

আপনার সেবক

সুভাষ

পুনঃ

একটা কথা ভুলবেন না—
'আত্মবৎ মান্যতে জগৎ'
সুভাষ

বৃদ্ধা বাসন্তী দেবী চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের পিছনে নফরকুণ্ড রোডের বাড়িতে আজীবন কাটিয়ে যান। দোতলার বারান্দায় বসে রাস্তায় মানুষের যাতায়াত দেখতেন আর হৃদয়ে নিঃশব্দে বহন করতেন গৌরবময় ত্যাগদীপ্ত জীবন আর পরিবারের ঐতিহ্যকে। দেশের জন্য দেশবন্ধু তাঁর বসতবাড়ী 'কালীসদন' দান করে দিয়েছিলেন। আজ প্রতিদিন সেখানে চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার মানুষ আসেন। হাসপাতালগুলি আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্নেহময় স্মৃতি লালন করতেন মনজগতে। যদিও পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো লেখিকা, সাংবাদিক তাঁর মুখে সুভাষচন্দ্রের প্রেম-বিবাহ কন্যার অবান্তর কথা বসিয়েছিলেন। [১৬]

গান্ধীজির স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধীকে 'মা' এর মতোই দেখতেন। তাঁর অসময়ে প্রয়াণ সুভাষচন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল। পুনা জেলে ১৯৪৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে তাঁর মৃত্যুতে আজাদহিন্দ এর রাষ্ট্রপ্রধান বলেছিলেন—'Kasturba Gandhi is no more. She died at the age of 74 in British Jail ...I salute this great woman who was like a mother to Indians ...Kasturba was an inspiration for millions of Indian girls with when she lived and met during the freedom struggle of our motherland...'
জেলের ভিতর গান্ধীজির সহধর্মিণীর মৃত্যুকে তিনি শহিদের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের আন্দামান (শহিদ দ্বীপ) শাখা সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য শাখাতেও কস্তুরবা গান্ধীর প্রয়াণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সভা ও কার্যসূচি পালিত হয়।

মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর স্ত্রী বিভাবতী বসুকে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে থাকাকালে অনেক প্রয়োজনীয় পত্র দিতেন। সেগুলি যেমন তাঁর জেলজীবন এর পরিবেশ বুঝতে পারা যেত তেমনি বসু পরিবারের সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কেও অনেক কথা জানা যায়। বিভিন্ন সময় তাঁর মেজবৌ দিদিকে লেখাপত্রে শরৎবসুর প্রতিও কৃতজ্ঞতা ও সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ পেত। দুর্ভাগ্যের বিষয় সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের কিছু বছর আগে থেকেই সম্পর্কের সেই উষ্ণতা আর ছিল না। মেজদার উডবার্ন পার্কের বাড়ি ছেড়ে সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের পৈতৃক গৃহে ফিরে আসেন। স্বাভাবিকভাবেই শরৎ বসুর পুত্রকন্যাদের সঙ্গেও আগের মতন তাঁর আর নৈকট্য বজায় থাকেনি।[১৭] শরৎ বসুর মৃত্যুর পর বিভাবতী বসু সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত 'বিবাহ-কন্যার' গল্প লেখা একটি চিঠি যেটি বাংলায় মেজদাদাকে লেখা বলে কথিত, সেটি ১৯৫১ সালে প্রথম যেটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। এমন চিঠি শরৎ বসুর পুত্র, পুত্রবধূ ও তাদের সন্তানরা নানা বইপত্রে ছেপে থাকেন। যদিও পরবর্তী চিঠিগুলির একই বয়ান হওয়া সত্ত্বেও বারংবার বানান সংশোধন প্রচেষ্টায় ওই চিঠির মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং স্পষ্টতই জাল বলে বোঝা যায়।[১৮] সুভাষচন্দ্রের একদা মাতৃসমা মেজবৌদিদি দক্ষিণ কলকাতা বিধানসভা কেন্দ্রে শরৎ বসুর শূন্য আসনে সংযুক্ত বাম ও সমাজবাদী সমর্থিত নির্দল হয়ে জয় লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে কার্শিয়াং-এ রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে যান। কলকাতার বাড়ীতে আটদিন পর ২৪ জুন বিভাবতী বসু মারা যান।[(১৯)]

তৃতীয় অধ্যায়

সুভাষচন্দ্রের বঙ্গজননী—ভারত মাতা

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান ছিল '... আমরা জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'। শুধু সুভাষচন্দ্রের কৈশোর যৌবনের ভাবনায় নয়, সারা জীবনটাই তাঁর ভারতমাতার জন্য নিবেদিত এক মহাপ্রাণ। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১-তে সেই বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছিল মাতৃভূমির সেবায় উৎসর্গীকৃত স্বদেশভক্তদের বদান্যতায়। বঙ্গভূমি থেকেই জ্ঞান মনীষার স্ফূরণ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৎকালীন রাজধানী শহর কলকাতা, অখণ্ড বাংলার অন্যতম রাজনীতি সচেতন জননেতা ও বিপ্লবীকুলের বিবরণ ক্ষেত্র ছিল। রবিঠাকুরের 'সোনার বাঙলা'র ভাবনা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন তরুণ সুভাষচন্দ্র। সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে চৌদ্দমাস কাটিয়ে দেবার পর সহকর্মী অনাথবন্ধু দত্তকে তিনি লিখেছেন—'... জেলে আছি—তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্য দুঃখ ভোগ করা সে ত' গৌরবের কথা! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে?... অবশ্য বৎসরের ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা এভাব আমার থাকে না, কারণ—এখনও শৃঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে। ...প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতো তাদের মারফত অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,
বহিতে আমার সুখ।'

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্ত গমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ করে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙলার আকাশ, বাঙলার সূর্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তাকে পূর্বে জানত! প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙমণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দায় আঘাত ক'রে বলে, 'অন্ধ জাগো'—তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্যোদয়ের কথা, যে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গজননীর দর্শন পেয়েছিলেন'।[১]

এমন কাব্য সুষমায় সুভাষিত সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায় বাংলা থেকে নির্বাসিত বন্দি জীবনের বেদনার মধ্যেও। রবি ঠাকুরের সেই 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/ কী অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'র মনোমুগ্ধকর সংগীতের সুর সুভাষ হৃদয়ে ঝংকৃত হয়েছিল অনুমান করা যায়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবি কাজি নজরুল ইসলামের বঙ্গজননী—দেশমাতার অপূর্ব বন্দনা বন্দী সুভাষের মননে মিশে গিয়েছিল। নিবেদিতা, দেশবন্ধু ও অরবিন্দের বঙ্গজননী, দেশ মাতার বিমূর্তভাব বহু আগেই সঞ্চারিত হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের ভাবনালোকে। আই সি এস চাকুরি প্রত্যাখানের প্রাকমুহূর্তে সুভাষচন্দ্র যে পত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখেছিলেন সেখানে ছিল দেশমাতার চরণে আত্মোৎসর্গের আর্তি—

'...আপনি বাঙ্গলা দেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার

বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।'[২]

দেশবন্ধুর রাজনীতি, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর হৃদয় আবেগের প্রতিধ্বনি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে 'তরুণের স্বপ্নে'র নায়কের কলমে—'আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য যদি গগনে সূর্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরাপ্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে—ধ্যানের দ্বারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা'।[৩]

তিনি লিখছেন—'...জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।'[৪]

বাংলার প্রতি সুভাষচন্দ্রের অসম্ভব টান বারংবার তাঁর নানা চিঠিপত্রে লেখনীতে উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন—'দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বলে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাংলার নরনারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।... বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষ কেন—পৃথিবীতে, তার একটা স্থান আছে—এই সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে।... সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প-কলা, শৌর্য-বীর্য, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (Cultured synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীর আছে।... এমন নরম মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরল প্রাণ! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে বলেই বাঙ্গালী সুন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমির অশ্রুজল সেবন করেই বাঙ্গালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল দেখাতে পেরেছে।'[৫]

সুভাষচন্দ্রের চোখে বাংলার মাটি, বাংলার সজল প্রকৃতি নানারূপে ধরা পড়েছে। বাংলার শান্ত সবুজের মাঝে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধারার সাধনা তাকে মুগ্ধ করেছে। বঙ্গজননী তাঁর কাছে নানারূপে ধরা দিয়েছে বারংবার। 'দেশমাতৃকার অকিঞ্চন সেবক'[৬] হিসাবে সুভাষচন্দ্র বাঙালির তরুণ সমাজও বিপ্লব ও সংগ্রামের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করেছেন—'বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাইসকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র ও কারা যন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ...ওগো বাঙ্গলার যুবকসম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে।... তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃ বন্ধনের 'রাখি' পরিধান করে, মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।'[৭]

সুভাষচন্দ্রের বঙ্গজননী থেকে ভারতলক্ষ্মীর সৌন্দর্য ও মুক্তি সাধনার এই উত্তরণের নেপথ্যে কারাবাসের দীর্ঘ যন্ত্রণা। তিনি বার্মার কারাগারে বসে নিজে হাতে তাঁর ডায়েরির পাতাতে রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' লিখেছিলেন। বাংলা মায়ের জন্য তাঁর মর্মযন্ত্রণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হয়তো কারাবাসের বেদনা উপলব্ধি করেই এমন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। 'মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ' সুভাষচেতনার কেন্দ্রে সমর্পিত। এই ভাব তিনি তাঁর নিজের জীবন সংগ্রামের মধ্যে, বঙ্গজননীর আরাধনার মধ্যে লাভ করেছিলেন। '...আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশমাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত! তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ 'আমার সকল ব্যথা রঙ্গিন হয়ে, গোলাপ হয়ে' ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্বে আমি বাংলাকে, ভারতভূমিকে ভালোবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাংলাকে, পুণ্য ভারত-ভূমিকে শতগুণে ভালোবাসতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস —'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' বাংলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের পরশমণি আমায় দিনদিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য ভাগীরথী ও বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাংলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদবরণ করা কত গৌরবের কত সৌভাগ্যের কথা।'[৮]

বাংলার তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে সুভাষচন্দ্র বারংবার বার্তা দিতে চেয়েছেন বাংলার মাতৃজাতির প্রতি যেন কোনো অসম্মানজনক ঘটনা না ঘটে। 'মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বাংলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারীসমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ঘটিত না এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ সমাজ অম্লান বদনে ও নিশ্চিন্ত মনে তাহা সহ্য করিত না।... আমরা মুখে বলি, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালোবাসি? জননীকে ভালোবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালোবাসা নয়, সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালোবাসা। বাংলাদেশ —বাংলার জল, বাংলার শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাণধর্ম বাংলার নারী জাতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বাংলার মাতৃ জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না—সে বাংলাদেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না—ভালোবাসে না—সে কি করিয়া মানুষ হইবে?... জীবনে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা সুন্দর, যাহা কিছু কল্যাণকর—সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি, দেশ মাতৃকার অপরূপ রূপে মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবন মনোমোহিনী মাতৃমূর্তিতে। অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখো; মাতৃজাতিকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর, নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হও।'[৯] ওই ছাত্র সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্র এরপর মনুঋষির সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে—'যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন; যেখানে নারীর সম্মান নাই, যে দেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল। যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হইয়া থাকেন) সে কুল অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং যে কূলে তাহাদের কোনো দুঃখ, কষ্ট, শোক নাই—সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন ওই ছাত্রসভাতে—'সে যুগে এ দেশে নারীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গীর মতো ঋষিপত্নী জন্মিয়া ছিল, সে যুগে খনা, লীলাবতীর মতো বিদূষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাই ও ঝাঁনসীর রানীর মতো বীর-রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সোনার বাংলাতেও আমরা একদিন রানী ভবানী, দেবী চৌধুরানীর মতো রমণী দেখিয়াছিলাম'।[১০]

সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল তরুণ বয়সে অসাধারণ ভ্রমণ উপন্যাস লিখেছিলেন 'মহাপ্রস্থানের পথে'। লেখককে পাঠ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু—

'... 'রাধারানী'র জন্য আমার বাস্তবিক কষ্ট হইয়াছে এবং আপনার উপর রাগ হইয়াছে—আপনার হৃদয়হীনতার জন্য—যদিও আপনি বলিতে পারেন যে, হঠাৎ ঐ অবস্থায় পড়িলে আমিও ঐরূপ আচরণ করিতাম। হঠাৎ ঐ অবস্থায় পড়িলে আমি কী করিতাম সে অনুমান এখন করিয়া লাভ নাই। তবে একথা আমি বলিতে পারি যে, আমার মতে আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় স্ত্রী জাতির উপর ঘোর অন্যায় ও অবিচার করা হয় এবং তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোক আমরা, তাহা দেখিয়াও দেখি না।...'

সুভাষচন্দ্রের মাতৃসাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরাধীনতার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা নয়, সর্বপ্রকার বন্ধনে থেকে আগামী স্বাধীন নাগরিকদের কুসংস্কার মুক্ত উন্নত দেশের সমতুল হিসাবে গড়ে তোলা। দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির লক্ষে নারী স্বাধীনতাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৯-এ মেদিনীপুর যুব সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে তরুণ সুভাষচন্দ্র বলেন—'জাতিভেদের অচল আয়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে; নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজেও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে। অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।'

দেশজননীর শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি নয়, মাতৃজাতির সামাজিক বন্ধন মুক্তিও ছিল সুভাষচন্দ্রের মাতৃপুজোর অন্যতম লক্ষ্য ও সাধনা। তৎকালীন ছাত্রসমাজের নয়নের মণি সুভাষচন্দ্র ডাক দিয়েছিলেন—'আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্য-বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে; স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার দিতে হইবে; উপযুক্ত স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; অবরোধ প্রথা দূর করিতে হইবে। বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে— এমন কি স্বাবলম্বী হইবার মতো অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে, এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে। যদি এই সব নীতি কার্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে সে ভার যুবকদের গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বহু যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার বশতঃ যাঁহারা ধর্ম ও লোকাচারকে অভিন্নজ্ঞান করেন, সেই সব প্রাচীন পন্থীরা হয়তো এ কাজে বিশেষ বাধাপ্রদান করিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্তু সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন।[১১] তিনি জাগ্রত তরুণদের প্রতি আহ্বান করছেন—'... কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাটকা রাঙা ফুলেই দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে, পুরানো বাসি ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না'।[১২] দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণের পর জীবনীকার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে মান্দালয় জেল থেকে লেখা এক পত্রে[১৩] দেশমাতার প্রসঙ্গ নতুন রূপে ধরা দিয়েছিল—'যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য কোনওদিন তান্ত্রিক সাধনা করেন নাই, অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না করিলে যে শক্তিমান হওয়া যায় না—একথা আমি স্বীকার করি না। তন্ত্রের সার কথা শক্তিপূজা। জগতের মূলসত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে; বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশি বলিয়া বাঙ্গালী জাতি হিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালোবাসে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও

ধর্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদি, আরব, খৃষ্টান) ভগবানকে পিতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য, সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃকুলে কল্পনা করিতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজ পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য, সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন বাংলাদেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালোবাসে—একথা সর্বজন বিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি কল্পনা করিয়া থাকি, মাতৃভূমির তর্জমা—Father land, আমরা অবশ্য Mother land কথাটি চালাইয়া থাকি কিন্তু ইংরাজি ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়। বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতারম।'

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন—

'যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ'

এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

'ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

তখন তাঁহারা তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিম-লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর।' সুভাষ জীবনের মননে কর্মে দেশবন্ধুর মাতৃ ভাবনা, দর্শনের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়। সুভাষ মননে মাতৃপূজারি স্বামী বিবেকানন্দের নানা কবিতা বিভিন্ন সময়ে অনুরণিত হয়েছে। তাঁর কণ্ঠে, লেখনীতে যুগনায়ক ও যুবনায়ক বিবেকানন্দের নিজের ভাষ্য উঠে এসেছে যা সুভাষ হৃদয় আত্মস্থ করেছিল—

'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয়,
তাহা না ডারাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'[১৪]

মান্দালয় জেল থেকে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন—'...জনসেবা হল সন্ন্যাসধর্মের মতন—একজন যখন একাজে প্রবেশ করে, তখন তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার করে, তাকে সকল দম্ভের অবসান ঘটাতে হয়। একবার একাজে প্রবেশ করলে, ফিরে যাওয়ার রাস্তা নেই। ...তবে জীবনের ধর্মই হল, হৃদয় যার যত প্রসারিত দুঃখ তার তত গভীর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।'[১৫]

জেলবন্দি তরুণ সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে বসেই মেজবউদিদি বিভাবতী বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন—'...অবশ্য যে কষ্টটা মানুষ পরের জন্য ভোগ করে তার মধ্যে যতটা সুখ পায় বোধহয় অন্য কোনো

কষ্টের মধ্যে ততটা সুখ পায় না। মা ছেলের জন্য, ভাই ভাইয়ের জন্য, বন্ধু বন্ধুর জন্য অথবা স্বদেশসেবী দেশের জন্য, যে দুঃখ ভোগ করে, তার মধ্যে যদি আনন্দ না পেতো, তবে কি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতো? ভক্ত যে বিরহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে থাকে একথা খুব ঠিক। কারণ এক বৎসরকাল দেশান্তরিত হয়ে আমি অনুভব করছি আজ আমার জন্মভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে এখন যত ভালোবাসি, জীবনে এত ভালোবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয়—সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাইরে দেশছাড়া—কিন্তু অন্তরের মধ্যে কল্পনার মধ্যে দেশকে পেয়ে থাকি? আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?...' এর পরের পাঁচটি পঙক্তি সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়েছিল!

তিনি আরও লিখছেন কারান্তরালে বসে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ীর কথা।

'পূজার কথা বোধহয় এখন পুরোন হয়ে গেছে। এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কিনা জানি না। আর অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমতি পাই তাই বোধহয় পূজার মধ্যে আনন্দ বেশি আনন্দ পাই। কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি ৺মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গা মূর্তির মধ্যে আমরা স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।'[১৬] ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর বক্তৃতায় ভারতমাতার মুক্তির জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামের আহ্বান বিভিন্ন সময়ে শোনা গেছে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে মাতৃভূমি মুক্তির সংগ্রামে তাঁর নানা নেতার বক্তৃতায় প্রবাসী ভারতীয়দের সার্বিকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন। ১৯৪৪ সালের এক ঐতিহাসিক ভাষণ 'প্রাইস অব লিবার্টি বা স্বাধীনতার মূল্য' শীর্ষক বক্তব্যে খুঁজে পাওয়া যায় আজাদ হিন্দ এর সর্বাধিনায়ককে এক শাক্তসাধক মাতৃপূজারি রূপে। আজাদ হিন্দের আত্মঘাতী বাহিনীর প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল —'আমাদের মাতৃভূমি আজ স্বাধীনতা চাইছে। স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু স্বাধীনতার দেবী তাঁর বেদি তলে বলিদান চান। স্বাধীনতার দেবী চান অপরিসীম আত্মত্যাগের পাশাপাশি তোমাদের শক্তি, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের নৈতিক মূল্যবোধ সহ সবকিছু যা তোমার। বিগত দিনের বিপ্লবীকুলের মতো, তোমাদের চাহিদা, তোমাদের বিলাস, আনন্দ, অর্থ, সম্পত্তি সব কিছু। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক হিসাবে তোমরা সন্তানদের পাঠিয়েছ। তবু স্বাধীনতার দেবী এতে সন্তুষ্ট নন। তাঁকে খুশি করার গোপন কথাটি জানাচ্ছি। তাঁর দাবি শুধুমাত্র ফৌজের জন্য যোদ্ধা ও সৈনিক নয়, তাঁর দাবি বিদ্রোহী পুরুষ ও নারী যাঁরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আত্মঘাতী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবেন। বিদ্রোহীরা শত্রুপক্ষকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দেবে তাঁদের নিজের শরীরের রক্তে।

তুম মুঝে খুন দো,
ম্যাঁয় তুমকো আজাদি দুঙ্গা।

তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের মুক্ত করব—এটাই স্বাধীনতার দাবি। আমার কথা শোন। আমি তোমাদের আবেগসর্বস্ব সম্মতি চাই না। আমি চাই বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসুক এবং আত্মঘাতী বাহিনীর শপথ পত্রে স্বাক্ষর করুক, যা কিনা স্বাধীনতা দেবীর বেদীতলে মৃত্যুর ছাড়পত্রের দলিল। কিন্তু তোমরা এই মৃত্যুদলিলে সাধারণ কালিতে স্বাক্ষর নয়। তোমাকে নিজের রক্তে লিখতে হবে। আমি এখানে থাকব তোমাদের রক্ত স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করতে যাঁরা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য এই কাজ করবে এগিয়ে এস।'[১৭]

রক্তস্বাক্ষরের সেই দলিল পত্রটি গোপনীয় আজাদ হিন্দ ফাইলের কোন নিভৃত স্থানে আছে জানা না গেলেও জানা যায় সেদিন তরুণ তরুণীরা বিপুল উৎসাহে তাঁদের রক্তস্বাক্ষর তুলে দিয়েছিলেন নেতাজির হাতে। আজ যখন দিল্লির লালকেল্লায় ত্রিবর্ণশোভিত জাতীয় পতাকা ওড়ে তখন নেতাজির এইসব মুক্ত পাগল

দামাল মাতৃ সাধকদের কথা কতটুকু মনে রাখে জাতি! কতটুকুইবা সৎ প্রচেষ্টা হয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য?

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর বিভাগের অন্যতম দলনায়ক ডা. পবিত্র মোহন রায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সাবমেরিনে পুরী উপকূলে এক দুঃসাহসিক অভিযানের পর কয়েকজন অবতরণ করেন। ভারতের সংবাদ অতি গোপনে আজাদ হিন্দ এর সদর দফতরে পাঠানোর লক্ষ্যে। ভারত রওনা হবার আগের দিন গভীর রাতে নেতাজি ডা. রায়কে ডেকে অনেক কথা বলেছিলেন যা এক অধ্যাত্মবোধে জারিত মহাসাধকের মর্মবাণী—

'দেশমাতৃকা—জন্মভূমির সেবা করতে হলে দিতে হবে 'মান, সম্মান, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, গৌরব, ইন্দ্রিয়ের সব বৃত্তি, ভাবনা, চিন্তা, ইচ্ছা এবং সব শেষে আত্মাকে।' এ নাহলে মাতৃসাধনা হবে না। নিজেকে কেটে দুখানা করতে হবে—না করতে পারলে তুমি মাতৃসাধক নও..'[১৮]

আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিশ্ব সমর ইতিহাসে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর মাতৃমুক্তি সাধনার সংগ্রামে। সময়ের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন তিনি। ১৯২৮ সালে কলকাতায় ও পরবর্তীকালে ১৯৪০ সালে রামগড়ে ফরোয়ার্ডব্লকের আপোষবিরোধী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবিকাদের বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রবাসী ভারতীয়দের থেকে নানা ক্ষেত্রের, নানাধর্মে সাহসী দেশপ্রেমী তরুণীদের নিয়ে আলাদা ঝাঁসি রেজিমেন্ট গড়ে তোলা হয়েছিল। নার্সিং, সমরক্ষেত্রে, সরকারের নানা কাজে ট্রেনিং প্রাপ্ত এই রানীদের বীরত্ব বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য বিরল ঘটনা। আজাদ হিন্দ-এর বীর আজাদি জোয়ানদের মতোই ঝাঁসীর রানী রেজিমেন্ট মাতৃপূজার বলিদানের জন্য প্রস্তুত ছিল। ঝাঁসী রেজিমেন্টের দুই নারী সৈনিক মিস জোসেফাইন ও মিস স্টেলা ব্রিটিশ গোলার আঘাতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

'তরুণের স্বপ্নে' সুভাষচন্দ্রের একদা আহ্বান ছিল—

'...আর যাও মাতৃজাতির সমীপে। যাঁরা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ যাঁরা হইয়াছেন —'অবলা'—তাঁদেরও জাগাও—বল—

'আপনার মান রাখিতে জননী,
আপনি কৃপাণ ধর।'[১৯]

স্বাধীনতার স্বপ্নসন্ধানী সুভাষ চেয়েছিলেন—'... নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।'[২০]

ভারতমাতার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার সংকল্পে ১৯২৯ সালের ১ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের এক ছাত্রসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে আহ্বান ছিল—

'... আমি চাই পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরণ করা হউক। আমি দেখতে চাই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর তৎসমস্তেরই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া এই ভারতমাতা, সমস্ত জগতের সমক্ষে ষড়ৈশ্বর্য শালিনী রূপে দণ্ডায়মান হউক। আমি চাই—এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক।..'[২১] জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে হরিপুরা কংগ্রেসের অভিভাষণে সুভাষচন্দ্রের সেই স্বপ্ন কার্যপ্রণালী আরও বড় মাপে ধরা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্তাল বিশ্বে এগারোটি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আজাদ হিন্দ সরকারের

প্রধান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বাস্তবপক্ষেই সকল হয়েছিলেন স্বাধীনতার সূর্যকে পরাধীন দেশবাসীর হৃদয়ে জাগাতে। শুধু ভারত নয়, যুদ্ধের পরে পরেই এশিয়া সহ কয়েকটি পরাধীন জাতি সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন থেকে মুক্তির আলোয় স্নাত হয়েছিল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে উল্লেখিত সেই স্মরণীয় অনন্য সংলাপ—'...জীবন তুচ্ছ; সকলেই পরিত্যাগ করিতে পারে...'

আর কি আছে? আর কি দিব?

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'।

এই ভক্তিই সুভাষ মননের এবং চরিত্রের অনন্যতা ও মৌলিকত্ব। দেশভক্তিই তাঁকে শক্তি সাধনার পথ দেখিয়েছিল। একদা কলকাতায় এক বিশাল যুব সমাবেশে তরুণ সভাপতি সুভাষচন্দ্র জাগ্রত বাংলার তরুণ দলকে আহ্বান করেছিলেন যা পরবর্তীকালে নেতাজির রণ আহ্বানে দেশপ্রেমে ভাসিয়ে দিয়েছিল মুক্তিকামী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের হৃদয়।

'...জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে—শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন—আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশ সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানবেন—

'ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে!'[২২]

দেশভাগকে অনিবার্য করে তোলা, তৎকালীন ভারতীয় নেতৃত্ব নেতাজির মতো এমন মন প্রাণ ঢেলে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি করে, অখণ্ড ভারতমাতার মুক্তি সাধনায় সর্বাত্মক ও সর্বস্ব অর্পণের ভাবনাও ভাবতে পারেন নি! একজনও!

চতুর্থ অধ্যায়

নেতাজি সুভাষের চোখে মা দুর্গা—মা কালী

স্বয়ং মা দুর্গার অধিষ্ঠান ছিল কটকের বসুবাড়ির প্রাঙ্গণে। আজও আছে যে দুর্গামন্দির। সামনে বিশাল নিমবৃক্ষ সহ আরও কিছু বনস্পতি। সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব জানকীনাথ বসু নিজহাতে বৃক্ষটি রোপণ করেছিলেন বলে কথিত। ছোট দুর্গামন্দিরটি ছোট প্রবেশপথ দিয়ে কয়েক সিঁড়ি নেমেই গর্ভগৃহ আদলে তৈরি বেদিতে মা দুর্গার প্রতিমার বদলে ছবি রাখা আছে। প্রতিমা থাকলে নিত্যপূজার ও ভোগ নিবেদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে একদা লেখককে জানিয়েছিলেন নন্দিনী দাস, যিনি আজও কটকের ওই ঐতিহাসিক গৃহ-মন্দির দেখভালের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।[১]

কৈশোরের অধ্যাত্মপিয়াসী সুভাষকে খুঁজে পাওয়া যায় কটকের এই বাসগৃহের আনাচে কানাচে। যেন মনে হয় ভোররাতে উঠে দ্বিতল ভবনের ছাদে গিয়ে ধ্যানরত বালক সুভাষ বসে আছে কিংবা দুর্গা মন্দিরের আধো অন্ধকারে মা দুর্গার সামনে কৈশোর কালের 'সুবি' দেশজননীর বন্ধনমুক্তির প্রার্থনায় বিশ্বজননীর কাছে প্রার্থনায় বসে আছেন। ধর্মপ্রাণ জানকীনাথ ও প্রভাবতী দেবীর সুভাষ সব দিক দিয়েই পরিবারের সবার চেয়ে আলাদা ছিলেন। চলনে, বসনে, আচরণে ভবিষ্যৎ ভাবনা চিন্তায় ব্যতিক্রমী সুভাষ বাবা-মার চিন্তার কারণ ও গর্বের কারণও হয়ে উঠেছিলেন। জগন্নাথধাম পুরী ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক কটক এর মাটিতে বহু সাধুসন্তের আগমন ঘটত যে সময়।[২] আজও ২৩ জানুয়ারি দোতলার সেই সুভাষচন্দ্রের জন্মকক্ষে সাধুসন্তরা হোম, পূজাপাঠ করেন বলে জানিয়ে ছিলেন নন্দিনী দেবী। কোনো কোনো অজানা-অচেনা সাধু নাকি এমনও বলে গেছেন যে পুরীর জগন্নাথ দর্শন অপূর্ণ থেকে যাবে যদি না নেতাজি সুভাষচন্দ্রের এ কক্ষের দর্শন লাভ না হয়।[৩] দাবিদার পরিবারের একদা চরম উপেক্ষা ও রাষ্ট্রীয় উদাসীনতায় হারিয়ে যেতে বসেছিল কটকের বসুবাড়ি। পরবর্তীকালে সংরক্ষণ প্রচেষ্টা হয়েছে।[৪] বিশ্বের বহুমানুষ নেতাজির জন্মস্থান দর্শনের জন্য ওড়িষ্যায় এসে থাকেন। যদিও মিথ্যাচারের প্রবেশ সেখানে সম্পূর্ণ রোধ করা যায়নি। দোতলার একটি ঘর মিথ্যা 'স্ত্রী-কন্যার' গল্পকে দর্শককুলের মনে ছড়িয়ে দিতে রাখা হয়েছে। 'ফ্যামিলি রুম' এর তকমা দেওয়া সেটি। সেখানে রাখা হয়েছে জনৈকা এমিলি শেঙ্কেল, তার কন্যা অ্যানিটা পাফ ও তার স্বামী মার্টিন পাফের বিশাল ছবি। এমন হীন প্রচেষ্টা জানকীনাথ বসুর কলকাতার একদা পিপুল পাতি রোড বা এলগিন রোডের (বর্তমানে লালা লাজপত রায় সরণী) নেতাজি ভবনের সংগ্রহশালাতে করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কার্শিয়াং এ নেতাজি সংগ্রহশালাতেও এমন বিকৃত তথ্য ও ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন নেতাজি ফাইলে জানা গেছে এমিলি শেঙ্কেল কিংবা অ্যানিটা আদৌ নেতাজির কেউ নন, মিথ্যা কুৎসা মাত্র। আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও সম্পত্তি হস্তগত করার লোভেই এই সব কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল দাবিদার পরিবারের একাংশ। এমনটাই অভিযোগ। শুধু তাই নয়, দাবিদার পরিবারের তরফে প্রকাশ করা তথাকথিত 'বিবাহের বাংলা' চিঠিটি আদৌ সুভাষের লেখা নয় এবং বানান সংশোধন করে একাধিক একই চিঠি তৈরি করা হয়েছিল তার পাথুরে প্রমাণ মিলেছে।[৫]

নেতাজির চরিত্র হননকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিষাক্ত ভাবনাকে অযথা গুরুত্ব দিয়ে এই লেখার মাধুর্য নষ্ট করতে চাই না। ফিরে যাই সুভাষচন্দ্রের গড়ে ওঠার দিনগুলিতে। বৈষ্ণব ও শাক্তসাধনার প্রভাব, অপূর্ব ভাব,

কিশোর সুভাষের হৃদয়ে গৈরিক চেতনায় রাঙিয়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রভাব। মা'কে লেখা চিঠি গুলিতে উঠে এসেছে উদার ভারত, আধ্যাত্মিক ভারত এর ভাবনা সহজ সরল কথায়। জানকীনাথ বসুর পৈতৃক নিবাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোদালিয়াতে। পূর্বপুরুষের ভিটেতে বিশাল দুর্গা দালানের[৬] পাশের ছোট কক্ষে প্রভাবতীদেবীর নারায়ণ আজও পূজিত হন। দুর্গা পূজার সময় মা দুর্গার নানা উপাচার, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ আর জগৎজননীর প্রতি ভক্তির স্বরূপ মানসচক্ষে কিশোর সুভাষ তাঁর মাতৃদেবীকে লেখা পত্রে অপূর্ব ভগবদভক্তির আলোকে নিবেদন করেছিলেন।

একান্ত পারিবারিক চিঠিগুলিতে সুভাষচন্দ্র ঈশ্বরের কোনো মাঙ্গলিক চিহ্ন কিংবা সরাসরি দুর্গামাতাসহায় লিখতেন। পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র জনসংযোগের কারণে নয়, হৃদয়ের টানেও নানা সংগঠনে দুর্গাপূজার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিলেন। জেলের ভিতরে দুর্গাপূজার অধিকারের দাবিতে আন্দোলন পর্যন্ত করেছেন। উত্তরকালে মা কালী - মা দুর্গার মহাসাধক সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায় ভিন্ন পরিস্থিতিতে, অজ্ঞাতবাসের আড়ালে। সুভাষচন্দ্রের নানা বক্তৃতায় মা দুর্গার ভাব, ভারতমাতার রূপের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন —'...আমরাই তো নূতন ভারতের স্রষ্টা। অতএব এসো আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি। মা আমাদের আবার রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এখনকার কাঙ্গালিনী মাকে ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্না দশভূজারূপী দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ? আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া সর্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই।'[৭]

কলকাতা পুরসভায় দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন নানা ক্ষেত্রে। ১৯২৪ সালে গুরুশিষ্য মিলেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম ও দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি। দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণ ও সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ কারাবাস ওই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর বড় আঘাত ছিল। বার্মার মান্দালয় জেলে বসে একাধিক পত্র লিখেছিলেন ওই প্রতিষ্ঠান দুটির তরুণ পরিচালকদেরকে। অনাথ ছাত্ররা কেমনভাবে তাঁদের নিয়মানুবর্তিতা ও চরিত্র গড়ে তুলতে হবে এ সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। এমন কথাও লিখেছিলেন যে তিনি কংগ্রেস রাজনীতি ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু তাঁর পক্ষে কোনোমতেই দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কারণ 'দরিদ্র নারায়ণে'র সেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কোথাও পাবেন না।[৮]

দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্মী শ্রীমান হরিচরণ বাগচীকে মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র ঋষি তুল্য প্রজ্ঞায় জীবনের অনেক গূঢ় সত্যকে সহজভাবে তুলে এনেছেন। উঠে এসেছে শাক্তসাধনার দেবী মা-কালী মা-দুর্গার ভাবনা সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে কীভাবে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে তার পথনির্দেশ। 'তোমার মনের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কিনা জানি না —শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ও ধ্যানধারণার প্রয়োজন'।[৯] এরপর তিনি ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে বলেছেন যে বাইরের সংযম স্থায়ী হয় না যদি না ভিতরের সংযম থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম করলে শরীরের যেমন উন্নতি হয় তেমনি নিয়মিত সাধনা করলে রিপুর ধ্বস হয়ে থাকে। তিনি ওই পত্রে লিখেছেন—'সাধনার উদ্দেশ্য দুটি—(১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালোবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা। কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃভাব দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রীমূর্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রী লোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে। সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য

মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা স্ত্রী-মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে 'মা' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।'[১০]

উল্লেখ্য, 'গোড়ার কথা' শীর্ষক নিবন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁর অসাধারণ ত্যাগব্রতীর জীবনদর্শনকে খুঁজে পেয়েছিলেন উমানাথ, সর্বত্যাগী শংকর শিবের আদর্শের মধ্যে—

'নীলকণ্ঠের আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি; যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে। আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারাজীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবনদান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা এরূপ সাধক হবে তাদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানুরাগ ও আনন্দবোধ।'[১১]

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম এর কর্মধারা প্রসঙ্গে কারাগার থেকে লেখা পত্রে লিখেছেন মানুষ ভক্তি ও প্রেমের প্রভাবে কীভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে উঠতে পারে—

'ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোনো ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালোবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভালোবাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালোবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধা যে-কোন বস্তু-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করা দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজেকে 'দুর্বল পাপী' যেভাবে, সে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে, সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'[১২]

এরপরই সুভাষচন্দ্র চরিত্র গঠন ও মানসিক উন্নতির জন্য শক্তিসাধনার কথা সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন—'ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপ বিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত হইয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চইন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগগুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিস দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ রিপু বলি'[১৩]

নেতাজির সমস্ত জীবনসাধনায় উচ্চ আধ্যাত্মিক তন্ময়তা ও নিবেদন প্রচ্ছন্নভাবে থেকে তাঁর রাজনৈতিক সংঘর্ষময় জীবনসংগ্রামে। ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন কারাগারে থাকাকালে অধ্যাত্মচর্চার বইপত্র পড়াশুনো করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পুরোহিত দর্পণ' বইটির উপর স্বহস্তে সুভাষচন্দ্রের বাংলায় মন্তব্য ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।[১৪]

বিশেষ করে মন্ত্রবিচার, রাশিচক্র, কুলাকুলচক্র, নক্ষত্রচক্র, অ-ক-থ-হ-চক্র, ঋনী-ধনী চক্র প্রভৃতি বিষয়ে[১৫] তাঁর পড়াশুনো লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে অজ্ঞাতবাসকালে ভগবানজির কক্ষে বহু ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া গেছে সেখানেও সুভাষচন্দ্রের সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় নানা মন্তব্য, বক্তব্য পাওয়া যায়। বহু শ্লোক, এমনকী বীজমন্ত্রসহ শিবের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র লাল কালিতে তিনি লিখে দিয়েছিলেন। সেটিও সংরক্ষিত হয়েছে

অযোধ্যার রামকথা সংগ্রহশালার ভগবানজি শীর্ষক গ্যালারিতে।[১৬] সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব কটক থেকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন কারারুদ্ধ সুভাষকে।[১৭]

কটক
১৩-১০-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার গতমাসের ৫ এবং ২৫ তারিখের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। তোমার কুশল সংবাদ পেয়ে সুখী হলাম। আমার এবং তোমার মা-র বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো। কোদালিয়ায় দুর্গাপূজা যথারীতি এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ওখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুলির কাশীনাথ চ্যাটার্জি, এম.বি-কে চিকিৎসালয়ের ভার দেওয়া হয়েছে। লোকজনের মধ্যে খুব আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। আমাদের কটকের বাড়িতে দুর্গাপূজা চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুরেশ এই পূজায় অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে। আমাদের কাছে এটি একটি বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ...মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজা করতে পেরেছ জেনে খুশি হলাম। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।...

ইতি,
আশীর্বাদক
জানকীনাথ বসু

উল্লেখ্য, সুভাষের নেতৃত্বে মান্দালয় জেলে প্রথম দুর্গাপূজা এবং দেবী প্রতিমা সর্বত্তম হয়েছিল এই মর্মে সংবাদপত্রে খবর হয়েছিল সে সময়।[১৮]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতমাতা' কিংবা বিপ্লবী অরবিন্দের 'ভবানীমন্দির' মাতৃসাধনায় বাংলার বিপ্লবীকুলকে অনেকটাই অনুপ্রাণিত করেছিল। দশভুজা মা দুর্গাকে বোধনের মাধ্যমে শক্তি সাধনার ধারাকে ব্রিটিশ বিতাড়নের প্রেরণদায়ক শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছে বিপ্লবী বাংলা। উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালে পুরুলিয়া ইউনিয়ন ক্লাবে মহাষ্টমীর দিন, শ্রমিক নেতা সুভাষচন্দ্র প্রাণ উজার করে মুক্তি আন্দোলন নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। [১৮(ক)]

শতবর্ষ অতিক্রান্ত বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো, উত্তর কলকাতার এমনই একটি বাঙালির সাবেক বারোয়ারি দুর্গাপুজো ১৯১৯ সাল থেকে শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র কলকাতার মেয়র থাকাকালেই ১৯৩০-এ এই পূজা বর্তমান জায়গা উঠে আসে পাকাপাকিভাবে। তিনি যখন এই পুজোর সভাপতি ছিলেন তখন কুটির শিল্পীদের সই করা শংসাপত্র দিতেন। মহা অষ্টমীর দিন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে উৎসবের সংযোগ ঘটাতে লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ও ব্যায়াম প্রদর্শনীর মাধ্যমে বীরাষ্টমী ব্রত পালন করা হত।[১৯]

সর্বসাধারণের সঙ্গে মাটিতে বসে কলাপাতায় দুর্গাপূজার ভোগপ্রসাদ গ্রহণের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়ামসমিতির কালীপুজোর সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে ছিলেন। শুধু জনসংযোগ বা জন জাগরণের লক্ষ্যেই নয়, হৃদয়ের টানেই সুভাষচন্দ্র নানা ক্লাব, সমিতির পূজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে মধ্যকলকাতার মলঙ্গা লেন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এখানকার প্রতিমার রূপ অকালবোধন এ দেবী দুর্গা। বিপ্লবীকুল এখানে যুক্ত থাকতেন। যারা মাতৃ প্রতিমার পায়ে নত হয়ে স্বাধীন ভারত গড়ার শপথ নিতেন। সুভাষচন্দ্র বসু এই পুজোর উদ্বোধন করেছিলেন।[২০]

উত্তর কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজায় তৎকালীন বহু দেশ নেতা জড়িয়েছিলেন। বিখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক ড. চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এই পূজার পূজারি ছিলেন। খাদি বস্ত্রের দেবীকে 'স্বদেশি দুর্গা' বলা হত। সুভাষচন্দ্র যুক্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক গৃহের কাছেই এই পুজোতে। দুর্গাপুজোর অন্নকূটের সময় এক আসনে সবার সঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। পালন হত বীরাষ্টমীও।[২১] মধ্য কলকাতার নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে স্বদেশি যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুক্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র প্রতিবছর এই বাড়ির পুজো দেখতে আসতেন ও প্রসাদ গ্রহণ করতেন। অবশ্য জেলে কিংবা দেশের বাইরে থাকলে তা সম্ভব হত না। অবশ্য কলকাতার জেলের ভিতরে কিংবা মান্দালয় জেলে কারাপ্রাঙ্গণে তাঁর নেতৃত্বেই সহ-বন্দিদের সহযোগিতায় দেবী পুজো সম্ভব হয়েছে।

উত্তর কলকাতার কুমারটুলি পাড়া প্রতিমা নির্মাণের খ্যাতি জগৎ জোড়া আজও। সেদিন ছিল দুর্গাপঞ্চমী। কুমারটুলি সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে হঠাৎ হঠাৎ আগুন লাগল। একচালার দুর্গা প্রতিমা আগুনে পুড়ে গেল। সে সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। সাল ১৯৩৮। পুজো কমিটির সভাপতিও সেবার তিনিই। দ্রুত নতুন প্রতিমা গড়ে দেবার আর্জি নিয়ে শিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে ছুটে গেলেন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। একদিনে সম্পূর্ণ প্রতিমা নির্মাণ সম্ভব নয় বুঝে শিল্পী গোপেশ্বর দুর্গা প্রতিমা নিজে নির্মাণ করলেন আর কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তৈরি করলেন অন্য শিল্পীরা। সেই সময় দেবী দুর্গার গায়ে উঠেছিল শিবানীরূপের বাঘছাল। পাঁচ চালার ঠাকুর রাতারাতি নির্মাণ করে ষষ্ঠীর দিন থেকে আবার পুজো শুরু হল।[২২] গোয়াবাগান পূজা প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণটি উল্লেখযোগ্য—

দেবী দুর্গার আরাধনার তাৎপর্য

দেবী দুর্গার আরাধনার অর্থ বিশ্বজননীর আরাধনা। দেবী দুর্গা ও মাতৃভূমির মধ্যে বহু পরিমাণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আত্মীয়তা বিদ্যমান। কাজেই ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে দেবী দুর্গার উপাসনা আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পৃথিবীতে বর্তমান প্রতিটি জাতির জাতীয় পতাকা আছে। তেমনই আছে ভারতীয়দেরও। জাতীয় পতাকা একটি জাতির আদর্শের প্রতীক এবং ইহার মধ্যে একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্মতম রূপ আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য ভারতীয়রা এখনো নিজেদের স্বাধীন বলিয়া দাবি করিতে পারেন না। কিন্তু আমরা আর বেশিদিন পরাধীন থাকিতে চাই না।

আমরা চাই স্বাধীনতা, প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতা। আমরা বিশ্বাস করি যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব। বর্তমানে পরাধীন হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির মতো আমাদের জাতীয় পতাকা আছে। আমাদের জাতীয় পতাকা যথার্থতম অর্থে সমগ্র ভারতীয় জাতির সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার প্রতীক। আমরা যদি সত্যই স্বাধীনতা চাই এবং স্বাধীনতা অর্জিত হইলে তাহা প্রকৃতই রক্ষা করিতে চাই, তাহা হইলে কিভাবে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় তাহা আমাদের শিখিতে হইবে। জাতীয় পতাকার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় যে-কোনো স্বার্থত্যাগের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আমাদের জানা উচিত যে স্বরাজ অর্জন করিলেই মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না। পক্ষান্তরে সেইখানেই কর্তব্য আরম্ভ হইবে। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইবে তাহা কি ভাবে রক্ষা করা যায় তাহা নিশ্চিত করা।

দেবী দুর্গা ও ধরিত্রী মাতার মধ্যে কোনো বিভেদ নাই। দেবী দুর্গা, ধরিত্রী মাতারই বহিঃপ্রকাশ। দেবী দুর্গা, শক্তি ও সামর্থ্যের স্থায়ী উৎস। সুতরাং আমরা মরণশীল ব্যক্তিরা যখন তাঁহার উপাসনা করি তখন আমরা নিজেদের মধ্যেকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে চাই। দেবী দুর্গার উপাসনাকে নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলিয়া

মনে করিতে হইবে। তিনি আপনাদের হৃদয়ের অন্তস্তলের যে বস্তুর প্রতীক তাহারই আবাহন আপনাদের করিতে হইবে।

দেবী দুর্গার উপাসকগণকে পুরাপুরি স্বদেশী হইতে হইবে। স্বদেশীয় সেবা করার অর্থই দেশমাতৃকার সেবা করা।২২(ক)

সুভাষচন্দ্রের এই একসাথে দুর্গাপুজো করার অভিজ্ঞতা ছাত্র বয়স থেকেই। ১৯১৬ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন পর্বের পর তিনি কলেজ বহিষ্কৃত ছাত্র হিসাবে কটকে। নানা সমাজ সেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বন্ধুরা মিলে সে বছর ওড়িয়াবাজারে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। বর্তমানে কটক দুর্গাবাড়ি স্মৃতি কমিটি নেতাজির মূর্তি স্থাপন করেছে। পুজোর দিন বিশাল মাপের নেতাজির ছবি টাঙানো হয়। অন্যদিকে বক্সি বাজার বাধেসাহী পুজো কমিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি নেতাজির বাবা জানকীনাথ বসু দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন এবং সে পুজো আজও রীতিনীতি মেনে চলে আসছে।[২৩]

নানাজনের স্মৃতিকথায় জানা যায়, সুভাষচন্দ্র যখন আলিপুর জেলে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন সহ বন্দিদের নিয়ে তখন কলকাতার ফুল ব্যবসায়ীরা, ফল ব্যবসায়ীরা উজার করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আলিপুর জেল প্রাঙ্গণে। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের বিপ্লবী ও কারাগারের সহবন্দী রসময় শূর তাঁর 'মাতৃসাধক সুভাষচন্দ্র' নিবন্ধে লিখেছেন—

'প্রেসিডেন্সী জেলে তিনি যখন অবরুদ্ধ তখন শারদীয়া পূজা সমাগত। সুভাষচন্দ্র সংকল্প করলেন তিনি দুর্গাপূজা করবেন জেলের অভ্যন্তরে। সুভাষের মাতৃপূজার অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন সরকার। কারাগারের প্রাচীর অতিক্রম করে খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। মায়ের পূজার উপকরণ নিমেষে এসে গেল সহর কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে। ফুল বিক্রেতা ফুল দেবেন। অন্যান্য উপকরণও আসবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। প্রতিমা আসবে কুমারটুলি থেকে।

মায়ের অশেষ কৃপা—সুভাষচন্দ্রের মাতৃপূজা দেখার সৌভাগ্য হল আমার। কিছুদিন আগে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হিজলী জেল থেকে আমাকে স্থানান্তরিত করেছে প্রেসিডেন্সী জেলে চিকিৎসার প্রয়োজনে। জেলে সবরকম বন্দীরা পূজায় যোগদান করতে পারবে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে এ ব্যবস্থা করলেন সুভাষচন্দ্র। মহাসমারোহে পূজার আয়োজন হল। ষষ্ঠীর দিন ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল এল। রাশি রাশি ফল। পূজার বিভিন্ন উপকরণও এসে গেল। গোনাগুনতি নেই। প্রয়োজনের হিসাব নেই। একান্ত নিষ্ঠায় বিধিমতে পূজা শুরু হল পুরোহিত তন্ত্রধারককে নিয়ে। পূজার কয়েকটা দিন পূজায় যোগদান করার সুযোগ পেলাম আমরা। সুভাষচন্দ্রকে তখন দেখেছি মাতৃপূজায় ভক্ত সন্তান। পরণে তাঁর গরদ বস্ত্র সদ্যস্নাত-শুচি-শান্ত-তন্ময় মূর্তি; ভক্তিশ্রদ্ধা উপচে পড়ছে চোখে মুখে। কখনও পূজার তদারক করছেন। কখনও সমাহিত চিত্তে মাকে দেখছেন। তাঁর এরূপ আমার কাছে নূতন। অপরূপ'।[২৩(ক)]

তিনি আরো লেখেন—'নিঃশেষে যিনি সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন মায়ের চরণে, অভয়া মা যে আজও ধরে রেখেছেন তাঁকে। তাঁর দৈহিক মৃত্যুর কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই অদ্যবধি। জয় মাতৃ সাধকের'।[২৩(খ)] বার্মার মান্দালয়ে দেবী প্রতিমা গড়া হয়েছিল জেল প্রাঙ্গণেই। এক্ষেত্রেও সরকার আর্থিকভাবে সদয় ছিল না। বন্দিরা নিজেদের পরিশ্রমের অর্থেই পুজোর আয়োজন করে। ছয়দিন ধরে দেবীর প্রসাদ জেলের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার আঁধার হলে তাদের গারদে ফেরত পাঠান হত। তার আগে পর্যন্ত নানা স্বদেশি গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন প্রমুখের গান খালি গলায় নিজেদের মতো তাঁরা গাইতেন। পরবর্তী সময়ে সুভাষচন্দ্র নবদ্বীপের বৈষ্ণব আশ্রম কিংবা নানা রামকৃষ্ণ

মিশনে যেতেন। এমনকী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুযায়ী সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়ংকর সময়ে সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে মধ্যরাতে সকলের অগোচরে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, মা ভবতারিণীর সামনে বসে একান্তে ধ্যানমগ্ন থাকতেন বলে জানা যায়। মা সারদার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তিনি একটি 'চণ্ডী' উপহার পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।[২৪] আশ্রমের অনাথ বালক বালিকাদের আবাস গৃহ, নির্মাণ, সঠিক রেশনের ব্যবস্থা ছাড়াও নেতাজি ১০০ হাজার ডলারের আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।[২৪(ক)] পরপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পট পরিবর্তন ঘটে। ইতিহাসের চাকা দ্রুত এগিয়ে চলে। নেতাজির জীবনেও ঘটে অজ্ঞাতবাসের অভাবনীয় নানা অভিজ্ঞতা আর নতুন অধ্যায়। নানা কমিটি-কমিশনের সিদ্ধান্ত, ব্যাখা-অপব্যাখা যাই ঘটুক, আজও আগামীর ইতিহাস সাক্ষী দেশভাগের পর সুভাষচন্দ্র বসু দশনামী সন্ন্যাসী পরিচয়ে উত্তরবঙ্গের শৌলমারী আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, যাঁরা সবাই পরিচিত ছিলেন সুভাষচন্দ্রের পূর্ব জীবনের সঙ্গে এবং দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তী দেবী ও সেজদাদা সুরেশচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে আসতে চেয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে তৎকালীন নেতৃত্বের মিথ্যাচার, অপপ্রচার তাঁকে সে সময় প্রকট হতে দেয়নি। সাজান সাধু আরেক সারদানন্দজিকে রেখেই তিনি অন্তর্হিত হন এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ন্যাসী (গুমনামী বাবা) হিসাবেই ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অতি বিশ্বস্ত কিছু পার্ষদদের পুনরায় নিখোঁজ হবার ইঙ্গিত দিয়ে 'মৃত্যু' গল্পের আড়ালে হারিয়ে যান। নেতাজি অন্তর্ধান তদন্তে নিয়োজিত মুখার্জী কমিশন ফৈজাবাদে রামভবন পরিদর্শন করেন। আদালতের নির্দেশে গুমনামী বাবা, ভক্তজনের ভগবানজি, সৎ গুরুদের এর কক্ষে প্রাপ্ত সামগ্রী ফৈজাবাদের ট্রেজারিতে যা সংরক্ষিত হয়েছিল নেতাজির ভাইঝি ললিতা বসু প্রমুখের আবেদন ক্রমে তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং ইনভেনট্রি তালিকা প্রস্তুত করেন। আড়াই হাজার চিঠিপত্র, বই নেতাজি কমিশনে একজিবিট হিসাবে আনা হয়। বহুসাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় ভগবানজির প্রত্যক্ষদর্শীদের। সরকারি ডি এন এ টেস্টের অসম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রদানের কারণে বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায়, যিনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর রিপোর্টে ভগবানজিই নেতাজি এমনকথা লিখতে না পারলেও একটি ভিডিও সাক্ষাৎ করে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন যে ওই সাধুই নেতাজি তা তিনি একশো শতাংশ বলে মনে করেন।[২৫]

আদালতের নির্দেশে উত্তরপ্রদেশে ভগবানজির পরিচয় সংক্রান্ত সহায় কমিশন গঠন করা হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য, নথিকে গুরুত্ব না দিয়ে দায়সারাভাবে কমিশন জানায় ভগবানজি নেতাজি নন, নেতাজির পরিচিত কোনো ব্যক্তি হতে পারেন। হাস্যকর এই রিপোর্ট উত্তর প্রদেশ সরকারকে জমা দেবার আগে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনের প্রধান জানান কমিশনের অধিকাংশ ডিপোনেন্ট ভগবানজিই নেতাজি ছিলেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, লেখক মুখার্জী কমিশন ও সহায় কমিশনের ডিপোনেন্ট ছিলেন। আদালতের নির্দেশেই অযোধ্যায় নবনির্মিত রামকথা সংগ্রহশালায় ভগবানজি গ্যালারিতে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হয়েছে মহাসাধকের কমণ্ডুল, একাধিক চশমা, রুদ্রাক্ষের মালা প্রভৃতি।

গুমনামী নেতাজির অজস্র লেখা পত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজনীতি দর্শন এর পাশাপাশি রামকৃষ্ণ কথামৃত সহ বহু ধর্মপুস্তক। মা ভবতারিণীর বাঁধান ছবি, নেতাজির মা, বাবা'র সাথে সুভাষচন্দ্রের একাধিক ছবি প্রভৃতি। ব্যক্তিগত খাতায় মিলেছে হিন্দি, সংস্কৃত ও বাংলায় লেখা অজস্র মন্ত্র, বীজ মন্ত্র, স্তব, ধ্যান ইত্যাদি। লালকালিতে লেখা বীজমন্ত্রসহ শিবের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ভগবানজি লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উত্তর প্রদেশ সরকার রহস্যময় কারণে অযোধ্যার ওই রামকথা সংগ্রহশালা আজও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেননি।

ফৈজাবাদে চিকিৎসক ডা. প্রিয়ব্রত ব্যানার্জি (সাক্ষী নং ৩৭) সাক্ষ্যদানকালে জানান, ওঁর চিকিৎসক পিতৃদেব গুমনামী বাবা বেশি নেতাজিকে চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি সাক্ষ্যদানকালে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানান, যা অজ্ঞাতপরিচয় মহাসন্ন্যাসীর পূর্বজীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ডা. ব্যানার্জির শাশুড়ি মাতা (শ্রীমতী বীথি চট্টোপাধ্যায়, সাক্ষী নং ৭১) ভালো গান গাইতেন। দর্শনকালে সাধুজি জিজ্ঞাসা করেন, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি জানা আছে কি না। রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি শোনার সময় সাধুজির চোখ জলে ভরে যায় এবং তিনি জানান যে তাঁদের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। ১৯৭৭-৭৮ সাল নাগাদ ব্রহ্মকুণ্ড থেকে সাধুজি ছোটো দেওকালী বা লখনউ মন্দিরে চলে আসেন। ডা. ব্যানার্জি সাক্ষ্যে জানিয়েছেন যে, তাঁর মা-র ১৯৭৬ সাল নাগাদ পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতা আগমন ঠিক হয়। সাধুজি ওঁর মা-কে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, যা জেনেছেন তা প্রকাশ না করেন, কারণ তাতে বাংলায় আগুন জ্বলতে পারে। ডা. ব্যানার্জি এরপর একটি মর্মস্পর্শী কথা জানিয়েছেন কমিশনকে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মাঝেমধ্যেই বাবাজির (সাধুজি) কাছে যাতায়াত শুরু করেন। একদিন তিনি একটি বিদেশে তৈরি রেডিয়ো সেট মেরামত করে দেবার জন্য তাঁদেরকে দেন। তিন-চার দিন পর যখন তাঁরা সাধুজির কাছে যান এবং বলেন, নির্দিষ্ট তারিখে তাঁরা যেতে পারেননি এবং শীঘ্রই যাবেন, তখন বাবাজি নীরব রইলেন। ডা. ব্যানার্জির স্ত্রী বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি রাগ করেছেন? উত্তরে বাবাজি জানান, রাগ করব কেন? যার বাড়ি থাকতে বাড়ি নেই, যার জন থাকতে জন নেই, আমি অভিমান করতে পারি? তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কেন এমন কথা বলছেন। উত্তরে বাবাজি জানান, 'My name has been struck off from the resister of the world. I am a registered Sanyasi, forced by law.' সওয়াল-জবাবে ডা. ব্যানার্জি জানিয়েছেন যে সাধুজির সঙ্গে আধ্যাত্মিক, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরাণিক প্রভৃতি বিষয় আলোচনায় উঠে আসত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশপ্রেম, জাপানি ও জার্মান সৈনিকদের অবস্থার কথা তাঁরা শুনতেন। একদিন আলোচনাক্রমে গুমনামী বাবা বলেছিলেন, 'কতদিন বিনা খেয়ে ছিলাম, কতদিন জলে ডুবে ছিলাম আর কতদিন জল খেয়ে ছিলাম, খাবার পাইনি।' ভৌগোলিক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, বহু আগে বার্মা ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর পৌরাণিক প্রসঙ্গে তিনি রাম-সীতা, দেবী কালিকা, মা দুর্গার কথা বলতেন। বাবাজি একনিষ্ঠ মা কালীর ভক্ত ছিলেন।

নেতাজির পরবর্তী সন্ন্যাসজীবনের অজস্র মণিমাণিক্য তুল্য লেখা পত্র আগামী দিনে সত্যের আলোকে নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হবে। ভগবানজির "সংবাদমাধ্যমের প্রদত্ত নাম গুমনামীবাবা" একান্ত এক ভক্ত, শিক্ষক শিবপ্রসাদ নাগ, যাঁকে অজ্ঞাতনামা ওই গুমনামী সন্ন্যাসী স্নেহের সঙ্গে 'প্রসাদ' বলে সম্বোধন করতেন। নেতাজি সুভাষকে উপলক্ষ করে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে পাঠিয়েছেন গুমনামী নেতাজির কাছে। ভগবানজি এই সময় তাঁর পূর্বজীবনের বহু কথাই ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যা একান্তই সুভাষ জীবনের কথা। হিন্দি-বাংলা-ইংরাজি মিশিয়ে রহস্যময় কিছুটা হেঁয়ালিপূর্ণ এক পত্র যা কালের নিয়মে অযত্নে অনেক অংশ ছিঁড়ে গিয়েছিল যা ছিল স্বয়ং ভগবানজির পূর্বজীবনের সুভাষচন্দ্রের লেখা। এটির বাংলা অনুবাদ মুখার্জী কমিশনে করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করছি মহাসাধক সুভাষচন্দ্রের জীবনে মা দুর্গা, জগৎজননী মা কালীর সক্রিয় অনুধ্যান সংযোগ পর্বের ইঙ্গিত দিতে।

"পরম কল্যাণবর স্নেহভাজনেষু শ্রীমান প্রসাদ, শ্রী শ্রী মা-জননী কালী তোমার ত্রিবিধ কল্যাণ করুন। তোমার চিঠি পেলুম। তোমার স্নেহের কন্যার বিবাহ দিচ্ছ জানলুম। শ্রী শ্রী মা ৺কালী সর্বময়ী, সর্ব নিয়ন্ত্রিণী দয়াময়ী। তাঁরই শ্রীচরণ কষে পাকড়ে ধরে থেকো, ব্যাস, ব্যাস।

প্রথমথেকেই, তোমাকে বলা আছে যে : আমার Horizon-এর বাইরে, তোমাদের সঙ্গে স্নেহ প্রেমের যোগস্থাপন করা, ছেলেখেলাও নয়, সাধারণ সুসাধ্যও নয়-ই। অনুরূপ সুবিধের জন্যে, কখন এবং কোথায়,

—এর পূর্ব-নিশ্চিত কিছুই নেই। শ্রীমান সুকৃত তোমাকে কি কি বলেছেন তা সব তো আমি জানি না? তুমিও বলোনি কক্ষনো (অন্যান্য তিন জনের কোন কথাই ধর্তব্য নয়)। তোমাকে প্রথম থেকেই নির্দেশ দেয়া আছে : কোনো চিঠি বা জিনিষ পাঠাতে হলে প্রথমে ডা. শ্রীযুক্ত পবিত্র রায় অথবা শ্রীমান সুকৃতের কাছ থেকে জেনে নিও, চিঠি বা জিনিস পেতে পারার জায়গাতে আমি আছি কিনা অথবা—মৃতভূতের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা।' (অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করবে না, ভুলেও)। মৃত ভূত কখন কোথায়—কোন দেশে—স্থলের জলের অথবা অন্তরীক্ষের কোনো দেশে—সমাজে থাকে, তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই। যা যা নির্দেশ তোমাকে দিই, তা সবই তৎকালই সম্পন্ন কোরো। ইহাই ডিসিপ্লিন। ফেলে রেখোনা, বা 'হোচ্ছে—হবে—দেখা যাবে' ভাব কোরো না : এ-সবের সঙ্গে আমি পরিচিত নই। কোন তেপান্তরের যুগে 'যে-একজনকে' জানতে-শুনতে, তাঁকে ভুলে যাও, সে লোকটাকে—সাধারণভাবে ইন্ডিয়া এবং অত্যন্ত বিশেষ নিরঙ্কুশ ভাবে 'তারই আত্মীয় বংশগনীয়-পরিজন এবং সম্পূর্ণ বাংলাদেশ' মেরে ফেলেছে। সে মরে ভূ-উত হয়ে গেছে। সুতরাং :

যাকে কোন দূর শতাব্দীর অজ্ঞাত দিবসে
জানতে শুনতে,—তার সুতো ধোরে
মৃতভূতকে মাপবার—বুঝবার—জানবার—
থই নেবার চেষ্টা ক'রোনা, সম্পূর্ণ
ব্যর্থ হবে, ভুল বুঝবে।

গত জীবনে, 'অন্যেরা যে সব নজারা দেখিয়েছিল, সে শিক্ষা ভুলবার নয়। ফলে : মরণোত্তর মৃতভূত। কিন্তু অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত তোমরা এবং তোমাদের গভর্ণমেন্ট : যে ব্যক্তি ''সর্ব স্বীকার্য রূপে প্রমাণিত ভাবে মরে গেছেই—সেই নিশ্চিত মৃতকে :

মরেছো কিনা—মরেছো জানিবার তরে
'লোডেড-ডাইস-কমিশন' বসাও বারে-বারে?
....কেনো?
সবের মধ্যেও ভূতের ভয়? ধ্যেৎ!

তোমরা সব্বাই হচ্চ এর কারণ :
Populus vuit decipt
you all people wish to be fooled.

যাক এ সব বাজে কথা। শুধু সত্য এই যে,—পূর্বের সে,—আর এখন নেই। ভেতরে—বাইরে পূর্ণতম রূপান্তরিত মৃত ভূত।

Inscrutable, unfathomable,
beyond every one's power, through
right or wrong!

আচার্য, মৃতভূতের : তাঁর তিনটি অভেদ্য রহস্য ঘেরায় ঘিরে রেখেছেন সর্বক্ষণ, এবং সাতটি অভেদ্য প্রাচীর, তারও চারিদিকে। মহানতম কঠোর তাপস তিনি, সমস্ত সৃষ্টির কূট কৌশল গতির নির্ণয়—চালন এবং

নিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র তাঁরই জিম্মেদারিতে রেখেছেন,—মৃত ভূতের ৺মা জননী, শিষ্যকে রক্ষা করে চলেছেন—আচার্য, তাঁর অভেদ্য রহস্যচলের আড়ালে, ঠিক উপযুক্ত ক্ষণে রহস্যাবরণ সরিয়ে প্রকাশে ঠেলে দেবার জন্যে সুপ্রিম স্ট্যাটেজিস্ট তিনিই। গ্রহরাজ শ্রী সূর্যেরও ক্ষমতা নেই তাঁর ছককে নড়চড় করবার। (ছেঁড়া)............

পিতা, মৃতভূতের : সমস্ত—সম্পূর্ণ—তীব্রতম রণসংঘাত সম্ভারে মারণ যজ্ঞ সুপ্রিম-ওঁ—দ্যা সুপ্রিমেস্ট। পুত্রকে তাই, নিজে মরণের প্রতীক হয়েও, নিজের কোলের—বুকের মধ্যে গুঁজে রাখেন, রণ এবং মৃত্যু যেন ছুঁয়ে-না-ফেলতে পারে। আগুনে-রণে-মৃত্যুর ভেতরে তিনি যাতায়াত করেন স্বাধিকারে, স্বধর্মে : কোলের মধ্যে চেপে ধ'রে রাখা পুত্রকে কে ছোঁবে?

সর্বোপরি : সমস্ত পরমেশ্বরদের—এবং পরমেশ্বরীদের সৃষ্টিকারিণী, পদাধিকারে নিয়োগ এবং বরখাস্তকারিণী :—মা জননী মৃতভূতের স্বয়ং মা-জননী, আদ্যা, মহাকালী। সর্বক্ষণ ওতঃপ্রোতঃ—প্রত্যক্ষ আমার আমার আমারই সব হারিয়ে পেয়ে যাওয়া গর্ভধারিণী প্রসবিনী—আমার মা জননী।—যিনি তাঁর নিজের হোরাইঝনের (দিগচক্রবালের) শাশ্বতবাসী পুত্র কোরে, তাঁরই Horizon -এর কাজে লাগিয়েছেন। পরম সুপ্রিমেস্ট—সুপ্রিমো তিনিই—আমার মা৺ জননী, আমি তাঁর আদেশ নির্দেশ পালক সেবক বরকন্দাজ—সিপাহি মাত্র। ৺কালীর ছেলেই তো ভূত। যতক্ষণ কেও জ্যান্ত থাকবে, ততক্ষণ কেও ৺কালীর ছেলে হতেই-ই পারে না। মরে ভূত হও। ....ওমনি পট করে ৺কালীর সঙ্গে নাচতে পাবে। ভাগ্য যদি খুলে যায়, তবে তোমাকেই 'নিজের আসন' ও কোরে নিতে পারেন। কিন্তু, এ কি? কোথা থেকে কোথায় এসে গেছি। (তুমি, বোধহয়, অবজ্ঞা করে, সুপিরিয়র নলেজে পাগলা ভাবচো?)

* * *

এ সমস্তই দেখা যায় এই স্থূল মনুষ্য শরীর নিয়েই। অবশ্যই আমার সমস্ত কিছুই দেখা—জানা—চাকা ....সাধ আমার মা জননীই নিজেই পূর্ণরূপে পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমি যে মরে ভূত হয়ে—মৃত ভূত। বঙ্গ ধূলিকণা আমার নাম। মানুষ আমি নই।

* * *

আদরের প্রসাদ। একটি (উপরোক্ত বিষয় পরিষ্কার করার জন্য) নমুনা উদাহরণ দিচ্ছি, মৃতভূতের জীবনের :—একটি সীমাহীন স্থানে, কোনো খাস উদ্দেশ্য না নিয়েই আনমনা হয়ে একলা বসেছিল মৃতভূত। প্রথমে আলবেলী ভাবে সটান—লম্বা হয়ে। আ-রা—ম-ম সে পড়ে রইল। তারপরে এখানকার ঐ 'সীমাহীনতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যই' সেই হতচ্ছাড়া মৃতভূতকে 'নাড়িয়ে দিলো'। সে অপগণ্ডটা বিশেষ কিছু—না—ভেবেই, এ্যাক্কেবারে 'ভেতরটা চড়া কোরে চড়িয়ে'—'... ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম নীলাস্মদ্যুতি: আসৎ-পাদ দ শকাং...' এর সিদ্ধি ঘুঁটে পান করতে লাগলো। ....বেশ মৌজ। ...হঠাৎ ... (এখানেই আমার রোমাঞ্চ হচ্চে) অবর্ণনীয় পর-পর-এক সঙ্গে অতীব প্রচণ্ডতম—ভয়ংকর—বিরাট শব্দের, ঝলকে—ঝলকে শব্দ হল (আমার মনে হল এর মাসখানেক পরে, যে : প্রথম ব্রহ্মাণ্ড—বিস্ফোরণ হয়ে দুভাগে বিভক্ত করার সময় বোধ হয় এমনই 'বাজফাটা' শব্দ হয়েছিল।?।।—উফ ভাগ্যিস সে সময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র ফুদ্রের কেউ ছিলেন না। নতুবা, আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি : তাঁদের কেউই এখনো বর্তমান থাকতেন না) : .... আকাশ-বাতাস-দশ দিশা সব যেন ফেট্টে ফালাফালা হয়ে গেল, মৃতভূতের অমন চড়ান রঙ উড়ে গেল,

সমস্ত জায়গাটা মাতালের মতন, উন্মাদের মতন হেলতে দুলতে লাগলো। ধরণীর গভীরে—অতি গভীর থেকে একটা (যেন) কি রকমের কয়েকটা অত্যন্ত তীব্র চ-চ্চ-ডড এবং সুতীকষ্ন আর্ত শব্দ 'ছিঁড়ে বেরুলো', বাতাস এবং আকাশ, মনে হল জমে গেছে।... পৃথিবীর পাগলপারা দোল খাওয়ার সঙ্গে, মৃতভূতের শরীরও দুলচে। তারপর। হঠাৎ, একটা প্রচণ্ড কিছুর ঝাপটার সঙ্গেই মনে হল : আকাশ বাতাস হুড়মুড় করে খানচুর হয়ে গেল,—এবং : (যেন) সম্পূর্ণ বিরাট মেরু পর্বতটি আমার সামনে উপস্থিত!!! ঐ 'আকাশচুম্বী মেরুপর্বত' আগাগোড়া কর্পূর শুভ্র বিদ্যুৎ জ্যোতিতেই তৈরি বিন্দু। প্রাণময় সেই কর্পূর শুভ্র বিদ্যুৎ মেরুবিন্দু, ভাষা-ভাবনার অতীত। মৃতভূতের স্তব্ধ বিস্ময়, কিন্তু ভেতরে তার তখনও বেজে চলেছে ৺মা জননীর তন্ত্রী। তখনও বে-হোশ হয়নি। তারপর... সেই বিরাট কর্পূর শুভ্র বিদ্যুজ্জ্যোতি মেরু—মৃতভূতের সামনে 'আকার-সাকার রূপে'—সুস্পষ্ট পূর্ণ শরীর ধারিণী হয়ে এগিয়ে কাছে দাঁড়ালেন। এইবারে মৃতের 'দৌড়' শেষ হল। কী আশ্চর্য। ...এই-ই তাহলে আ-আ-পনি?! এ-এ-কী?!!! এইই কি...?' আনন্দে—উল্লাসে—আবেগে—দিশেহারা হয়ে, মৃতভূতের শরীর শূন্যে উঠল। তারপরই শরীর মাটিতে নেমে লুটিয়ে পড়ল।—জ্ঞান হারালুম... প্রাণ হারালুম....শেষ। কতক্ষণ—অথবা—কতকাল পরে?! জ্ঞান (?) হলে পর, মৃতভূত বুঝলো যে কারো অতীব সুখদ আনন্দময় কোলে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু একটু? পূর্বেরই সেই দিনের আলো এবং জ্যোতিরালোক কই?! কাজলের মতন কালো অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে আছে। যাক নিশ্চিত হওয়া গেল, নিশ্চয়ই, তাহলে মহাকালী—(অথবা মহাকালের) পেটের মধ্যে। সত্যই মৃতভূতের শেষই হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল : আমার 'কার্য' সমাপ্ত।।।...

মৃতভূতের দ্বারা, খানিক পরে, হাত-পা-চালিয়ে বোঝা গেল : আরে :। এ-তো জ্যান্তই রয়েছি। আ-আ-আ-স্তে—আস্তে চারিদিকে হাত বুলিয়ে বোঝা গেল : আমি কাহারো ক্রোড়ে শুয়ে। এবং ক্রোড়ের বিস্তার—প্রসার—জায়গার অনুপাতে,—মৃতভূত একটি দেড় বিঘতের সদ্যোজাত।।। বড় নরম আনন্দ শান্তির ক্রোড়। মিছিমিছি মাথা না ঘামিয়ে, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। চোখ খুলল : প্রচণ্ড খিদেয় মাতৃ-অমৃত সাবী স্তনদুগ্ধ পান করার অনুভবে। কথার শব্দ কানে এলো ....।। .... (ফর সেফটিস—সেক) কোলে বসে থেকেই হাত বাড়ালো চারিদিকে। কাজল কালো অন্ধকারের 'রহস্য' বুঝলো মৃতভূত। এলোকেশী, তাঁর সমস্ত কেশরাশি দিয়ে, তাঁর অবোধ-সদ্যোজাতকে অভেদ্য আড়াল দিয়ে কোলে রেখে বসে আছেন।। ফুটে-ফুটে—কেঁদে জিজ্ঞাসা করল, '... কেনো?। ....বুঝিয়ে দিলেন কেশ পাশ সরিয়ে নিয়ে, হেসে বললেন, 'ঠিক হয়ে গেছিস...? এখন দেখ ... বেড়িয়ে বেড়া ...কথাবার্তা কর...

প্রথম কাজ হ'ল টিপ-টিপ করে সাষ্টাঙ্গ পড়ে অগুন্তি প্রণাম। অগত্যা, তাঁকেই মাথাটা চেপে ধরতে হল। ...বললেন, '.... হঠাৎ এইভাবে... সহ্যের অতীত .... অজ্ঞানে এলিয়ে গেছিলি,—তাই তাড়াতাড়ি কোলে তুলে, ঢেকে আবরণ দিই... আর এখন কোনো রকমের ভয় রইল না .... তুই ঠিক হয়ে গেছিস... 'সে সময়' সব সহ্য করার শক্তি ছিল না... এবারে ...তোকে খাইয়ে-পরিয়ে সাফসুফ করে ঠিক করে দিলুম... এখন থেকে সব কিছু দেখবি—শুনবি—সহ্য করতে পারবি।....। চারিদিক ঘুরে ঘুরে গায়ের চামড়া পর্যন্ত রগড়ে দেখলুম ......বিস্ময়ে ডুবে বললুম, 'তবে যে সকলেই বলেন—আপনি কালো।? এতো দেখচি কর্পূর শুভ্র বিদ্যুৎ দীপ্তি।। হেসে গড়িয়ে পড়লেন... বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত রেখে বললেন 'তোর জন্যে এইই আমার আসল স্বরূপ। ... সকলে যাঁরা আমাকে কালো বলেন, তার কারণ ... এই দেখ...।' চেয়ে দেখলুম মা জননীর অঙ্গুলি নির্দেশে : হতভম্ব হয়ে রইলুম :.... সম্পূর্ণ পৃথিবীর সর্বত্র, হাটে—মাঠে—ঘাটে—ঘরে ঘরে প্রাসাদে, কুঁড়ে ঘরে রাস্তায় গাছতলায়—সর্বত্র মাঁ রয়েছেন শ্বেত বিদ্যুৎ বর্ণা কালী।

সর্বত্র, সব কিছুতেই শুভ্র শ্বেতবর্ণা কালী—কপালী!!! আকাশে—বাতাসে পর্যন্ত কর্পূর রঙ, কালো শ্যামা রূপ নিয়ে নয়।। কচিৎ, কদাচিৎ, মাত্র এক-আধজায়গায়, ক্ষণিকের তরে যাঁর কোলে বসে আছি সেই মূর্তিতে

ঝলকানি দিয়েই, মিলিয়ে যাচ্ছেন।।। ধ্বনি শুনতে লাগলুম : 'এখন তুই জানলি তোর মাঁ জননীর আসল রূপ কী। আমার কোলে তুই, আমার অগম্য অভেদ্য কেশরাশির আবরণ রক্ষা করে দুধ পান করিয়ে তোকে জীবন দিয়ে প্রসব করেছি। এখন থেকে এই তোর মাঁ জননীকে পূর্ণ রূপে দেখার—ছেলের সর্ব সত্ত্বা হল তোর। আমার এই আদ্যারূপ, মহাব্রহ্মা—মহাবিষ্ণু—মহারুদ্রেরও সহ্যের অতীত, এর সামান্য ঝলক মাত্রতেই, তাঁদের শরীর এবং সত্ত্বা গলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। মনে অগম্য অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিক্ষণই আমি প্রসব করছি—এবং খেয়ে ফেলছি... (গায়ে কাঁটা দিলো, ওই কোলে বসেও) হেসে বললেন কিরে ভয় পেলি? তোর আবার ভয় কি? ...প্রসবের সময় প্রত্যেকের মধ্যেই 'ম' রেখেই প্রসব করি। তোকে প্রসব করার সময়, তোর জন্যে যে 'ম', সেই তোর 'ম' টাকে আমি খেয়ে ফেলে, তোকে ভূমিষ্ঠ করি। ...মাত্র তুইই ঐ যে দেখছিস সর্বত্র—সর্বত্রই আমার কালো মূর্তিকে কর্পূর শুভ্র। অন্য সকলেই কালো-কালী রূপেই দেখচে। তার কারণ : ঐ 'ম', যেটা সর্বত্র, সবার মধ্যে—সব কিছুরই মধ্যে। এই জন্যই আমি কাল—কালো—কালী। 'ম'—ময়া—মায়া—শক্তিরূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অধিষ্ঠান কচ্ছি। এবং 'ম' এ অভিভূত সবাইকে,—সব কিছুকে, খেয়ে ফেলছি। তারা সবাই কালো দেখে। শুধু কচিৎ—কখনো কোথাও—কেউ, যেখানে তার নিজের ভেতরের 'ম' কে নিঃশোষিত করেছেন—সেই খানেই আমার এই (তুই যার কোলে) শুদ্ধ সত্ব রূপের দ্যুতির ঝলকানি। (ঐ—ঐ দেখ) দেখা যায়...। মায়া দণ্ড ধারণ করে, মায়া তত্ত্বরূপিণী দেহে, করাল আমি কালী ঘোর। শ্যামা।' নিজেরই ভিতরের 'ম' দ্বারা আচ্ছন্ন—সবাইকে আমি খেয়ে চলেছি। সে সব ক্ষেত্রেই আমি কালী করালী রূপে ভ্রাম্যমান। যেখানে 'ম' হীন কাউকে দেখি 'সেক্ষেত্রে' আমি কালো নই, সেখানে কালো আবরণ খুলে সরিয়ে দিই, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির জ্যোতিকেও ম্লানকারী। আমার এই শরীরের দীপ্তির একটি ক্ষণিক ঝলক সে দেখতে পায়। (পূর্ণ—আমাকে দেখলে, ঐ অবস্থাতেই সে শেষ হয়ে যাবে যে।!) তাকে 'কৈবল্য দিয়ে দিই... (কোলে দুলিয়ে হেসে বললেন) বুঝলি এখন?...

ছ্যাঁৎ—ছ্যাঁৎ করে 'দুজনের' কথা মনে উঠলো। হেসে বললেন .... 'হ্যাঁ, সে তো যা চেয়েছিলো তাইই পেয়েছে। ... (অন্যজন) না... তার 'ম' তাকে হতে দিলনা। তবে তার একটা ভালো স্থান প্রাপ্তি হয়েছে। সে তো এখনও যাওয়া আসার লোভ ছাড়তে পারেনি। ... তোর সঙ্গেও তো কয়েকবার কথা বলেছিল।... কি রে? কী ভাবছিস? হ্যাঁ, সর্বত্রই সব কিছুতেই আমি—ওই (আমার এইরূপের দ্বারা আড়াল করে) মায়া কালী রূপে। তবুও, দরকার আছে 'ছেলের'। মা ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখে প্রসব করেন : ছেলে 'ম' শূন্য হয়ে মার কাজ করবে বলে। 'ম' যুক্ত হলেই খেয়ে ফেলবেন। আবার প্রসব করবেন (পুনরায়) পূর্ব পূর্বগুলোর থেকে ভালো (উত্তম) ছেলে পাবার জন্যে...।'

মনে পড়লো 'শ্রীরামচরিৎ মানসের' বর্ণনা, '.....জগৎ জননী দামিনীদ্যুতি গাতা.... বিশ্ববিমোহিনী স্ব-বশ বিহারিণী.....'

(কর্পূর শুভ্র বিদ্যুতের দ্যুতির মতন শরীরের বর্ণ)

'ম' ঁমায়া-কালী মায়ার আবরণ,
কৈবল্যদায়িনী, বেশির ভাগ—কেবল
মুক্তি দায়িনী।।
একমাত্র নিজেরই বশ, আর কারো বশে নয়, কারণ—কার্য, ক্রিয়াকরণ সবই, একমাত্র নিজ ইচ্ছায়।
এ বিষয়—আর কিছু লিখব না, বলব না। জিজ্ঞাসা করবে না।

পরে (দিন পনেরো পরে) জানলুম :

ঐ সীমাহীন প্রান্তরের দেশে—'ঐ দিকেই'—একটি বিরাট—প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল (ঠিক 'সেই সময়') —পাহাড়-মাটি-মরু ফেটে গেছিলো।

যেমন : উপরে : প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলুম, আমার মাঁ জননীর রং কালো নয়, কৃষ্ণবর্ণ নয়।..."[২৬]

'ঐ মহামানব আসে' গ্রন্থে ভগবানজির শিষ্য, রবিঠাকুর ও সুভাষচন্দ্রের আশীর্বাদধন্য 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদক সুনীল দাস, পরবর্তীকালে বিজয় নাগ (যিনি প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা ও সুভাষচন্দ্রের একদা সহকর্মী লীলা নাগের ভ্রাতুষ্পুত্র) চারণিক নামে ভগবানজি বা মহাকালের নানা সময়ের টুকরো টুকরো কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে খুঁজে পাওয়া যায় হারান দেশনায়ককে, মাতৃসাধক সুভাষচন্দ্রকে—

'...কাউকে 'লীড' করচি, করবো এরূপ দণ্ড অহংকার—উগ্র গর্ব মহাকালের নেই। ৺মাকালী দয়া করে তাঁর পাগল ছেলেকে, ওরূপ ভ্রম থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, বাঁচিয়ে রাখবেনও। (যতদিন তাঁরই সেবা-সাধনায় লাগিয়ে রাখার ইচ্ছা করবেন) গর্ব অহংকার, দাম্ভিকতা মাতৃসাধকের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জিত; এসব লক্ষ্যসিদ্ধির পথে বাধক। ৺মায়ের সামনে এই দীনমহাকাল মাঁকালীর উলঙ্গশিশু। মহাকাল এ মাতৃসাধনায় যে Humility feel করে, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। অন্যদেরকেও বোঝাবার আমার দরকার নেই। কারণ খুবই simple : যার কিছুই নেবার মতন নেই, তার (অন্য কাউকে) বোঝাবার দরকার ফুরিয়ে যায়। Mislead আমি করতে পারিনে কারণ : Lead বা mislead সেই জনই করতে পারে যে কর্মকর্তা। আমি তা নই। কর্মকর্তা আমি নই। আমি নিজেই led। যে led যে lead করতে পারে না।...' [২৭]

মা কালীর কাছে সমর্পিত সুভাষচন্দ্রকে অন্যরূপে, ভিন্ন পরিবেশে তাঁর একান্ত কিছু অনুগত সঙ্গ করতে পেরেছিলেন।

গুমনামী নেতাজির সেই মহাকাল কথন অতি দীর্ঘ এবং অতি উচ্চস্তরের। সব সময় হয়তো বা অনুধাবন কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য। ফিরে যাই 'তরুণের স্বপ্নে' র সেই নবীন নায়ক দেশ গৌরব সুভাষচন্দ্রের যৌবনের ভাবভাবনায় বিশ্বজননী শ্যামামায়ের স্বরূপদর্শনে '...সাধনার স্বরূপ তাই বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এই ভাবে—

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার
সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'[২৮]

সাধক মনের সুভাষের সুহৃদ সাধক গায়ক দিলীপকুমার রায়ের স্মৃতি- কথায় জানা যায়—'সুভাষচন্দ্র কৈশোরেও গঙ্গাজলে নেমে ইংরাজিতে আবৃত্তি করত স্বামী বিবেকানন্দের 'Kali the mother'—

'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল নৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে'। (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বঙ্গানুবাদ)

কবি ও সুভাষচন্দ্রের একদা সহকর্মী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখনিতেও রুদ্ররূপা মহাকালীর ভক্তসাধক সুভাষকে খুঁজে পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্র তখন জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ তরুণ নেতা। পূর্ববঙ্গের ঢাকার পথে নৌকাতে চলেছেন, সঙ্গী এক ছাত্র নেতা অবিনাশবাবু সহ কয়েকজন কর্মী। পদ্মানদীর আকাশে ঘনমেঘের আনাগোনা যে কোনও মুহূর্তে ঝড় আসতে পারে। এমনি এক পরিবেশে কালীভক্ত সুভাষকে খুঁজে পাওয়া যায়—'... কালো মিশমিশে মেঘ ফুলে ফুলে উঠছে, পদ্মানদীর অগণিত তরঙ্গমালা—সাপ খেলানো

বাঁশির সামনে অসংখ্য অজগরের মতো। সুভাষচন্দ্র নৌকার সেই অসহনীয় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—তোমরা কেউ শ্যামাসঙ্গীত জান?

অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন—না। জানলেও তোমরা কেউ গাইবে না—সে, আমি জানি। এমনি মেঘের আলোড়নের মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত খুব ভালো লাগে আমার। তোমরা যখন গাইবে না—তখন আমাকে গাইতে হয়, আস্তে আস্তে বললেন সুভাষবাবু। সকলে বিস্মিত হয়ে পরস্পরের পানে তাকায় কেউ কথা কয় না। সুভাষচন্দ্র ততক্ষণে গুনগুন করে গান ধরেন।

কবে আবার নাচবি শ্যামা
মুণ্ডমালা দুলিয়ে গলে
ওই কালো মেঘের অন্ধকারে
তোর, হাতের খড়্গ উঠুক জ্বলে

মা, তোর ত্রিনয়নের বহ্নি-শিখায়
ছাই করে দে মনের কালি
আমি ভয়ডরে করব না ভয়
তুই অভয় মন্ত্র দে মা কালী।
ওমা বারে বারে ডাকব তোমায়
মা হয়ে পালাবি কোথায়
এবার রাঙাজবার অর্ঘমালা
দিব, মা তোর চরণতলে।

নৌকা থেকে গ্রামের ঘাটে নামতেই দেখা গেল—বহু লোক সেখানে সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, গ্রামের লোকেরা সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা করে গ্রামের মধ্যে নিয়ে গেলেন—তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের আদর অভ্যর্থনা ও অতিথি সৎকারের আয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে—একজন দরিদ্র মুসলমান কংগ্রেস কর্মীর গৃহে উপযাচক হয়ে অতিথি হলেন সুভাষচন্দ্র। সঙ্গীরা রইল সে রাত্রির মতো পূর্ব নির্দিষ্ট গৃহে। সকালে গ্রাম্যস্কুলের খোলা মাঠে সভা বসল, হিন্দু-মুসলমান ভিড় করে দাঁড়াল সেই সভায়। এমন প্রিয়দর্শন যুবকই যে সুভাষচন্দ্র এ তারা কল্পনাও করেনি। এমন ধীরস্থির মিষ্ট কথাও তারা শোনেনি জীবনে। স্কুলের ভাঙা চেয়ার বেঞ্চি সাজিয়ে সভা—সেই সভায় সভাপতি সুভাষচন্দ্র। মুখের ভাব দেখে মনে হয়—তিনি যেন আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র রচনা করতে বসেছেন। আর অতি সামান্য জিনিসকে সুভাষচন্দ্র এমনি নিষ্ঠা ও অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করতেন—গুরুত্ব আরোপ করে অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও তিনি মহৎ সম্ভাবনাময় বড় করে তুলতেন।'[২৯]

বোলপুরের শান্তিনিকেতনে এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আপ্ত সহায়ক সুধাকান্ত রায়চৌধুরী দেশত্যাগের আগে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বের কথায় উল্লেখ করেছিলেন অনেক কথা। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার দিনগুলিকেও ভুলতে পারেননি 'নিরুদ্দেশের যাত্রা' পথের পথিক সুভাষচন্দ্র। তিনি সে সব দিনের বহু আলোচনাই করেছিলেন সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে।[৩০]

বোলপুরে 'আমার কুটির' পরিদর্শনে গেছেন সুভাষচন্দ্র। প্রাক্তন আন্দামান সেলুলার জেল ফেরত বিপ্লবীরা দেশীয় হস্তশিল্প কেন্দ্রের আড়ালে গেরিলা প্রশিক্ষণ চলত। সেখানেও পার্শ্ববর্তী শ্মশান, নদী, জঙ্গল, এর মাঝে মা কালীর পূজাস্থান আজও রয়ে গেছে।[৩১] যেমন রয়ে গেছে মেদিনীপুর জেলার নারাজোলের রাজবাড়ির

সেই কণক দুর্গামন্দির। যেখানে একদা বিখ্যাত দুর্গা দালানের সামনেই কাচের নাটমন্দির, শোনা যায় রবিঠাকুর এটি দেখে যাবার পরেই নাকি শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত কাচের উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের সঙ্গে দেশসেবার সূত্রেই গভীর যোগাযোগ ছিল সুভাষচন্দ্রের। রাজবাড়ির কাছারি প্রাঙ্গণে তাঁকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছিল। অগ্নিযুগের বহু বিপ্লবীর গোপন বৈঠক ও আস্তানা ছিল নারাজোল রাজবাড়ির দুর্গামন্দিরের পিছনে। দেশভাগের পর উপেক্ষা অবহেলায় সংস্কৃতি ও সংগ্রামী বাংলার অগ্নিযুগের সাক্ষ্যবহনকারী স্থানটিকে রাষ্ট্রীয় স্তরে আজও মর্যাদা দেওয়া হয়নি। খান পরিবারের স্থানীয় উদ্যোগী সদস্যের চেষ্টায় ঐতিহ্যরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সাধনার তীর্থ ক্ষেত্র নারাজোলের রাজবাড়ির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার গভীরতার সূত্রেই অনুমান করা যায়। ৩২

ঢাকার পদ্মাপাড়ের কোন এক অখ্যাত গ্রামে কিংবা বীরভূমে বোলপুরের 'আমার কুটির' অথবা নারাজোলের রাজবাড়ি সর্বত্রই সুভাষচন্দ্র স্বাচ্ছন্দ্য থেকে সমৃদ্ধ করেছেন স্বদেশি চেতনায়। ভবতারিণী মা কালীর ভাবসাধনার সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাব, চেতনাকে আত্মস্থ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র, ভাবীকালের নেতাজি এবং সন্ন্যাসী দেশনায়ক যাঁর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ঘোষণাতে আজও জাতীয় আন্তর্জাতিক আইনি আতঙ্ক আড়াল করে।

অথচ ভারতের বুকে ব্রিটিশ শাসনকালে যাঁর জনসভার আগে কোনো ধর্মীয় সংগীতের অনুষ্ঠান হত না, যেমনটা গান্ধীজির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যেত। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, যিনি প্রদেশ ও ধর্ম দেখে নয়। মানুষ দেখে সম্মান করতেন। এ শিক্ষা সেই বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর প্রাঙ্গণেই উপ্ত হয়েছিল সুভাষ মননে। তাই অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী ভগবানজির কক্ষেও মিলেছিল নেতাজির মা-বাবার ছবি, নানা রুদ্রাক্ষের মালা, কমণ্ডুল, ধর্মীয় পুস্তক এবং অবশ্যই বাঁধানো দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর ছবি।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সুভাষ কলকাতায় এলে বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরে রীতিমতো যাতায়াত করতেন। বেলুড়মঠের স্বামী সারদানন্দ কিংবা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে আনন্দময়ী মায়ের সান্নিধ্যসহ সুভাষের বহু আধ্যাত্মিক ভাব-ভাবনার নীরব সাক্ষী বয়ে চলা সেই গঙ্গা। সুভাষের অন্তর্লোকে বৈরাগ্যের ছোঁয়া কীভাবে স্পর্শ করেছিল সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সহপাঠীর ভাষ্যে জানা যায়, ক্লাসে বিরতির অবকাশে 'দেবদর্শন ও সাধুসঙ্গের আগে গঙ্গাস্নান করে সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত অনাবৃত দেহে প্রশান্ত মনে প্রতীক্ষা করতেন সুভাষ।'[৩৩]

বেলুড়মঠের রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যাঁর সঙ্গে কৈশোরে গৃহত্যাগ করে গেরুয়াধারী হয়ে বেনারসের রামকৃষ্ণ মিশনে যখন সুভাষ দুই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন তিনিই উপদেশ দিয়েছিলেন সুভাষকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বৃহত্তর দেশ সেবার কাজে ভবিষ্যতে গড়ে ওঠার জন্য। একদিন বেলুড় মধ্যে সেই রাখাল মহারাজের আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র সঙ্গীসাথী সহ মঠে যান। ফেরার সময় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়। মঠের ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ল। সুভাষচন্দ্র বসলেন নৌকার একেবারে সামনে। সেদিনের সেই বিরল দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায় প্রফুল্ল সরকারের একটি নিবন্ধে—'...সুভাষ বসল নৌকার আসার দিকে আসন করে। আর আমি তার একটু পিছনে। অস্তোন্মুখ সূর্যের সোনার কিরণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চূড়া ঝলমল করছিল। সুভাষ গান ধরল সে অভাবনীয় মুহূর্তে ভাবনা গম্ভীর উদাত্ত সুরে—নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর...'[৩৪]

গঙ্গা-পদ্মার বুকে সুভাষের শৈব-শাক্ত সংগীতময়তা মানসপটে কল্পনা করা যায় মাত্র। এমন দৃশ্য সর্বভারতীয় চলচিত্রে আজও স্থান হয়নি, পরিবর্তে বিকৃত ভুল তথ্যের নানা সিনেমা নির্মাণ করা হয়েছে তাঁর

জীবনকে নিয়ে।

১৯৪৩ সালের বিজয়াদশমীর রাত। সিঙ্গাপুরের বাসভবনে এলেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসী মহারাজ স্বামী ভাস্বরানন্দী। সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে মেয়ারস ম্যানসনের বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত আজাদ হিন্দের সর্বাধিনায়ক নেতাজির সঙ্গে সিঙ্গাপুরের আশ্রমের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে কলকাতার বাড়ি থেকে গৃহত্যাগ করে ভারত ছেড়ে আসার প্রসঙ্গও। 'জেল থেকে বেরিয়ে আমি যখন আমাদের Elgin Road-এর বাড়িতে বাস করছি, তখন কি যেন একটা দৈবশক্তি প্রণোদিত হয়ে ঐ বাড়ি হতে বেরোবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার জন্মেছিল। সবসময়ই মনে হত এবার বেরিয়ে পড়ে কিছু করা যাক। যা কিছু করবার এই সময়ই করতে হবে। কি হবে এভাবে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থেকে? বন্ধুদের একটা পরামর্শ করা গেল। শীঘ্রই একটা উপায় বের করে ফেললাম। আমার ঘরে সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিলুম। চণ্ডী, গীতা ইত্যাদি পাঠ করি দেখে ও আমার নিষেধ শুনে কেউ আর কাছে আসত না। এই সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম, আমার বন্ধুরা সকলেই carried out their duties. সেই জন্যই আমার এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।'[৩৫]

তাঁর এই দৈবশক্তির অন্যতম প্রেরণা অবশ্য মা কালী। তাঁর কক্ষে ছিল মা কালীর ছবি, চণ্ডী ও গীতা। লেপার্ড বা বাঘের চামড়ার আসনটি আজও আছে যেটিতে বসে তিনি ধ্যানযপ করতেন বলে জানা যায়।

কোন সে ঐশী প্রেরণা যা সুভাষচন্দ্রকে দুর্গম পথের অভিযাত্রী হতে নিঃশঙ্কচিত্ত করে তুলেছিল? সেজদাদা সুরেশচন্দ্র বসু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গড়িয়া পুর্ণিমা সম্মেলনের একসভায় সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন। ভাষণের মূল বক্তব্য উদ্যোক্তরা লিপিবদ্ধ করে দিলে তিনি স্বাক্ষর করেন। তিনি সেদিন কলকাতার বহু বিশিষ্টজনের সামনে বলেছিলেন ১৯৭০ সালের ১০ ডিসেম্বর। 'কলকাতার বাড়ি থেকে অন্তর্ধানের পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীর প্রত্যাদেশ পাওয়ার জন্য তিনি আমার কন্যাকে রাত্রি বারোটার সময় মন্দিরে পাঠান এবং তার আদেশ পাওয়ার পরে তিনি তাঁর যাত্রার কাজ আরম্ভ করেন।...'[৩৬] সুরেশবসুর কন্যা ইলা বসু প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর রাঙাকাকাবাবুকে যেমন দেখতে যেতেন তেমনই ভবতারিণী মার প্রসাদি ফুল আনতে গিয়েছিলেন এমন তথ্য পরিবারের সব তরফেই স্বীকার করা হয়েছে।

বহুদিন পর আদালতের নির্দেশে তৃতীয়বারের জন্য ভারত সরকার নেতাজি অন্তর্ধান তদন্তে একটি কমিশনের মাধ্যমে শুরু করেন। মুখার্জী কমিশনে ডাক পড়েছিল প্রবীণ অপূর্ব চন্দ্র ঘোষের[৩৭] ফৈজাবাদের রামভবনে অনামী বা গুমনামী সন্ন্যাসীর কাছে নেতাজির পূর্বপরিচিত যাঁরা যেতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিঃ ঘোষ। কমিশনের তরফে সেক্রেটারি প্রদ্যুত কুমার সেনগুপ্ত সেদিন প্রবীণ ওই স্বাধীনতা যোদ্ধার আবাসস্থান বেহালা ঠাকুরপুকুরের এক আবাসনে সাক্ষ্য নিতে এসেছিলেন। লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিন উপস্থিত থাকার। সেদিনের প্রসিডিংস বা সাক্ষ্য গ্রহণে ভগবানজির পূর্বশ্রমের অনেক তথ্য উঠে আসে। ঢাকার নারায়ণ গঞ্জে (১৯৩৯ সালে) একদা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিঃ ঘোষের সাক্ষাতের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। এরপর বিস্ময়করভাবে জানা যায় ভগবানজি বা গুমনামী বাবা অতুলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এলগিন রোডের প্রহরী বাহাদুর কেমন আছে? এর পরেই প্রশ্ন ছিল তাঁর কক্ষের মা কালীর ছবির ক্যালেন্ডার কী এখনো আছে? সেই ক্যালেন্ডারের ছবিটিই সম্ভবত বাঁধিয়ে নেতাজি ভবনের 'নেতাজির কক্ষ' যেটি প্রকৃতপক্ষে নেতাজির মা প্রভাবতীদেবীর ঘর ছিল, সেখানকার দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। নেতাজির ঘর যেটিকে এখন পরিবর্তিত করে নেতাজির মেজদাদা শরৎবসুর ঘর (প্রকৃতপক্ষে শরৎবাবু ১ নং উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকতেন) বলে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে নেতাজি ভবনের দোতলায়। সন্ন্যাসী তাঁর পূর্বাশ্রমের সেই মা কালীর ছবির স্মৃতি ভুলতে পারেননি। দেশত্যাগের পূর্বের সেই মুহূর্ত, তাঁর মা প্রভাবতীদেবীকে শেষ

প্রণাম না করে আসার বেদনা, অনুগামী শিষ্যের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তরুণ বয়সে সুভাষচন্দ্র অনুধাবন ও আত্মস্থ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান—'তুমি জন্ম হইতে মা'য়ের জন্য বলি প্রদত্ত...'। ৩০ বছরের তরুণ সুভাষ তাই লিখতে পেয়েছিলেন—'মানুষজীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না—বিচার থাকবে না—বুদ্ধি বিবেচনা থাকবে না—থাকবে শুধু Blind worship। তাই বুঝি মা'র সৃষ্টি। ভগবান করুণ যেন আমি চিরকাল এই ভাব নিয়ে মাতৃপূজা করে যেতে পারি।'[৩৮]

তাই তো সেই নিভৃতবাসী অভিমানী আত্মপরিচয়ে বিমুখ সাধক সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর থেকে একদা একভক্তের বয়ানে মা কালী ভক্ত সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের ইঙ্গিত মেলে—[৩৯]

স্নেহধন্য চারণকে[৪০] একসময় ভগবানজি বলেছিলেন—'চারণ, একটা কথা বলি, এর আগে বলিনি, কারণ এ ধরনের কথা তোমার ম্যাগনাকার্টায়-তেই আছে। তোমার Deadman শুধু বিশ্বাসই করেন না—তিনি সত্যই প্রত্যক্ষরূপে জানেন যে স্বয়ং শ্রীশ্রী মা জগদম্বা দুর্গাকালীই তাঁর ভেতরে বসে তাঁকে চালাচ্ছেন। যা কিছু শৈশব থেকে তিনি করেছেন এবং এখনো করছেন—তা সব শ্রীশ্রীমা জগদম্বা কালীই করছেন। তিনি যন্ত্র মাত্র। এই পূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলেই তিনি বার বার ডাক দিয়ে বলেন 'আমার একটা ভাষা আছে—বাণী আছে—যেটা হচ্ছে মায়েরই বাণী মাঁরই ভাষা। আমার মাঁর একটা ভাষা আছে—ভাব আছে দেবার জিনিস আছে। তা জগৎকে একদিন শুনতে হবে এবং মানতেই হবে। আমার মার দান পেয়েই জগৎ চিরমুক্ত চির উদ্বুদ্ধ হবে। (প্রত্যেক কথা ভেতরের গভীর—আসল অর্থ বুঝে নিও)। তিনি জানেন, পূর্ণরূপে জানেন, মা জগদম্বা দুর্গা কালী—তাঁরই কাজ করতে হবে, এই জন্যই—'স্বয়ং শয়তান' যত বড় এবং যত চক্রান্ত—বেড়াজাল—ষড়যন্ত্র ইত্যাদি করুক না কেন ৺মা তার ছেলেকে বের করে নেবেন-ই। প্রমাণ শত শত আছে। সব চাইতে বড় প্রমাণ—Mac Arthur-এর Final report এবং তার পরও সেই report and resultant efforts সত্ত্বেও—এতদিন পর্যন্ত এভাবে থাকা।'[৪১]

উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে মার্কিন সেনাপ্রধান ডগলাস ম্যাক আর্থার জানিয়ে ছিলেন, যে সুভাষ বোস আবারও অন্তর্ধান করেছেন, এবার ফিরে এলে আমরা পুরো এশিয়া আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।[৪২] তাঁর যাবতীয় নথিপত্র সব প্রকাশ্যে আসেনি এবং রহস্যময় কারণে বিজয়ী এই জেনারেলকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি, নানা সাম্মানিক মেডেল রাষ্ট্র কেড়ে নেয়। সে এক অন্য অধ্যায়।

তাঁর বড় প্রিয় দৃশ্য, বাংলার তুলসীমঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের দৃশ্য শঙ্খধ্বনি সুভাষচন্দ্রর পরবর্তী অধ্যায় ভগবানজি পর্বে একান্তে অনুগত শিষ্যদের জানিয়েছিলেন।[৪৩]

তিনি একসময় তাঁর 'মরদেহে'র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভগবানজীগত প্রাণ ভক্তদের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন এমনই ভাষায়—'এই mortal coil-এর শেষ খবর পাওয়া গেলে, এমনি ধারা জায়গায় রেখে দেওয়া, সেটা যেন শহর না হয়, metropolis না হয়। এমন একটা জায়গা যেখানে মেলা বসে, বাজার বসবে। Just below its surface রেখে দাও, কোন Tablet থাকবে না। Board না, Rod থাকবে না। মা-বোনেরা যারা ঐ রাস্তা দিয়ে যাবে তারা কেউ যেন না জানে এর নীচে একটা Body আছে। This is the highest honour I aspier...

... এখন মহাকাল যা করছে, তোমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হচ্ছে মহাকাল করছে। It is not so. This mortal Coil is being used as a foil, যে করছে তাকে রোধ করবার শক্তি কারো নেই।

সাঙ্গ আমার ধুলো খেলা,
সাঙ্গ আমার দেনা-পাওনা।

এ জন্যই আমি Perfectly tranquil.'[88]

ইংরাজি সাহিত্যে জারিত, সুভাষ হৃদয়ের অভিমানী কণ্ঠস্বরেও ছিল পূর্বাশ্রমের সুহৃদ দিলীপ কুমার রায়ের কণ্ঠে গীত-সংগীতের সেই ব্যথার সুর।

মা দুর্গা, মাকালী আশ্রিত সুভাষচন্দ্রের জীবন হিমালয়ের মতো বিশাল ও গভীর রহস্যময়তায় আবৃত। যেখানে জানার চেয়ে অজানার পরিমাণ অনেক। তবু তুষারাবৃত দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত হিমালয় দু'হাত দিয়ে মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে আগলে রেখেছেন। দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবীকে জেল থেকে সুভাষ লিখেছিলেন—'...জননী, বঙ্গজননী, বিশ্বজননী এ সব অত্যন্ত আপনার জিনিস কারার বন্ধনের মধ্যে আমাদের নিকট সহস্র গুণে পবিত্র, সুন্দর ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে। মানসজগতে তাঁহারা নিত্যবিরাজ করিতেছেন ও করিবেন কিন্তু তাঁহাদের মানসসত্তা বাস্তবজগতের বিচ্ছেদকে আরও তীব্র করিয়া তুলিবে।'[৪৫] সুভাষ হৃদয়ের এমন সুর শোনা গিয়েছিল মান্দালয় কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে মেজদাকে লেখা এক পত্রে —'দিনদুয়েক আগে খুব অভিনব নয়, অথচ একটি মজার অভিজ্ঞতা আমাদের হল। সূর্য অস্ত গেছে এবং সন্ধ্যার ছায়া এসে নেমেছে আমাদের ওপর। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারের চেয়েও অন্ধকার, মান্দালয়ে গ্রীষ্মে সুপরিচিত ধুলোর ঝড় আবছা সুদূর দিগন্ত থেকে উঠে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল।... বাতাস বয়েই চলল, ছাদের টালিগুলোও সুরু করল উড়তে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ে দোলায় মান জাহাজের মত কাঠের কাঠামোটিতেও শোনা গেল গম্ভীর কর্কশ শব্দ। ...স্বর্গের রোষ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না, করুণার বারি বিন্দু বর্ষিত হল উপর থেকে। দার্শনিকেরা বলেন, ঈশ্বরের করুণা গভীর অন্ধকারেও দীপ্যমান। পরিবেশের ঐকতান সম্পূর্ণ করতে বৈদ্যুতিক আলো যথাসময়ে গেল নিবে, মিল্টন এর 'cimmerian darkness'-এ আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেললাম। বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর ঝিলিক অন্ধকারকে করে তুলল দৃশ্যমান (আমি আবার মিল্টন-এর অনুগামী কারণ সেক্সপীয়ারের অপরূপ চন্দ্রলোকের বর্ণনা যতখানি সুমিষ্ট, সন্ত মিল্টনের অন্ধকারের বর্ণনা কি ততখানিই সুদক্ষ নয়?) আর অনুরাগী ভক্তের চোখে প্রকাশিত হল তমসার রানী মা কালীর হাসির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। (চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভিত অট্ট অট্টহাসি)...'[৪৬]

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবনব্যাপী মাতৃসাধনায় হারিয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অনেক চাওয়া, পাওয়া ব্যাথা যন্ত্রণার কাহিনি। তাঁর চরিত্র হননের নেপথ্যে স্বনামে তাঁর সাধনার মাতৃভূমিতে যাতে প্রকট হতে না পারেন সেজন্য জাতীয় আন্তর্জাতিকস্তরে নানা আইনী চুক্তির লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। পরিবারের সেই অতি ঘনিষ্ঠ মানুষজন যাঁরা সুভাষকে জানতেন বুঝতেন তাঁরা গত হবার পর দাবিদার বৃহত্তর পরিবারের একাংশ আজও নেতাজিকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর চিতাভষ্মের অন্তরালে রেখে দিয়ে অনেক গভীর সত্যকে দেশবাসীর চোখের আড়ালে রেখে পার্থিব সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলতে চান। থেকে যান নানা শাসক সম্প্রদায়ের নিরাপদ ছায়াতে। একদা পরাধীন দেশের যে রাজবিদ্রোহীকে দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে, সমুদ্রের অতলে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাতৃমুক্তির সাধনা করতে হয়েছিল। খণ্ডিত ভারতের বুকেও সেই সর্বত্যাগী মাতৃপূজারির উপযুক্ত আসন, স্বীকৃতি প্রদানের ব্যর্থতা জাতীয় জীবনের কাছে আজ ও আগামীর লজ্জা। সুভাষচন্দ্রের জনক-জননী ও সর্বকালের অতুলনীয় মাতৃসাধককে সহস্রকোটি প্রণাম। জয়হিন্দ।

তথ্যসূত্র

প্রথম অধ্যায় : মা জননী প্রভাবতী দেবী

১। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন ১৫-১৬ বছর

২। চিঠিতে সুভাষচন্দ্র মা জননীর প্রতি এমন শব্দবন্ধ ব্যবহার করতেন।

৩। ভারতপথিক (ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সিগনেটপ্রেস) বই-এর পরিশিষ্টের পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। ১৯৩৭ সালে ইউরোপে মাত্র একপক্ষকালে লেখা

৫। ভারতপথিক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৬। ঐ

৭। স্মৃতি আলোয়—গীতাবিশ্বাস পৃ. ৭

৮। ঐ

৯। গ্রন্থাগারটি এখনও আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়টি লেখক একসময় দেখলেও বর্তমানে পোষ্ট অফিস হয়ে গেছে।

১০। সুভাষচন্দ্রের নিবন্ধ 'জানকীনাথ বসু'। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১১। ঐ

১২। ঐ

১৩। ঐ

১৪। স্মৃতি আলোয়—গীতাবিশ্বাস, পৃ. ২

১৫। ভারতপথিক—সুভাষচন্দ্র বসু

১৬। ঐ

১৭। ঐ

১৮। স্মৃতির আলোয়—গীতা বিশ্বাস

১৯। ভারতপথিক—সুভাষচন্দ্র বসু

২০। স্মৃতির আলোয়—গীতা বিশ্বাস

২১। Subhas Chandra– Hemchandra Dasgupta, Pp. 8-9

২২। স্মৃতির আলোয়—গীতা বিশ্বাস

২৩। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), পৃ. ১৪৫-১৪৬

২৪। সহকর্মী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা

২৫। ঐ

২৬। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র (রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), অমল হোম-এর নিবন্ধ—সুভাষ স্মৃতিকথা, পৃ. ৬৮-৬৯

২৭। ঐ

২৮। ভারতপথিক—সুভাষচন্দ্র বসু

২৯। ঐ
২৯(ক)। ঐ
৩০। ঐ
৩১। কটকের বাসভবনে সংগ্রহশালার পুরোন কর্মচারী নন্দিনী দেবীর বক্তব্য
৩২। কেন্দ্র সরকার প্রকাশিত নেতাজি ফাইল ও 'ক্ষমা করো সুভাষ'- ড. জয়ন্ত চৌধুরী
৩৩। আশির দশকে লেখক এর মত অজস্র মানুষ দেখেছেন নেতাজি ভবনে জানকীনাথ বসুর বাসকক্ষ। বর্তমানে নেতাজিভবনে নেতাজির মা-বাবা'র কোন ঘর দেখা যায় না।
৩৪। স্মৃতির আলোয়—গীতা বিশ্বাস
৩৫। সে সময় সরকার, পরিবার কোন তরফেই সামগ্রী সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
৩৬। কলকাতায় নেতাজি ভবনেও প্রভাবতী দেবীর স্মৃতি সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি।
৩৭। দুর্গাদালান সংলগ্ন বিষ্ণুঘরে
৩৮। ভারতপথিক—সুভাষচন্দ্র বসু
৩৯। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অপ্রকাশিত পত্রাবলী—আবুল আহসান চৌধুরী
৪০। ঐ
৪১। ঐ
৪২। ঐ
৪৩। ঐ
৪৪। সুভাষের সঙ্গে বারে বছর—হেমন্ত সরকার
৪৫। ঐ
৪৬। ঐ
৪৭। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর—হেমন্ত সরকার
৪৮। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র—রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
৪৯। ক্ষমা করো সুভাষ—ড. জয়ন্ত চৌধুরী
৫০। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর—হেমন্ত সরকার
৫১। ঐ
৫২। ঐ
৫৩। ঐ
৫৪। হেমন্ত সরকারকে লেখা সুভাষের পত্র
৫৫। ঐ
৫৬। ঐ
৫৭। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটের সময় ৬/৪/১৯১৪ তে লেখা সুভাষের পত্র
৫৮। হেমন্তকে লেখা ২১/৪/১৯১৪ শুক্রবার বেলা ১.৩০ এ লেখা পত্র
৫৯। ঐ
৬০। ঐ
৬১। ক্ষমা করো সুভাষ—ড. জয়ন্ত চৌধুরী
৬২। ভারতপথিক—সুভাষচন্দ্র বসু, পৃ. ৪৮
৬৩। ঐ

৬৪। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর—হেমন্ত সরকার।

৬৫। প্রভাবতী দেবীকে লেখা সুভাষের পত্র

৬৬। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র। পৃ. ১৩৬

৬৭। ভারতপথিক। পৃ. ৫২

৬৮। ঐ

৬৯। ঐ, পৃ. ৫২-৫৩

৭০। ঐ, পৃ. ৪৯-৫১

৭১। ঐ, পৃ. ৫২

৭২। ঐ,

৭৩। ঐ, পৃ. ৫৪

৭৪। ঐ, পৃ. ৫৮-৫৯

৭৫। ঐ,

৭৬। ঐ, পৃ. ৫৯

৭৭। ঐ, পৃ. ৫৯-৬০

৭৮। ঐ, পৃ. ৬০

৭৯। শরৎ বসু লেখা পত্র ১৬/২/১৯২১

৮০। ঐ, ২৩/৪/১৯২১

৮১। হেমন্ত সরকারকে লেখা পত্র ২৩/৩/২০

৮২। আমার বন্ধু সুভাষ। দিলীপ রায়, পৃ. ১১২

৮৩। ঐ, পৃ. ৩৩০-৩১

৮৪। কেম্ব্রিজ থেকে শরৎ বসুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র, ২০/৪/২১

৮৫। শরৎ বসু লেখাপত্র, ২৩/৪/২১

৮৬। ঐ, ৬ এপ্রিল ১৯২১-এর পত্র

৮৭। হিন্দুস্তান, ১৬ ডিসেম্বর ১৯২১

৮৮। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র। পৃ. ১২২-২৩

৮৯। নেতাজির ভাইঝি ললিতা বসু লেখককে জানিয়েছিলেন

৯০। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১২২-২৩

৯১। ঐ

৯২। হেমন্ত সরকারকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র ১৯/৬/১৪

৯৩। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১২৪

৯৪। স্মৃতির আলোয় গীতা বসু (বিশ্বাস)

৯৫। স্মৃতির আলোয়, গীতা বসু (বিশ্বাস), পৃ. ২৩

৯৬। Brothers against the Raj. L. Gordon P. 194

৯৬। (ক) শকাব্দ (অথবা শালিবাহনাব্দ) হল ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত এক প্রাচীন সৌর অব্দ। এই অব্দ বঙ্গাব্দের ৫১৫ বছর পূর্বে এবং খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বছর পরে প্রচলিত হয়। শকাব্দের উৎস নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে প্রাচীন ভারতীয় নৃপতি শালিবাহনের প্রয়াণ দিবস থেকেই শকাব্দের সূচনা। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক

এবং সাময়িক পত্রে শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। ১৮৬১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৯৩৯ সাল।

৯৭। সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) পৃ. ৩১৬

৯৮। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর বংশধর নন্দিনী ভট্টাচার্যের সঙ্গে লেখকের কথোপকথন—২৪/৪/২০

৯৯। ঐ,

১০০। ঐ,

১০১। শনিবার, কটক থেকে পাঠান মা জননী প্রভাবতী দেবীকে লেখা পত্র। চিঠিতে তারিখ ছিল না। কৈশোর কালে লেখা পত্র সুভাষের।

১০২। ঐ,

১০৩। সদ্য প্রয়াত পিতৃদেব জানকীনাথ বসু সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের লেখা নিবন্ধ।

১০৪। মানসতীর্থ পরিক্রমা। সুশীল বসু, পৃ. ১৭৬-৭৭

১০৫। ঐ, পৃ. ১১৯-২০

১০৬। জানকীনাথ নিবন্ধ সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষ সমগ্র রচনাবলী, ১ খণ্ড, পৃ. ৩১৬

১০৭। মানসতীর্থ পরিক্রমা, সুশীল বসু, পৃ. ১৭৭

১০৮। ঐ, পৃ. ১৮০

১০৯। ঐ,

১১০। সুভাষ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), জয়শ্রী প্রকাশন। পৃ. ৪৩-৪৪

১১১। সুভাষ শক্তি মন্দির স্বাধীনতা—মালা মৈত্র, পৃ. ৫১

১১২। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১৫৭-৫৮

১১৩। My uncle Netaji by A. N. Bose. P. 105-6

১১৪। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১৫১-৫২

১১৫। মিসেস ভেটারকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র ৭/১২/১৯৩৪

১১৬। Brothers against the raj, Gordon. P. 291

১১৭। Ibid.

১১৮। Ibid.

১১৯। পরিবর্তন (সাপ্তাহিক), ১৮ এপ্রিল ১৯৮৪

১২০। নারাজোল : এক অনন্য জনপদ। দেবাশিস ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৫

১২১। বসুবাড়ী, শিশির বসু। পৃ. ৬১

১২২। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ২০৮-৯

১২৩। মুখার্জী কমিশনে শিবপ্রসাদ নাগ সম্পর্কিত নথি নং ২৪৪০

১২৪। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর, সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী সত্যভূষণ গুপ্তের সঙ্গে সারদানন্দজির সাক্ষাৎকার। নেতাজী গেলেন কোথায়?—ড. জয়ন্ত চৌধুরী, পৃ. ১১২

১২৫। My uncle Netaji by A. N. Bose. P. 134

১২৬। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১৫২

১২৭। My uncle Netaji by A. N. Bose. P. 134

১২৮। নেতার নেতা নেতাজি, রণজিৎ বসু, পৃ. ৮৫

১২৯। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১২৪-২৫

১৩০। স্মৃতির আলোয়—গীতা বিশ্বাস, পৃ. ২৩
১৩১। ঐ, পৃ. ২৮
১৩২। মডার্ন রিভিউ, এপ্রিল ১৯৩৯
১৩৪। ক্ষমা করো সুভাষ, ড. জয়ন্ত চৌধুরী, পৃ. ৫৭
১৩৫। ঐ
১৩৬। নেতাজির ন' দাদা ডা. সুনীলচন্দ্র বসুর কন্যা লীলাবতী (রাধু) দেবীর পুত্র ইন্দ্রনীল মিত্রের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার ৪/৫/২০২০
১৩৭। লীলা মিত্রের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার
১৩৮। নেতার নেতা নেতাজী, রণজিৎ বসু, পৃ. ৭
১৩৯। ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮
১৪০। বসুবাড়ী, শিশির বসু, পৃ. ১০৭
১৪১। নেতার নেতা নেতাজী, রণজিৎ বসু। পৃ. ৪৩
১৪২। বসুবাড়ী, শিশির বসু, পৃ. ১২৩
১৪৩। ঐ
১৪৪। 'দেশ' পত্রিকা জানুয়ারি ১৯৯৭
১৪৫। শিশির বসুর সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট
১৪৬। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র। পৃ. ১০৯-১০
১৪৭। 'জীবনের স্মৃতি দীপে' ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৬০
১৪৮। সুভাষ স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। পৃ. ৩৯
১৪৯। নেতাজীর দাদা ডা. সুনীল বসুর দৌহিত্র ইন্দ্রনীল মিত্র লেখককে জানিয়েছিলেন (৯/৫/২০) শিশির বসুর সামনেই নেতাজির ভাইঝি ললিতা বসু জানিয়েছিলেন—'do not tell lie, it is not the Netaji's room. It is Maajanani's room?'
১৫০। সি.আই.ডি. রিপোর্ট, ৩১/১/১৯৪১
১৫১। ঐ, ২৬/১/১৯৪১
১৫২। ঐ,
১৫৩। File No-- R-2-2-20 & 21
১৫৪। নেতার নেতা নেতাজি, রণজিৎ বসু, পৃ. ৪৯
১৫৫। ঐ, পৃ. ৫০
১৫৬। বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, পৃ. ২৪
১৫৭। নেতার নেতা নেতাজি, রণজিৎ বসু, পৃ. ৫৮-৫৯
১৫৮। ঐ, পৃ. ৬২
১৫৯। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১২৫
১৬০। মানসতীর্থ পরিক্রমা, সুশীল বসু, পৃ. ১৭৯-৮০
১৬১। স্মৃতি চারণের লিপিবদ্ধ তারিখ ১৪/৬/১৯৬৭
১৬১ক। পুরোনো সেই দিনের কথা, গীতা বিশ্বাস পৃ. ১০
১৬১খ। ঐ
১৬১গ। ঐ, পৃ. ৪

১৬১ঘ। ঐ, পৃ. ৩৪
১৬১ঙ। ঐ, পৃ. ৩৮
১৬১চ। ঐ, পৃ. ২১-২২
১৬১ছ। ঐ, পৃ. ১৬
১৬১জ। ঐ, পৃ. ৬
১৬১ঝ। ঐ
১৬১ঞ। President Against the Raj, by Dr. Jayanta Choudhuri, P. 41
১৬২। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র।
১৬৩। পত্রের তারিখ ৩/১১/১৯৪০
১৬৪। জীবনের জলসাঘরে, মান্না দে, পৃ. ৭৩
১৬৫। ঐ,
১৬৬। ঐ,
১৬৭। ঐ, পৃ. ২২
১৬৮। জয়শ্রী, নেতাজি শতবর্ষ গ্রন্থ, পৃ. ৭৫
১৬৯। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র (রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)।
১৭০। জয়শ্রী, নেতাজি জন্ম শতবর্ষ গ্রন্থ, পৃ. ২২
১৭১। সুভাষচন্দ্রের ছাত্র জীবন, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৩৪
১৭২। Brothers against the Raj. Gordon, P. 482
১৭৩। Ibid. P. 482
১৭৪। বসুবাড়ী, পৃ. ১৫৮-৫৯
১৭৫। ইন্দ্রনীল মিত্রের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার।
১৭৬। তাইহোকু থেকে ভারতে (দ্বিতীয় পর্ব), শ্রী অভিজিৎ পৃ. ৮৮
১৭৭। Oracle January 2014, P. 8
১৭৮। Calcutta Municipal Gazzatte, Netaji Birth centenary volume, P. 322
১৭৯। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনে উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদের রামভবনে ভগবানজির কক্ষে প্রাপ্ত বিজয় নাগের চিঠিপত্রের নথি
১৮০। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রামকথা সংগ্রহশালায় ভগবানজির কক্ষে প্রাপ্ত নানা দ্রব্য ও নথি, বইপত্র
১৮১। Netaji Subhas Chandra Bose and the Indian liberation Movement in East Asia by Priyadarshi Mukherjee. P. 408
১৮২। আজাদি সেনা অমূল্যচন্দ্র ভদ্রের কথায় বোমাবর্ষণে কালেও নেতাজি গেয়েছিলেন 'প্রলয় নাচন নাচলে যদি...' অনির্বাণ নেতাজি, ড. জয়ন্ত চৌধুরী সম্পাদিত। পৃ. ১৯৯, (ড. সুমিত মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ)
১৮৩। বসুবাড়ি, শিশির বসু, পৃ. ১৫৯
১৮৪। ঐ
১৮৫। Brothers against the raj, Gordon. P. 507
১৮৬। সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৪
১৮৭। ঐ পৃঃ ১৪৪

১৮৮। ঐ

১৮৯। ঐ, পৃঃ ১৬৮-৯

১৯০। ঐ, পৃঃ ১৬৯

১৯১। Cellular Jail of Andaman by Ratan chandra Kar, p. 178

১৯২। Ibid, p. 180

১৯৩। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নেতাজি সম্পর্কিত ব্রিটিশ আমলের গোয়েন্দা ফাইল।

১৯৪। My Adventures with the I.N.A. by K.R. Palta, p. 77

১৯৫। একনম্বর বাড়ি, কৃষ্ণা বসু, পৃঃ ৩২-৩৩

১৯৬। পরিবর্তন, ১৮-২৪ এপ্রিল, ১৯৮৪

১৯৭। ঐ, পৃঃ ২২

১৯৮। ঐ

১৯৯। ঐ, পৃঃ ২২-২৩

২০০। ঐ, পৃঃ ২৩

২০১। ঐ

২০২। ঐ, পৃ. ২০-২১

২০৩। 'ভিশন ২৪' বৈদ্যুতিন টিভি চ্যানেলে 'চক্রান্তের পর্দা ফাঁস' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক, লেখক ড. জয়ন্ত চৌধুরীকে দেওয়া সাক্ষাৎকার।

২০৪। পরিবর্তন, ১৮-২৪ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃঃ ২৪

২০৫। যে তরণী খানি, কৃষ্ণা বসু, পৃঃ ৭০

২০৬। ঐ, পৃঃ ৭৪

২০৭। পরিবর্তন, ১৮-২৪ এপ্রিল, ১৯৮৪, পৃঃ ২৪

২০৮। ঐ

২০৮ ক। মানভূমে সুভাষচন্দ্র, দিলীপ কুমার গোস্বামী, পৃ. ৭৮

২০৯। পরিবর্তন, ১৮-২৪ এপ্রিল, ১৯৮৪, পৃঃ ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : যাঁরা ছিলেন সুভাষের মাতৃসমা

১। বিভিন্ন সময়ে লেখককে দেওয়া, আজাদ হিন্দ-এর ঝাঁসী রানী হেমন্তবালা, প্রতিমা পাল (ঘোষ) ও মানাবর্তী আর্যার দেওয়া সাক্ষাৎকার।

২। ভারতপথিক, সুভাষচন্দ্র বসু, পৃ. ১২-১৩

৩। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১৩৬

৪। ঐ, পৃ. ১২৩

৫। স্মৃতির আলোয়, গীতা বিশ্বাস, পৃ. ৪

৬। সুভাষচন্দ্রের জেল থেকে মেজো বৌদিকে লেখা পত্র, ১৬/১২/১৯২৫

৭। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ৩৩

৮। ঐ, পৃ. ৩৫

৯। ঐ, পৃ. ৩৫-৩৬

১০। ঐ, পৃ. ৪৭ ১০। (ক) মহাপ্রস্থানের পথে, প্রবোধকুমার সান্যাল, পৃঃ ১২৮

১১। ঐ, পৃ. ৪৬-৪৭

১২। তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ৯৯
১২ক। মানভূমে সুভাষচন্দ্র, দিলীপ কুমার গোস্বামী, পৃ. ২৯
১৩। তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ৭৯
১৪। ঐ,
১৪। (ক) গিদদাপাহাড়ের বসুবাড়ী—চিত্রা ঘোষ, পৃ. ২২
১৫। বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত সুভাষস্মৃতি (১৯৭০) পৃ. ৩-৫
১৫। (ক) পুরানো সেই দিনের কথা—গীতা বিশ্বাস, পৃ. ২৪
১৫। (খ) ঐ, পৃ. ৪
১৫। (গ) ঐ, পৃ. ৪-৫
১৫। (ঘ) ঐ, পৃ. ৫-৬
১৫। (ঙ) ঐ, পৃ. ৪০
১৬। হেনা চৌধুরী সম্পাদিত 'নারীজগৎ' পত্রিকায় কৃষ্ণাবসুর বক্তব্য
১৭। নেতার নেতা নেতাজি—রণজিৎ বসু, পৃ. ১৪
১৮। ক্ষমা করো সুভাষ—ড. জয়ন্ত চৌধুরী, পৃ. ৭৭
১৯। গিদধা পাহাড়ের বসুবাড়ী, চিত্রা ঘোষ, পৃ. ২৯-৩৩

তৃতীয় অধ্যায় : সুভাষচন্দ্রের বঙ্গজননী—ভারতমাতা

১। অনাথবন্ধু দত্তকে লেখা পত্র, ডিসেম্বর ১৯২৬, তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ২৩-২৫
২। তরুণের স্বপ্ন, সুভাষচন্দ্র বসু, পৃ. ৩
৩। ঐ, পৃ. ৯
৪। ঐ, পৃ. ১১
৫। ঐ, পৃ. ১২-১৩
৬। ঐ, পৃ. ৭৬
৭। ঐ, পৃ. ১৩-১৪
৮। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ এ উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের আবেদন
৯। তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ১০৪-১০৫
১০। ঐ,
১১। ঐ, পৃ. ১০৫-১০৬
১২। ঐ, পৃ. ১০৭
১৩। সুভাষচন্দ্রের পত্র ২০/২/১৯২৬
১৪। পাবনা যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ২৭ মাঘ, শনিবার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ
১৫। মান্দালয় জেল থেকে গোপবন্ধু দাসকে সুভাষচন্দ্রের পত্র ২৪/১২/১৯২৫
১৬। ঐ
১৭। Netaji's Speech on 22\09\1944. Netaji : A Political visionary by Dr. Jayanta Choudhuri Pp. 78-79
১৮। নেতাজির সিক্রেট সার্ভিস, ডা. পবিত্রমোহন রায়, পরিশিষ্ট, পৃ. ১১১
১৯। তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ১১৯
২০। ঐ, পৃ. ১৬১

২১। ঐ, পৃ. ১৬০
২২। ঐ, পৃ. ১৬৯

চতুর্থ অধ্যায় : নেতাজি সুভাষের চোখে মা দুর্গা—মা কালী

১। স্থানীয় নন্দিনী দাস কটক নেতাজি মিউজিয়ামের অন্যতম কর্মী। লেখকের সঙ্গে ভিডিও সাক্ষাৎকার এর তথ্য।

২। নেতাজির অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারতপথিক', পৃ. ৫০

৩। লেখককে দেওয়া নন্দিনী দেবীর সাক্ষাৎকার।

৪। নেতাজির জন্মস্থান ও জানকীনাথ বসুর গৃহটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে দীর্ঘদিন ছিল। অনেক পরে ওড়িষ্যা সরকার ও কেন্দ্রের সাহায্যে সংরক্ষিত হয়।

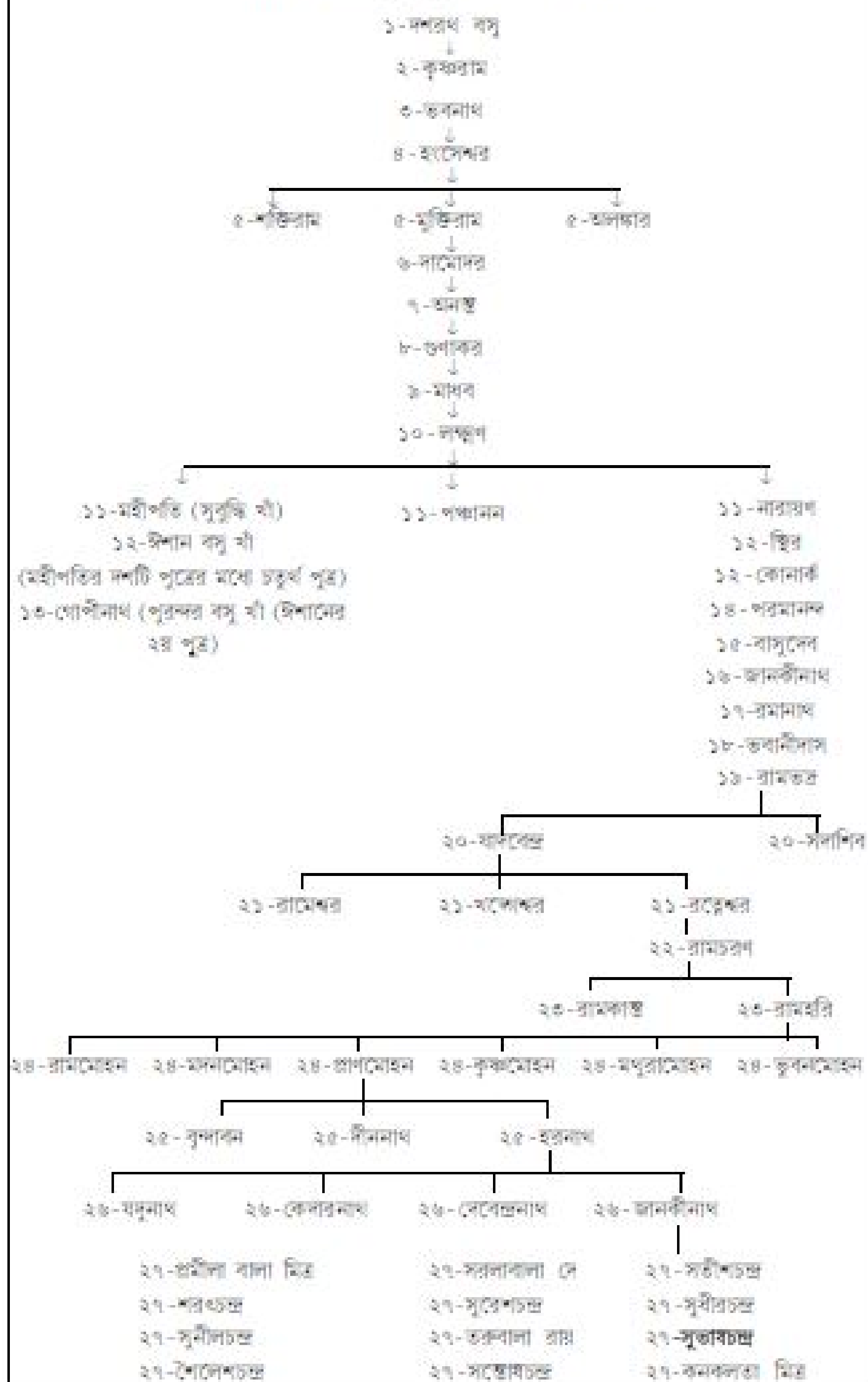
৫। ক্ষমা করো সুভাষ—ড. জয়ন্ত চৌধুরী, পৃ. ৬৪-৮১
৬। বিপ্লবীদের দুর্গোৎসব—রবীন্দ্রকুমার শীল, পৃ. ১৭
৭। মেদিনীপুর যুব সম্মেলন ভাষণ—২১/১২/১৯২৯, তরুণের স্বপ্ন-- পৃ. ১৬১
৮। ১৯২৬ সালে মান্দালয় জেল থেকে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা পত্র।
৯। তরুণের স্বপ্ন—পৃ. ৩৫-৩৬
১০। ঐ
১১। তরুণের স্বপ্ন—পৃ. ১৮
১২। ঐ, পৃ. ৩৬
১৩। ঐ
১৪। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), পৃ. ২২৭
১৫। ঐ, পৃ. ২২৮-২২৯
১৬। Inventory of Gumnamibaba
১৭। সমগ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) পৃ. ২৩৫-২৩৬
১৮। শরৎবসুর লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র ২৪/১০/১৯২৫
১৮ক। 'মুক্তি' পত্রিকা ১৭/১১/১৯২৮
১৯। বিপ্লবীদের দুর্গোৎসব—রবীন্দ্রকুমার শীল, পৃ. ২১
২০। ঐ, পৃ. ২৬
২১। ঐ, পৃ. ২৪
২২। ঐ, পৃ. ১৬ (ক) ১৮ অক্টোবর ১৯৩৯
২৩। বিপ্লবীদের দুর্গোৎসব—রবীন্দ্রকুমার শীল পৃঃ ১৭
২৩(ক)। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ৮২-৮৩
২৩(খ)। ঐ, পৃ. ৮৪
২৪। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র—রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ১৯৮
২৪(ক)। ঐ

২৫। অম্লানকুসুম ঘোষ পরিচালিত তথ্যচিত্র 'ব্ল্যাক বক্স অফ হিস্ট্রি' তে বিচারপতি মনোজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার।

২৬। গুমনামীবাবার ইনভেন্ট্রি এক্সিবিট, মুখার্জী কমিশন, নং—২৪৪০
২৭। ঐ মহামানব আসে (অখণ্ড সংস্করণ) পৃ. ১১৬

২৮। তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ১৪৫
২৯। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ৫৯-৬০
৩০। রবীন্দ্রনাথের আপ্ত সহায়ক সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর স্মৃতি নিবন্ধ
৩১। বোলপুরের 'আমার কুটীর' এর সংগ্রহশালায় প্রাপ্ত তথ্য
৩২। নারাজোল : এক অনন্য জনপদ—দেবাশিস ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৫
৩৩। নেতাজির চোখে স্বামিজী—ড. জয়ন্ত চৌধুরী, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৩/১/২১
৩৪। ঐ
৩৫। স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র, পৃ. ১৯২-১৯৩
৩৬। নেতাজি গেলেন কোথায়? জয়ন্ত চৌধুরী, পৃ. ২৪
৩৭। মুখার্জী কমিশন, সাক্ষী নং- ৯৯
৩৮। সুভাষচন্দ্রের পত্র ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭
৩৯। অনির্বাণ নেতাজি (ড. জয়ন্ত চৌধুরী সম্পাদিত), পৃ. ৪১৬
৪০। তৎকালীন জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক, চারণিক সুনীল দাস
৪১। ঐ মহামানব আসে, চারণিক (অখণ্ড সংস্করণ, ২০১০) পৃ. ২৭৪
৪২। I.N.A. file No- 273 NAI
৪৩। ঐ মহামানব আসে, পৃ. ৮২
৪৪। ঐ, পৃ. ৮৩
৪৫। মান্দালয় জেল থেকে বাসন্তী দেবীকে লেখা সুভাষের পত্র ২১/৭/২৬
৪৬। মান্দালয় জেল থেকে মেজদাকে লেখা সুভাষের পত্র ১৭/৩/২৬

পরিশিষ্ট-১-ক

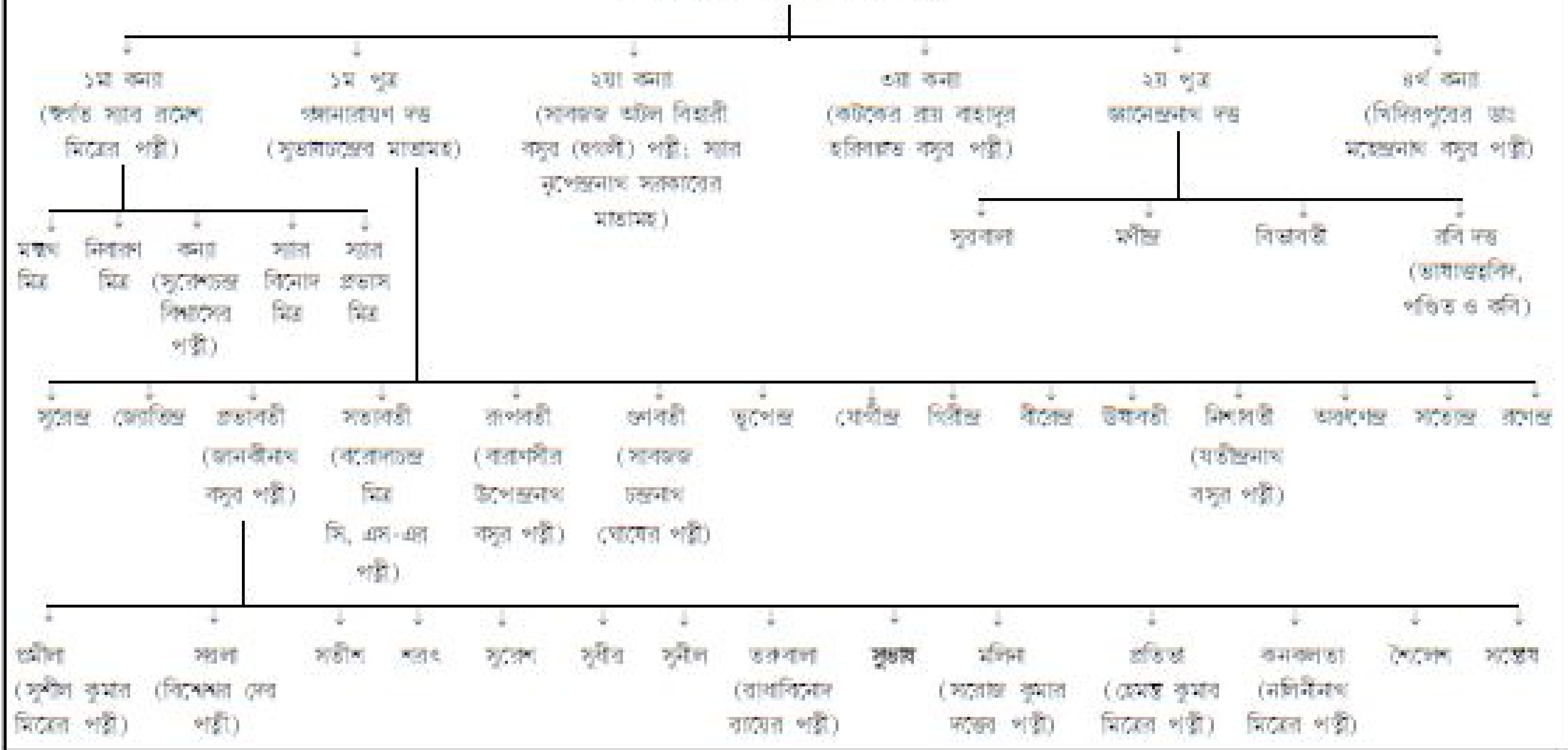

পরিশিষ্ট-১-ক
নেতাজির পূর্বপুরুষের বংশধারা
১-দশরথ বসু
২-কৃষ্ণরাম
৩-ভবনাথ
৪-হংসেশ্বর
৫-শক্তিরাম
৫-মুক্তিরাম
৫-অলঙ্কার
৬-দামোদর
৭-অনন্ত
৮-গুণাকর
৯-মাধব
১০-লক্ষ্মণ
১১-মহীপতি (সুবুদ্ধি খাঁ)
১২-ঈশান বসু খাঁ
(মহীপতির দশটি পুত্রের মধ্যে চতুর্থ পুত্র)
১৩-গোপীনাথ (পুরন্দর বসু খাঁ (ঈশানের ২য় পুত্র)
১১-পঞ্চানন
১১-নারায়ণ
১২-স্থির
১২-কোনার্ক
১৪-পরমানন্দ
১৫-বাসুদেব
১৬-জানকীনাথ
১৭-রামনাথ
১৮-ভবানীদাস
১৯-রামভদ্র
২০-মহাদেবেন্দ্র
২০-সদাশিব
২১-রামেশ্বর
২১-মহেশ্বর
২১-রত্নেশ্বর
২২-রামচরণ
২৩-রামকান্ত
২৩-রামহরি
২৪-রামমোহন
২৪-মদনমোহন
২৪-প্রাণমোহন
২৪-কৃষ্ণমোহন
২৪-মথুরামোহন
২৪-ভুবনমোহন
২৫-বৃন্দাবন
২৫-দীননাথ
২৫-হরনাথ
২৬-যদুনাথ
২৬-কেদারনাথ
২৬-দেবেন্দ্রনাথ
২৬-জানকীনাথ
২৭-প্রমীলা বালা মিত্র
২৭-শরৎচন্দ্র
২৭-সুনীলচন্দ্র
২৭-শৈলেশচন্দ্র
২৭-সরলাবালা দে
২৭-সুরেশচন্দ্র
২৭-তরুবালা রায়
২৭-সন্তোষচন্দ্র
২৭-সতীশচন্দ্র
২৭-সুধীরচন্দ্র
২৭-সুভাষচন্দ্র
২৭-কনকলতা মিত্র

পরিশিষ্ট—১খ

পরিশিষ্ট—১খ

হাটখোলার দত্তদিগের বংশধারা

বরাহনগরের কাশীনাথ দত্ত



পরিশিষ্ট-২

কিশোর সুভাষের মাকে লেখা পত্রগুচ্ছ

(নয়খানি পত্র ১৯১২-১৩ সালে প্রভাবতী বসুকে লিখিত)
শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

কটক
শনিবার

১
পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু
মা,

আজ নবমী; সুতরাং আপনি এখন দেশে—দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন।
এ বৎসর বোধ হয় পূজা বেশী জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কি? যাঁহাকে আমরা ডাকি—তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল; আর অধিক কি প্রয়োজন? যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে! এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশী দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা সর্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না; এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না; এবার একত্র বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্বোপরি 'শান্তি জলে'র অভাবে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল; পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্বত্র বিরাজমানা, অম্বরব্যাপিনী মূর্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দুঃখ ঘুচিত—কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না; কিন্তু সে আনন্দ, সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।

বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিব কিন্তু মন আপনাদের নিকটেই থাকিবে। এরূপ পুণ্য দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। আর উপায় নাই—কল্য রাত্রে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করিব। আপনি ও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও গুরুজনদিগকে দিবেন।

আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও বাবাকে জানাইবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

পুনঃ—সারদা কেমন আছে?

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

২

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

আজ সকালে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, তাহার সঙ্গে মণি অর্ডারে ৫০ টাকা পাইলাম।

আমি যে পত্র লিখি তাহার উত্তরের জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন না—অবকাশ মত উত্তর করিবেন। আপনার যদি পড়িতে কষ্ট হয় তাহা হইলে অন্য কাহার দ্বারা পড়াইয়া লইবেন।

কলাইসুটি জোবরা বাগানে লাগান হইতেছে কিংবা শীঘ্রই হইবে। রঘুয়া আমার নিকট হইতে ৫/৬ দিন পূর্বে কলাইসুটি লইয়া গিয়াছিল। জোবরা বাগানে আমি যাই নাই।

নগেন ঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি কি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিয়াছি তন্মধ্যে নগেন ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্বাপেক্ষা ভক্তি আকর্ষণ করে। নগেন ঠাকুরের চণ্ডীপাঠ বড়ই মধুর এবং অভক্তকে ভক্ত করিয়া ফেলে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব মহাশয়ের কোদালিয়া বাটীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমরা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিব। দেখা হইলে তাঁহাকে আমার ভক্তি প্রণাম জানাইবেন। বড়দিদির শরীর অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। তিনি কেমন আছেন। আপনার ডেঙ্গু হইয়াছিল শুনিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্যের সমুদয় স্তোত্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। একটি পুস্তকে তাঁহার সব স্তোত্রই আছে এবং মূল্য কেবল বারো আনা কিংবা ১ টাকা। এ সুযোগ ছাড়িবেন না। কঞ্চিমামাকে বলিবেন একটি ক্রয় করিয়া আনিতে। পুস্তকটি আপনার নিকট রাখিবেন এবং কটকে আসিবার সময় লইয়া আসিবেন।

মা, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি বোধহয় জানেন যে আমার আমিষ ত্যাগ করিবার বড়ই ইচ্ছা। কিন্তু পাছে কেহ কিছু বলেন বা মনে করেন সে আশঙ্কায় আমি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেছি না। আমি এক মাস পূর্বে মৎস্যভিন্ন সমুদয় আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ নদাদা আমার পাতে জোর করিয়া মাংস দিলেন। কি করি! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কারণ "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" একদা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বর একথা বলিয়াছেন। আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব? তাহাতে কি ঘোর পাপ হয় না? যাঁহারা বলেন যে মৎস্য না খাইলে চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হয় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এরূপ মূর্খ নন যে লোককে দৃষ্টিহীন করিবার জন্য তাঁহারা মৎস্য খাওয়া বারণ করিবেন। আপনাদের এ বিষয়ে কি মত?

আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সকলে ভাল আছি, আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

কটক
শনিবার

৩
পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

গোপালীর মুখে শুনিলাম আপনি ৺কাশীধামে যান নাই। বাবা একলা গিয়াছেন। বাবার পত্র হইতে জানিলাম যে আল বাজা সময় মত টাকা পাঠান নাই তাই যাওয়া হয় নাই। আপনি যে প্রেসক্রিপসনের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্য তাহাতে অধিক কিছু লিখিতে পারি নাই। আমি আপনার ঘরে ২টি নীলরতনবাবুর প্রেসক্রিপসন পাইলাম কিন্তু কোনটা চাই তাই বুঝিতে না পারিয়া উভয়ই পাঠাইয়া দিলাম। ছোটদাদাকে বলিবেন, তিনি বাছিয়া লইবেন।

দিদির চিঠি শেষ করিয়া কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি। লিলি কোথায় এবং কেমন আছে জানিতে উৎসুক হইয়াছি।

আমার অনুরোধে মেজদাদা আমাকে একটি লম্বা চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি কল্য তাহা পাইয়াছি—পাইয়া যে কতদূর আনন্দিত হইলাম তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। আমার অতি সামান্য অনুরোধে তিনি যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আমার কষ্ট হয়। পত্রটি আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত গয়নার মত তুলিয়া রাখিয়া দিব।

আর অধিক কি লিখিব। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভাল আছি। শরৎবাবু (জামাইবাবুর ভ্রাতা) এখানে আছেন। বাড়ী ঠিক হইলে বোধ হয় চলিয়া যাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণী কেমন আছে লিখিবেন। তাঁহাদিগকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইবেন। তাঁহাদিগকে আমি প্রত্যহ স্মরণ করি। তিনি এখানে যে পুষ্প চয়ন করিয়া রাখিতেন এবং আমরা গিয়া তাহার সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতাম তাহা এখনও যেন দেখিতে পাই। তিনি যেদিন পূজা করিয়া 'শান্তিজল' ও পুষ্প বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন যেন মানস-চক্ষে দেখিতে পাই। আমি বড় পাগলের মত লিখিতেছি, আপনার পড়িতে বোধ হয় কষ্ট হইবে।

আমাদের স্কুল বোধ হয় ১৫ তারিখে বন্ধ হইবে—জানি না—এখনও নোটিশ বাহির হয় নাই। আর যাহা কিছু বড়দাদার মুখে শুনিবেন ।

আমি ভাল আছি। যখন পুনরায় আমায় দেখিবেন তখন আমাকে এখন অপেক্ষা বলবান ও স্থূল দেখিবেন —আমি আশা করি। যদি তাহা না হয় তাহা আমার দোষ নয়—তাহা গ্রহদোষ। আমি শরীরে যত যত্ন লই

তাহা অপরে লয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু আপনি মনে করেন আমি ইচ্ছায় শরীর খারাপ করিতেছি। একমাস পূর্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা ভাল আছি।

প্রত্যহ হারাহারি ৪ টাকা খরচ হইতেছে—কোন দিন ৫ কোনদিন ৩ এইরূপ। আপনার ৩০ টাকা শেষ হইয়াছে। জগবন্ধু আমাকে বাবার ৩৭।।০ টাকা দিয়াছে—আমি কাজে২ তাহা খরচ করিতেছি।

এখানে একটু শীত হইতেছে খুব সকালে, কিন্তু এখনও শীতকালের বিলম্ব আছে। এখনও কপি লাগান হয় নাই। ২ টাকার কপির বিচি কেনা হইয়াছে—এখন চারা হইয়াছে।

বৌদিদি মামীমা ও মেজবৌদিদি কোথায় ও কেমন আছেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইবেন। অশোক কেমন আছে—দাঁত কি সমস্ত উঠিয়াছে? এ বাটীর কুশল জানিবেন। আশা করি ওখানকারও কুশল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক
বৃহস্পতিবার

৪

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। নদাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহার কি এবার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না?

ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া? দুঃখে পরিলে তাঁহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম। এই জন্যেই ত কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান! আমাকে সর্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও; তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব; সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।"

জন্মমৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিস—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল। জ্ঞান বড়, বড় জিনিস—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবে না—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাই না। তর্ক করিতে চাই না—কারণ আমি অজ্ঞ ও অন্ধ। সুতরাং এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস—শুধু "হরি আছেন" এই বিশ্বাস : আর কিছু চাহি না। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে"—ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য

—বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত করা এবং সদসৎ বিবেচনা শক্তি দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্য সফল হইলে লেখাপড়া সার্থক হইবে। লেখাপড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদবিশ্বাসী ও ভগবৎ প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান। আমি বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাহি না! ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণু বক্ষে ধারণ করিতে চাহি। আর একবার "দুর্গা" বা একবার "হরি" বলিলে যাহার ঘর্ম, অশ্রুত্যাগ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার ত কথাই নাই—সে স্বয়ং ভগবান। তাঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আমরা ত অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিস।

আমরা বৃথা "ধন" "ধন" বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবি না, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ প্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধিরাজরাও দীন ভিখারী। এরূপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা যে জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়।

আমরা "পরীক্ষা আসিতেছ" বলিয়া ব্যস্ত হই কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্মের নিকট। লেখাপড়ার পরীক্ষা কি সামান্য পরীক্ষা—তাহা দুইদিনের জন্য। কিন্তু সে সব পরীক্ষা অনন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে২ ভোগ করিতে হইবে।

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানবজন্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা এ মহা সত্য বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা এরূপ অন্ধ, এরূপ অবিশ্বাসী ও এরূপ মূর্খ যে কিছুতেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। আমরা মানুষ নহি—কলিযুগের রাক্ষস।

তবে আমাদের আশা আছে—ভগবান দয়াময়—তিনি চিরকালই দয়াময়। ভীষণ পাপের তাণ্ডব নৃত্যের ভিতরেও তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়ার আদিও নাই অন্তও নাই।

বৈষ্ণব ধর্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণব ধর্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান রক্ষা কর, এ কলিযুগে আর ধর্ম থাকে না, তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।" তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করেন। এইসব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে ২ সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে, এখনও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।

আপনি কলিকাতায় আর কতদিন থাকিবেন। আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি। বাবা ভাল আছেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক
রবিবার

৫

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোন পত্র দিই নাই তাই আজ অবসর পাইয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া হস্ত ও লেখনী উভয়কে পবিত্র করিতেছি।

আমার হৃদয়কাননে সময়ে ২ যে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহার সহিত চোখের অশ্রুজল মিশাইয়া আপনার চরণকমলে উপহার দিই। কিন্তু সে কুসুমের গন্ধে আপনার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়, না তাহার তীব্রতায় আপনাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা না জানিতে পারায় আমি কতকটা অশান্ত হইয়াছি।

আমার হৃদয়ে সময়ে ২ অকালীন মেঘের ন্যায় যে ভাব উদয় হয় তাহা নিকটে কাহাকে বলিব তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দূরদেশে আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি কিরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা জানিলে বড় আনন্দিত হই। কিন্তু আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রীতিকর হউক বা না হউক হৃদয়ের একমাত্র উপহার ভাবিয়া আমি তাহা প্রেরণ করিতে সাহসী হই।

মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের জন্য এত খরচ করিতেছেন—দুইবেলা গাড়ী করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ী ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে ৪।৫ বার করিয়া আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন—বস্ত্র পবিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত রাখিতেছেন—দাসদাসী নিযুক্ত করিয়াছেন, শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ছাত্রজীবন শেষ করিলে আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রবেশ করিয়া সারাজীবন গাধার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিতে হইবে এবং তৎপরে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রের কোন বিভাগে দেখিলে আপনি সর্বাপেক্ষা সুখী হইবেন? বড় হইলে আমাদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন—জানি না আপনার মনে ইচ্ছা কি। মা, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যারিষ্টার কিংবা অন্য কোনও হাকিমের গদীতে বসিলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—প্রচুর ধনশালী, গাড়ী, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাসদাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা "প্রকৃত মানুষ" বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানি না। আপনার পুত্রকে কিরূপ দেখিলে আপনার সর্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। দয়াময় ভগবান আমাদিগকে মানবজন্ম—সুস্থ দেহ-বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ দিয়াছেন—কেন? তাঁহার পূজা এবং তাঁহার সেবারই জন্য অবশ্য তিনি এত দিয়াছেন—কিন্তু মা—আমরা কার্য্য করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি না। মা, ভাবিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়, ভাবিলে মর্মাহত হইতে হয়—যিনি আমাদের জন্য এত করিতেছেন, যিনি কি সম্পদে বিপদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্বদাই আমাদের বন্ধু, যিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া আছেন—যিনি আমাদের এত নিকটে আছেন—যিনি আমাদের খুব আপনারই জিনিস, আমরা তাঁহাকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকি না। আমরা সংসারের ছার বস্তু লইয়া কত অশ্রুত্যাগ করি কিন্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশে একবিন্দু অশ্রুও ফেলি না—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিনহৃদয়। ধিক সেই শিক্ষা—যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই—নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না! লোকে

তৃষ্ণার্ত হইলে পুষ্করিণী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মিটে? কখনই না—মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন :

"ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"

ভগবান কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনো যুগে ছিল না। সেই নূতন—"বাবু"-সৃষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযান আছে কিন্তু আমরা ২০।২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারি না—কারণ আমরা বাবু। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হই—আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করি না—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা "বাবুলোক"। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি—আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে "বাবু"। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা "বাবু" আমরা সর্বত্র "বাবু" বলিয়া পরিচয় দিই কারণ আমরা "বাবু"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যরূপধারী পশু। পশু অপেক্ষা আমরা অধম—কারণ আমাদের জ্ঞান ও বিবেক আছে—পশুদিগের তাহাও নাই। জন্মাবধি সুখের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে আমরা তিলমাত্র কষ্ট-সহিষ্ণু হইতে পারি না—এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে আমরা জয় করিতে পারি না—সারাজীবন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আমরা এক দুর্বহ জীবনভার বহন করি।

আমি প্রায় ভাবি—বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়ে উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্মী হইয়া যায়—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠকায় লোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়। এবং সর্বোপরি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে এরূপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা আজকাল হইয়াছে—বিলাসিতাপ্রিয়, পরচর্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পর-সুখদ্বেষী এবং মনুষ্যত্ববিহীন—মা, ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আমরা পড়িতেছি—সম্মুখে যদি চাকরীর এবং অর্থের লোভ থাকে—তাহা হইলে কি লেখাপড়া—তাহা হইলে কি মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারা যায়? মা বাঙ্গালী কি কখনও মানুষ হইতে পারিবে? আপনার কি মত? মা, আমরা এবং আমাদের দেশ দিন ২ অধঃপতনে যাইতেছে। কে উদ্ধার করিবে? একমাত্র উদ্ধারকর্তা—বঙ্গজননী—বঙ্গমাতা যদি বঙ্গ সন্তানকে নূতনভাবে প্রস্তুত করিতে পারেন—তাহা হইলে পুনরায় বাঙ্গালী মানুষ হইবে।

আমরা ভাল আছি। ছোটদাদাকে পত্র দিলাম। বাবা সোমবার গোপণীপালান যাত্রা করিবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানিবেন। এবার পাগলের মত অনেক লিখিয়াছি। পড়িতে কষ্ট হয় ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক
রবিবার

৬
পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে ২ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্রা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিনজন—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী-তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজনে মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্তি! আমরা শান্তির জন্য হাহাকার করিতেছি! ভগাবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্ত্ত্যে কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নামকীর্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি! দেখি—পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী সলিল-ভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন—দিবারাত্র মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত—দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য—কুশ ও লব—মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রুর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে—গোকুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে—তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে—শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে—সমস্তক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র—সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধম্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনতারিণী কলুষ-হারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন—তাহার তীরে যোগিকুল বসিয়া আছেন—কেহ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন—কেহ কাননের পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া পূজা

করিতেছেন—কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগদিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন—কেহ গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র—সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধৰ্ম্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পর্যন্তও নাই। আমরা এখন এক দুর্বল শরীর পরদাসত্ব-ব্যবসায়ী, নষ্টধৰ্ম্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এ ত তোমারই দেশ—কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? আমাদের পূর্বপুরুষ আৰ্য্যগণ যে জাতি এবং যে ধৰ্ম্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে! দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি!

মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বসি তখন পাগলের চেয়েও পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি না এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানি না। মনে যে ভাবটি আগে আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি—ভাবি না কি লিখিতেছি বা কেন লিখিতেছি। ইচ্ছা হয় তাই লিখি—মন বলে—লেখ—তাই লিখি। যদি কিছু অসঙ্গত লিখিয়া থাকি তবে আমাকে মার্জনা করিবেন।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় যখন ভাবি তখন দুঃখিত হইব কি আনন্দিত হইব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যায় বা কিরূপ অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা জানি না। তবে চরমদশায় আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইয়া যায়—সেদিন আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন—কোনও দুঃখ নাই—কোনও কষ্ট নাই—পুনর্জন্ম কষ্ট আর আমাদের ভোগ করিতে হয় না—তখন আমরা নিত্যানন্দে বিরাজ করি। যখন ভাবি তিনি সেই নিত্যানন্দ ধামে গিয়াছেন—তিনি অমরগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া স্বর্গীয় সুধা পান করিতেছেন তখন আর দুঃখিত হইবার কারণ দেখি না। তিনি যখন সেই সদানন্দপুরে গিয়া মহাসুখে আছেন তখন আমরা যদি তাঁহার সুখেই সুখী হই তবে আমাদের শোকগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। দয়াময় ভগবান যাহা করেন জগতের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা প্রথমে ২ বুঝিতে পারি নাই কারণ তখন ফল ধরে নাই। যখন ফল পাকে তখন আমরা হৃদয়ের ভিতরে বুঝিতে পারি "বাস্তবিক দয়াময় হরি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।" ভগবান যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন তখন মিছামিছি আমাদের শোকাকুল হওয়া উচিত নহে—কারণ জিনিস তাঁহারই—তাঁহার ইচ্ছা হইলে অমনি তিনি কাড়িয়া লইবেন—আমাদের তাহাতে অধিকার কি আছে।

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি তাঁহার বিপথগামী ভ্রাতৃবৃন্দকে ধৰ্ম্মপথ দেখাইবার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন বা শীঘ্রই করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত বিরোধী হইতে পারি না। জগতের মঙ্গহই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা ভারতবাসী—অতএব ভারতের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল। তিনি যদি পুরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভ্রাতৃকল্প ভারত-সন্তানদিগকে ধৰ্ম্মনিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের যারপরনাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :

"দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।"

আমরা সকলে ভাল আছি। তাঁহার হাতেই আছি—তিনি যেরূপ রাখিয়াছেন, সেইরূপই আছি। আমরা সকলে তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলী—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—সবই তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালী—বাগানের মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ করি—কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ করি বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিই। কার্য্যে আমাদের অধিকার আছে—কার্য্য আমাদের কত্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাদের নয়। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

লিলি এখন কোথায় ও কেমন আছে? জানি না কোথায় আছে তাই পত্র দিলাম না। মামীমা ও বৌদিদিরা কোথায় ও কেমন আছেন? দাদারা কেমন আছেন? অন্যান্য সকলে কেমন আছেন ও আছে? আপনি ও বাবা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। মেজদাদার খবর কি? ২।৩ মেলে আমি কোনও পত্র পাই নাই। নূতন মামাবাবু কেমন আছেন?

শুনিলাম ছোট মামীমার বড় অসুখ হইয়াছে। তিনি কেমন আছেন? সারদা কি বলে? ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

রাঁচি
রবিবার

৭

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু

মা,

অনেকদিন হইল কলিকাতার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন—বোধ হয় সময়াভাবে পত্র দিতে পারেন নাই।

মেজদাদা কি রকম পরীক্ষা দিলেন?

আপনি কি আমার চিঠির সমস্তটা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব।

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারত মাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্যা! হায়! কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই আর্য্যবীরকুল যাঁহারা ভারতমাতার সেবার জন্য হেলায় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন!

মা, আপনি ত মা, আপনি কি শুধু আমাদের মা? না মা আপনি ভারতবাসী মাত্রেরই মা—ভারতবাসী যদি আপনার সন্তান হয় তবে সন্তানদের কষ্ট দেখিলে মা'র প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠে না? মা'র প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর! না, কখনই হইতে পারে না—মা ত কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারে না। তবে সন্তানদের এই শোচনীয় দুরবস্থার সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! মা, আপনি ত ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন—ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আপনার প্রাণ কি কাঁদে না? আমরা মূর্খ—আমরা স্বার্থপর হইতে পারি কিন্তু মা ত কখনও স্বার্থপর হইতে পারে না—মা'র জীবন যে সন্তানের

জন্য! যদি তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! তবে কি মা স্বার্থপর! না, না, তা কখনই হইতে পারে না!

মা, শুধু দেশের কি এরূপ শোচনীয় অবস্থা! দেখুন ভারতের ধর্মের কি অবস্থা! কোথায় সেই পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপতিত ধৰ্ম্ম! কোথায় সেই পবিত্র আৰ্য্য ঋষিকুল—যাঁহাদের পদধূলি লইয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আর কোথায় আমরা তাঁদেরই অধঃপতিত বংশধর! সে পবিত্র সনাতন ধৰ্ম্ম কি লোপ হইতে চলিল! দেখুন না চারিদিকে—নাস্তিকতা, অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামী—তাই ত লোকেদের এত পাপ, এত কষ্ট! দেখুন না সেই ধর্মপ্রাণ আৰ্য্যজাতির বংশধর এখন কিরূপ বিধৰ্ম্মী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে! যাঁহার নাম, গুণগান ও ধ্যানই জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল—তাঁহার নাম সমস্ত জীবনে ভক্তির সহিত একবার কয়জন লোক আজকাল ডাকে? মা, এসব দেখিলে এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাঁদে না, আপনার চক্ষে কি জল আসে না? সত্য সত্যই কি আপনার প্রাণ কাঁদে না—কখনই হইতে পারে না। মা'র প্রাণ ত কখনও নিষ্ঠুর হয় না!

মা, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি দুরবস্থা! পাপে, তাপে, সৰ্ব্বপ্রকার কষ্টে, অন্নাভাবে, ভালবাসার অভাবে—এবং হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং সৰ্ব্বোপরি ধৰ্ম্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডে অহোরাত্র জ্বলিতেছে। আর দেখুন, সেই পবিত্র সনাতন ধর্মের কি অবস্থা! দেখুন, সেই পবিত্র ধৰ্ম্ম এখন লোপ পাইতে চলিল। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম এখন কতদূর অধঃপতিত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তার উপর, আজকাল ধৰ্ম্মের নামেই যত অধৰ্ম্ম হইতেছে—তীর্থস্থানেই যত পাপ! দেখুন না পুরীর পাণ্ডাদের কি ভীষণ অবস্থা! ছি! ছি!! ছি!!! প্রাচীন কালের সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধুনিক কালের পাপী ব্রাহ্মণকে দেখুন! আজকাল যেখানে ধৰ্ম্মের নাম সেইখানেই যত ভণ্ডামী এবং যত অধৰ্ম্ম!

হায়! হায়!! আমাদের কি অবস্থা! আমাদের ধৰ্ম্মের কি অবস্থা!

মা, এসব কথা যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন কি আপনার প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলে না? আপনার প্রাণ কি কাঁদে না?

আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—দুঃখিনী ভারতমাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবে না?

মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব? আর কয়দিন আমরা পুতুল লইয়া খেলিতে থাকিব? দেশের ক্রন্দন কি আমাদের কর্ণে আসিতেছে না? আমাদের লুপ্তপ্রায় সনাতন ধৰ্ম্ম কাঁদিতেছে—তাহার ক্রন্দন কি প্রাণকে অস্থির করিতেছে না?

বসিয়া ২ আর কয়দিন দেশের এবং ধৰ্ম্মের এই অবস্থা দেখিব? আর বসা চলে না—আর ঘুমান চলে না—এখন নিদ্রাত্যাগ করিয়া কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কয়জন স্বার্থত্যাগী সন্তান মা-এর জন্য কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে?

৮৪ জনমের পর আমরা এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি—বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা প্রভৃতি পাইয়াছি কিন্তু এ সমস্ত পাইয়াও যদি পশুর ন্যায় আহার নিদ্রায় পরিতুষ্ট থাকি—পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করি—পশুর ন্যায় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি—পশুর ন্যায় যদি ধর্মহীন জীবন অতিবাহিত করি তবে কেন এই মনুষ্য জঠরে আমাদের জন্ম? পরের জন্য জীবনই প্রকৃত জীবন!

মা, এসব আপনাকে কেন লিখিতেছি—জানেন? আর কাহাকেই বা বলিব? কে বা শুনিবে? কে বা এ সমস্ত হৃদয়ে পোষণ করিবে? যাহাদের জীবন স্বার্থময়—তাহারা ত এ সমস্ত কথা ভাবিতে পারে না—বা

ভাবিবে না—কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে কিন্তু মার জীবন ত স্বার্থময় নহে! মা'র জীবন ত সন্তানদের জন্য—দেশের জন্য! যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন ত দেখিবেন কত কত মা, ভারত মাতার সেবার জন্য জীবনযাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রাণও দিয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ, দুর্গাবতী,—আর কত আছেন—আমার নাম মনে নাই।

আমরা মাতৃস্তন্যে পুষ্ট—সুতরাং মাতৃউপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না!

মা যদি সন্তানকে বলেন—"তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক"—তবে আর কি! বুঝিব সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ কলিযুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াছে—আর কিছুই নাই! আর কিছু হবে না! চারিদিকে নৈরাশ্য! যদি তাহাই হয়—যদি প্রকৃতই আর কোন উন্নতির আশা নাই—যদি বসিয়া ২ কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন? তবে যদি এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিব না—তবে এ জীবনে আর কাজ কি?

আশা করি ওখানকার কুশল। এখানে সব মঙ্গল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর দিবেন। এ পত্রের উত্তর দিবেন। ইতি—

আপনার চিরস্নেহাধীন
সেবক
সুভাষ

আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকিতে পারি!

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

রাঁচি
রবিবার

৮
পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু

মা,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—তাহার উত্তরও লিখিয়াছিলাম কিন্তু পরে যখন পড়িয়া দেখি যে আবেশের ঘোরে অনেক বাজে কথা লিখিয়াছি—তখন আর পাঠাইবার ইচ্ছা হইল না—তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমার এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখি না—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই। বিষয়কথাপূর্ণ পত্র আমার লিখিতে বা পড়িতে ভাল লাগে না—তাই আমার এইরূপ অভ্যাস—আমি চাই ভাবপূর্ণ পত্র। আমার পত্র লিখিবার ইচ্ছা না হইলে লিখি না আর যখন ইচ্ছা হয় তখন উপরি২ অনেক পত্র লিখি।

শারীরিক সুস্থতা জানান আমি অনেক সময়ে আবশ্যক মনে করি না—ভগবানের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিলে কোনও চিন্তা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আর যদিও কাহারও অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমরা কি করিতে পারি। আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে ইচ্ছামত কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারিব। তবে আর মিছে ভাবনা কেন? আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আছি তিনিই ত আমাদের রক্ষয়িত্রী—যখন ত্রিলোকধারিণী

বিশ্বজননী স্বয়ং আমাদের রক্ষয়িত্রী তখন এত চিন্তা এত ভয় কেন? অবিশ্বাসই দুঃখের এবং সর্বপ্রকার বিপদের কারণ কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে চাহে না—এবং মনে করে যে ইচ্ছা করিলে কাহাকে ভাল করিয়া দিতে পারে, হায় রে মূর্খতা!

মেসো মহাশয় ৮।৯ দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। তিনি খুব ডাব ভালবাসেন এবং বর্তমান অবস্থায় ডাব তাঁহার খুব উপকারী। কিছু কলিকাতার ভাল ডাব আনাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি বড় উপকৃত হন, তিনি এ বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলিয়াছেন।

এখানকার মঙ্গল জানিবেন। আপনারা সকলে ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। মেজদাদা কবে ফিরিবেন?

বোধহয় মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষার খবর বাহির হইবে। কতদূর সত্য জানি না—তবে শুনিয়াছি ইতিমধ্যে অনেকে নম্বর পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছে!

সেজ দিদিরা কি আসিবেন?

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য মনে দিনরাত ভয়ানক কষ্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়।

যদি মানুষজন্ম লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান—ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামী। এখন আর বাজে কথায় পর্যন্ত সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয় কেবল একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি আর সমস্ত রাত ধ্যান চিন্তা এবং পাঠে অতিবাহিত করি। দিনদিন যে আমরা যমমন্দিরের নিকটবর্তী হইতেছি, কবে আর আমরা সাধনা করিব আর কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শান্তিসুখ ও বিশ্রাম করিব। সে আনন্দময়কে না পাইলে কিছুতেই আনন্দ নাই। লোকে যে কি করিয়া টাকা, ধন-সম্পত্তি, বিষয় প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহাও আমার নিকট সময়ে সময়ে এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। যিনি আনন্দের নিধি তাঁহাকে বাদ দিলে যে আর কিছুতেই আনন্দ থাকে না। যিনি আনন্দের আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তবে ত আনন্দ পাইব।

যদি চৈতন্য না হয়—যদি ভগবদ্দর্শন না হয়—তবে সমস্ত জীবনটাই বৃথা গেল। পূজা, জপ, ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি আমরা যাহা করি—তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবদ্দর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সব বৃথা। যে একবার সেই অমৃতের খনি পাইয়াছে—সেআর সংসার-গরল পান করিতে যায় না।

তিনি আমাদের সংসার খেলনার দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে মায়াবদ্ধ জীব করিয়া ফেলিয়াছেন। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত—ছেলে খেলনা লইয়া খেলিতেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলে খেলনা দূরে ফেলিয়া 'মা মা' বলিয়া ব্যাকুলভাবে না ডাকে ততক্ষণ মা ছেলের কাছে আসে না। মা মনে করে—ছেলে ত খেলিতেছে আমি আর কেন যাইব। কিন্তু যখন ছেলের ক্রন্দনধ্বনি মা'র কানে বাজে তখন মা আর থাকিতে না পারিয়া দৌড়িয়া আসে। আমাদের বিশ্বজননী আমাদের লইয়া ঠিক সেইরূপ খেলিতেছেন। ভগবানে ষোল আনা মন না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—যদি ভগবানের চরণে দুই চার আনা মন দিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে বিষয়মধু-পানমত্ত লোকেরা ভগবানকে পায় না কেন? তাঁহাকে না পাইলে সব বৃথা—সব বৃথা—মানুষ জীবন এক বিড়ম্বনা—এক অসহ্য ভার।

আপনি কি বলেন?

তাঁকে না পেলে কি লইয়া দিন কাটাইব—কি লইয়া চিন্তা করিব—কাহার সহিত আলাপ করিব—এবং কোথা হইতে আনন্দ পাইব। যিনি সব বস্তুরই আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তাঁহার দর্শন লাভ করা চাই।

তাঁহাকে পাইতে হইলে—সাধনা চাই—ব্যাকুলভাবে ডাকা চাই—গভীর ধ্যান চাই—তাহা হইলে খুব শীঘ্র এমন কি ২।৩ বৎসরের ভিতর তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কেবল চেষ্টা করা চাই—পারি না পারি সে ইচ্ছা তাঁহার। কাজ আমার হাতে—কিন্তু ফলদাতা তিনি—ফল পাই না পাই—সে ইচ্ছা তাঁহার—তবে আমাদের কাজ করা চাই—চেষ্টা করা চাই। যে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে—তাহাকে আর কাজও করিতে হয় না—সাধনাও করিতে হয় না বা চেষ্টাও করিতে হয় না। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

ওঁ

রাঁচি
সোমবার (১২১৩)

৯

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু

মা,

আপনার পত্র কাল পাইয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। মাসিমার অসুস্থতার জন্য আমাদিগকে এখানে এতদিন বসিয়া থাকিতে হইল। এখন তিনি ভাল আছেন—আর আকাশটাও বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। আমরা কাল রওনা হইব পরশু ভোরে কলিকাতায় পঁহুছিব।

আমরা সকলে ভাল আছি।

আমি যে ২০ টাকা বৃত্তি পাইব তাহা পরীক্ষার বহু পূর্ব হইতে আশা করিয়াছিলাম এবং একরূপ স্থিররূপেই জানিতাম। ইহার কারণ আমি এর জন্য কামনা করিয়াছিলাম—কামনা করিয়াছিলাম আমার জন্য নহে কারণ আমার আবার টাকার প্রয়োজন কেন—আমি টাকাকে বড় ভয় করি কারণ টাকাই যত অনর্থের কারণ। আমার কামনাটা নিজের জন্য নহে—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—বৃত্তির একটি পয়সাও আমার জন্য ব্যয় করিব না—সমস্তটা পরার্থে ব্যয় করিব—এবং আমি আশা করি যে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তবে এত উঁচু স্থান আমি কি করিয়া পাইলাম তাহা আমি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। পরীক্ষার পূর্বে এক প্রকার পড়ি নাই বলিলে চলে—আর বহু পূর্ব হইতে লেখাপড়া কম করিয়াছিলাম। আমি স্থির জানি—আমি এ স্থানের উপযুক্ত নহি—আমার বিশ্বাস ছিল আমি সপ্তম হইব। আমি যদি না পড়িয়া এ স্থান পাই তবে যাহারা লেখাপড়াকে উপাস্য দেবতা মনে করিয়া তজ্জন্য প্রাণপাত করে তাহাদের কি অবস্থা হয়? তবে প্রথম হই আর লাস্ট হই আমি স্থিররূপে বুঝিয়াছি লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলে ছাত্রেরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয়? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে—আর কার কিরূপ উন্নত চরিত্র তাহা কার্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই-পড়া বিদ্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা

করি। আমি চাই চরিত্র—জ্ঞান—কার্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব যায় ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রেম,—ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা—সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা ত অতি তুচ্ছ সামান্য জিনিস—কিন্তু হায়! কত লোকে তাহা লইয়া কত অহংকার করিয়া থাকে!

কটকে পড়িলে কতকগুলি সুবিধা আছে আর কলিকাতায় পড়িলেও কতকগুলি সুবিধা আছে। কোথায় পড়িব তাহা ঠিক করিতে পারি নাই—কলিকাতায় গিয়া স্থির করিব। তবে বোধ হয় প্রেসিডেন্সীতে পড়া হইবে না—কারণ আমি যাহা পড়িতে চাই—সেখানে তার সুবিধা হইবে না। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

পরিশিষ্ট-৩

সুভাষচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধের সময় অশৌচ চলাকালীন লেখা

৺জানকীনাথ বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত
সুভাষচন্দ্র বসু

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অনতিদূরে কোদালিয়া গ্রামে ৺জানকীনাথ বসুর জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃদেবী ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। কলিকাতার এলবার্ট স্কুল (Albert School) হইতে এন্ট্রান্স (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি St. Xavier's ও General Assembly কলেজে কিছুকাল পড়িয়া, অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত কটকে যান। বৃত্তি পাইয়া, কৃতিত্বের সহিত তিনি কটক Ravenshaw কলেজ হইতে এফ এ ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং কটক কলেজে তিনি অধ্যাপক গিরীশচন্দ্র বসু ও ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। বি, এ উপাধি লাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন—আইন পরীক্ষা দিবার জন্য—এবং সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণবিহরী সেন, সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সৌজন্যে তিনি এলবার্ট কলেজে কিছুকাল অধ্যাপকতা করেন এবং তাহার পর প্রায় ৯ মাস চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে হাই-স্কুলের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রবল অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটবর্তী বরানগরের অধিবাসী ৺কাশীনাথ দত্তের পৌত্রী ও ৺গঙ্গানারায়ণ দত্তের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মেট্রোপলিটান (Metropolitan) কলেজ হইতে বি, এল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি পুনরায় কটক যান এবং তদানীন্তন গভর্মেন্ট প্লীডার (Government Pleader) ৺রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের সাহায্যে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ওকালতীতে তাঁহার বিশেষ পসার ও প্রতিপত্তি হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার পিতা হরনাথ বসু মহাশয় পরলোকগমন করেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে—তিনি কটকের পাবলিক প্রসিকিউটর (Public Prosecutor) নিযুক্ত হন। রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসুর দেহত্যাগের পর—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্নমেন্ট প্লীডার নিযুক্ত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি কটক মিউনিসিপ্যালিটির (Municipality) সর্বপ্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান (Chairman) নির্বাচিত হন। তারপর, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Council) অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন এবং সেই বৎসরই রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Circuit Court-এর 'গভর্ণমেন্ট প্লীডার' নিযুক্ত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি গভর্ণমেন্ট প্লীডার পদ ত্যাগ করেন এবং প্রায় ১৩ বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সরকারের দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি রায়বাহাদুর উপাধি ত্যাগ করেন।

জানকীনাথের কর্মজীবন উড়িষ্যার অতিবাহিত হয়। সেখানকার যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দরিদ্র স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা নিয়মিতভাবে মাসের

পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। দরিদ্র প্রতিবেশী ও দুঃস্থ পরিবার মাত্র সবসময়ে তাঁহার সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়া থাকিত এবং কেহ কখনও নিরাশ হইত না। প্রতি রবিবার তাঁহার বসতবাটীতে কাঙ্গালী বিদায় হইত। উড়িষ্যা ও উড়িষ্যাবাসীর প্রতি কর্তব্য করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। নিজের গ্রামের প্রতিও তাঁহার প্রবল টান ছিল। দরিদ্র আত্মীয় স্বজন, এমন কি দরিদ্র গ্রামবাসীমাত্রই, প্রয়োজন ও বিপদের সময়ে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতেন। প্রতি বৎসর কোদালিয়া গ্রামে তিনি মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই উপলক্ষে বৎসরান্তে সমস্ত গ্রামবাসীর সহিত মিলন সুখ উপভোগ করিতেন। গ্রামবাসীর উপকার ও সেবার জন্য তিনি তাঁহার মাতার ও পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে কামিনী দাতব্য ঔষধালয় ও হরনাথ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জানকীনাথ চিরকাল কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগী ছিলেন যে সময়ে তিনি 'গভর্ণমেন্ট প্লীডার' ছিলেন সে সময়েও তিনি নিয়মিতরূপে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতেন এবং এই ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষদের অসন্তোষ সহিতে হইত। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের সহায়তা সাধ্যমত করিতেন। তিনি খদ্দরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং সর্বপ্রকার স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার করিতেন ও সর্ববিষয়ে স্বদেশী সমর্থন করিতেন। উড়িষ্যার সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়—ঁ গোপবন্ধু দাশ প্রতিষ্ঠিত 'সত্যবাদী' বিদ্যালয়ের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। এতাদ্ব্যতীত তাঁহার পুত্রেরা কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেন।

জানকীনাথ চিরকাল ধার্মিকচিত্ত ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি কটকের Thesophical Lodge-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের ৺পণ্ডিত শ্যামনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তিনি সস্ত্রীক প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম গুরুর স্বর্গপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর তিনি পুনরায় সস্ত্রীক হিমাইতপুরের ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সৎ-সঙ্গে' যোগদান করেন এবং সেইখানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি আরও বলবতী হইয়াছিল। তাঁহার কর্মবহুল ও সংগ্রামরত জীবনে ধর্মের প্রেরণাই ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় সহায় ও শক্তির উৎস। যৌবনে তাঁহাকে সাংসারিক অভাবের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টা ও ভগবদ বিশ্বাসের বলেই তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন আত্মীয় স্বজনের অকল প্রয়াণে তিনি উপর্যুপরি আঘাত পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার গভীর ভগবদ বিশ্বাসই তাঁহাকে অটল রাখিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্র যখন সরকারী পদ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই—বরং সারাজীবন পুত্রদের কল্যাণকর প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে যুগপৎ দুইপ্রকার বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল—একদিকে জামাতা, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়ের অকাল প্রয়াণ এবং অপর দিকে তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান শরৎচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্রের কারাযন্ত্রণা ভোগ। কিন্তু এসব দুঃখ-শোকের মধ্যেও তিনি বীরের মত অটল ছিলেন এবং মুহূর্তের জন্যও অন্তরের ভগবদ বিশ্বাস হারান নাই।

জানকীনাথ স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। নিজের সাধনার বলে তিনি সংসারে উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তিনি চাইতেন যে তাঁহার পুত্রেরাও স্বাবলম্বী হউক। তিনি পুত্রদের জন্য সাধ্যমত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কখনও তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব করিতে চাইতেন না। তিনি বিশাল-হৃদয় ছিলেন। দীন দুঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদা কাঁদিত। তাঁহার পরলোকগমনের পূর্বেই তিনি তাঁহার পুরাতন ভৃত্যদের জন্য এবং পরিচিত বহু দীনদুঃখীর জন্য নিয়মিত সাহায্য বা পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দানের বিষয়ে তিনি যেরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ গোপনতা ভালবাসিতেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন ও সত্যকে ভালবাসিতেন। তিনি অন্তরের সঙ্গে অসৎকর্ম, অসৎচিন্তা ও অসৎ উপায় ঘৃণা করিতেন। তিনি অপরের নিকট প্রাপ্ত উপকার সর্বদা

স্মরণ রাখিতেন ও তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিতেন—কিন্তু অপরের কৃত অপকার বা অনিষ্ট কখনও মনে রাখিতেন না। পরের নিন্দা তাঁহার মুখে কখনও শোনা যাইত না এবং পরশ্রীকাতরতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্য পরিজন, ধনী দরিদ্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ—কেহ কখনও তাঁহার মুখে রূঢ় কথা শুনিতে পাইত না। তিনি পুত্ররূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে, বিশাল পরিবারের কর্তারূপে, মানুষরূপে—যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিরল। এবং পরিবারবর্গের প্রতি, গ্রামের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি—তিনি যে ভাবে নিজ কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন—এবং সত্য ও ধর্মকে ভিত্তি করিয়া যে ভাবে স্বীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সকলের অনুকরণীয়।

পরিশিষ্ট-৪

জানকীনাথ-প্রভাবতীদেবী পরিবার ঘনিষ্ঠ
পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণা

জানকীনাথ বসু—জীবন ও আদর্শ

—পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী

কলিকাতা মহানগরীর কিছু দক্ষিণে পাশাপাশি দুইটি গ্রাম—কোদালিয়া ও হরিনাভি। বসু পরিবারের পুরুষানুক্রমে বাস ছিল কোদালিয়া গ্রামে আর আমার প্রপিতামহ ও পিতামহেরা হরিনাভিতে বাস করিতেন। ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী হইলেও দুইটি পরিবারের মধ্যে অতি মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বসুগৃহে দুর্গোৎসব ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতেন আমাদের পিতামহঠাকুর স্বর্গীয় শ্যামানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ। কিংবদন্তী আছে যে, একবছর মহাপূজার কোন একদিন প্রভাতে যথারীতি দেবীর পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি সমাপন করিয়া পুরোহিত মহাশয় গ্রামান্তরে চলিয়া যান। বলিয়া যান যে, ভোগ প্রস্তুত হইলে ফিরিয়া আসিবেন ও দেবীকে উহা নিবেদন করিবেন। কিন্তু বেলা বাড়িল, ভোগের সময় অতিক্রম হইয়া যায়, তবু পূজারীর দেখা নাই। ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সন্ধানে লোক চলিল। অবশেষে এক চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার দর্শন পাওয়া গেল। কিন্তু ভোগ নিবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া মাত্র তিনি উত্তর করিলেন—'আমার আর যাইবার প্রয়োজন নাই, দেবীর ভোগ, আরতি সবই ত' আমি শেষ করিয়া আসিয়াছি।' পুরোহিত মহাশয় আর ফিরিয়া আসিলেন না এবং বলা বাহুল্য যে, যজমানকে অন্য পূজারীর ব্যবস্থা করিতে হইল। প্রচার হইল যে, ঠাকুর মহাশয় উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। অল্প কয়েক জন সেকালের লোক, যাঁরা আজও জীবিত আছেন তাঁহারা শ্যামানাথকে উন্মত্ত ঠাকুর বলিয়াই জানেন।

এই ঘটনার পর অনেকেই আমার পিতামহের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন ও ইহার কিছুকাল পরে তিন যখন কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস স্থাপন করিলেন তখন এ মহানগরীর বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। জানকীনাথ ও তাঁহার সহধর্মিণী প্রভাবতীও তাঁহার উদাত্ত মহান চরিত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকেই গুরুর আসনে বরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৯১২ সালের প্রথম ভাগে এই দীক্ষা উৎসব উপলক্ষে পিতামহদেব কটকে জানকীনাথের বাসভবনে আসেন ও বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন।

এই সময় সুভাষচন্দ্র আমার পিতামহের সান্নিধ্যে আসেন। সুভাষচন্দ্রের মুখেই শুনিয়াছি যে পিতামহের আলোচনা ও উপদেশে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে কোন সন্ন্যাসীকেই তিনি গুরুরূপে বরণ করিবেন, গৃহীকে নহে। বোধহয় এই কারণেই তিনি নিজ জনকজননীর গুরুদেবকে নিজেরও গুরুরূপে মনোনয়ন করেন নাই।

সেই উৎসবে আমিও পিতামহীর সঙ্গে কটকে গিয়াছিলাম ও কিছুদিন সেখানে ছিলাম। তখন আমি চার বৎসরের বালক। তথাপি সেই দীর্ঘকায়, সৌম্য, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বলকান্তি মানুষটির ব্যক্তিত্ব আমার শিশুমনে ছায়াপাত করিয়াছিল।

অল্পকাল পরে ঐ বৎসরই আমার পিতামহ স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার অবর্তমানে পিতামহী মোক্ষদাদেবী ও তাঁহার দুই পুত্র অমরনাথ ও পশুপতিনাথকে বসুদম্পতী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণে রাখিয়াছিলেন। যদিও

পিতামহের লোকান্তর গমনের কয়েক বছর পরে তাঁহারা দুইজনে পাবনার সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকট দ্বিতীয়বার দীক্ষা লন তথাপি উন্মত্ত ঠাকুরের পরিবারের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সম্পর্কটি আজীবন অটুট ছিল। যখনই কার্যবশে জানকীনাথ কলিকাতায় আসিতেন তখনই সস্ত্রীক আমাদের গৃহে আসিয়া থাকিতেন ও প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। আমাদের পরিবারের কুশল সম্পর্কে তাঁহাদের অনলস দৃষ্টি ছিল। ডাঃ চুনীলাল বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসুর পত্নী ছিলেন জানকীনাথের শ্যালিকা। আমাদের বাগবাজারের বাড়ীর পাশেই ডাক্তারবাবুদের বাসভবন। ছিল। বসু পত্নী নিয়মিত আমাদের বাড়ী আসিতেন—মাতামহী ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। কেবল সেই অতীতেই নহে—বংশপরম্পরাক্রমে আজও সে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন আছে। তাঁহাদের পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী সকলেরই এই ধারণা যে উন্মত্ত ঠাকুরের পরিবারের সকলে তাঁহাদের আপনজন—জানকীনাথ ও প্রভাবতীর গুরুপরিবারভুক্ত।

আমি যখন আই-এ ক্লাশের ছাত্র, সে সময় ১৯২৬ সালে এক বন্ধুর সঙ্গে পুরীধামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। জানকীনাথ তখন সপরিবারে পুরীর বাসভবনে ছিলেন। সুতরাং আমার যৌবন বয়সে তাঁহার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হইল। আমি দিন পনেরো পুরীতে ছিলাম। প্রায় প্রতিদিনই সমুদ্রের ধারে বেড়াইবার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত ও নানা আলাপ আলোচনা চলিত। সেই অবসরে তাঁহার শাণিত বুদ্ধিমত্তা, উদার চরিত্র এবং সর্বোপরি স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় লাভ করিয়া বিস্ময় অনুভব করিয়াছি।

দুই বৎসর পরে আমাদের পরিবারে এক নিদারুণ বিপদ ঘটে। ১৯২৫ সালে জ্যেষ্ঠতাত অমরনাথ অকালে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন—১৯২৮ সালে পিতৃদেব পশুপতিনাথ মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠতাতপুত্র অশোকনাথ তখন সবেমাত্র এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং আমি বি.এ ক্লাশের ছাত্র। পিতার অকাল প্রয়াণের সংবাদ শুনিবামাত্র জানকীনাথ কটক হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসেন এবং সে বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের দুর্দিনে অভিভাবকহীন পুত্রদের শিক্ষাব্যাপারে যাহাতে বাধা না পড়ে এজন্য সাহায্যহস্ত প্রসারিত করেন। তাঁহার সেদিনের সে বদান্যতার কথা আমাদের এ পরিবার কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। তিনি যথার্থই তাঁহার গুরুপরিবারের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

১৯৩২ সালের মে-জুন মাসে আমার জীবনে পুনরায় জানকীনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আসিল। গ্রীষ্মাবকাশে আমি সপরিবারে পুরীধামে গিয়াছিলাম। সে সময়ে জানকীনাথ সস্ত্রীক পুরীর বাসভবনেই বাস করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের বাড়ীর সন্মুখের ভবনেই আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অল্প কয়েকদিন পর পরিবারস্থ অন্য সকলে কলিকাতায় চলিয়া আসেন—আমি কিন্তু সেখানে মাসাধিককাল থাকিয়া যাই। প্রতিদিনই সমুদ্রে আসা-যাওয়ার পথে দুই বেলা তাঁহাদের গৃহে যাইতাম। তাঁহাদের পাশের বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। জানকীনাথের সহিত আমি নিয়মিতভাবেই সেখানে উপস্থিত থাকিতাম। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলেও শ্রোতাদের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিত। সভায় নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইত এবং জানকীনাথ সাগ্রহে তাহাতে যোগ দিতেন। সেইদিনগুলির কথা আমি আজও স্মরণ করি। তিনি সে সব প্রশ্নের আলোচনা মুখে যেরূপ আন্তরিকভাবে নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করিতেন তাহাতে তাঁহার মননশক্তির গভীরতা প্রতিফলিত হইত। কোন কোন দিন সভার পূর্বে আমাকে লইয়া সমুদ্রের তীরে বেড়াইতেন ও বিশেষভাবে ধর্মীয় কথাপ্রসঙ্গ তুলিতেন। তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি ও ভগবদবিশ্বাস যে কত গভীর ছিল এই অবসরে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি।

জানকীনাথ এই নেতাজী ভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি যখন রোগশয্যায় শায়িত তখন প্রতিদিন অপরাহ্নে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিছু সৎকথা শুনাইবার ভার পড়িয়াছিল আমার উপর। লক্ষ্য করিয়াছি যে তিনি কত আগ্রহে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেন ও আমাকে দেখিয়া কতই না খুশী হইতেন।

১৮৬০ সালে কোদালিয়া গ্রামে জানকীনাথের জন্ম হয়। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। তাঁহার শিক্ষাজীবনের প্রথম স্তর কলিকাতাতেই অতিবাহিত হয়। কলিকাতার এলবার্ট স্কুল হইতে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন কলিকাতাতে St. Xavier's কলেজে ও General Assembly কলেজে পড়িবার পর কটকে চলিয়া যান ও কটকের Ravenshaw কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এফ. এ ও বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি আইন পড়িবার জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় প্রবল অর্থাভাবের জন্য তিনি কিছুকাল এলবার্ট কলেজে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন ও তারপর অল্প কিছুদিন চব্বিশ পরগণার জয়নগর গ্রামে হাইস্কুলের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করেন। ১৮৮০ সালে বরানগরের কাশীনাথ দত্তের পৌত্রী ও গঙ্গানারায়ণ দত্তের কন্যা প্রভাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪ সালে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কটকে ফিরিয়া যান ও গভর্মেন্ট প্লীডার রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসুর আনুকূল্যে কিছুদিনের মধ্যে ওকালতীতেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি ১৯০১ সালে কটকের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং চার বৎসর পর ১৯০৫ সলে গভর্মেন্ট প্লীডার নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে তিনি Circuit Court এর গভর্মেন্ট প্লীডার হন কিন্তু পরবৎসরই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটে-এর সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় ঐ পদ ত্যাগ করেন।

১৯০১ সালে তিনিই কটক মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯১২ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। এই বৎসরই বৃটিশ সরকার তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন—কিন্তু ১৭ বৎসর পরে ১৯৩০ সালে সরকারের দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি সে উপাধি বর্জন করেন।

যৌবনে জানকীনাথকে অত্যন্ত অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, বোধহয় এই কারণেই দুঃখীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবাকে তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। কৃতী ব্যবহারজীবিরূপে তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা মুক্ত হস্তে দান তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব। উড়িষ্যার অনেক জনহিতকর আন্দোলনে ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁহার অকৃপণ অবদান ছিল। দরিদ্র ছাত্র, দরিদ্র প্রতিবেশী সকলকেই তিনি নিয়মিতভাবে অকাতরে সাহায্য করিতেন।

তাঁহার কর্মজীবন উড়িষ্যাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তথাপি কেবল উড়িষ্যার জনগণই তাঁহার অসীম করুণার পাত্র হয় নাই, আপন গ্রামবাসীরাও কখনও তাঁহার কৃপাদৃষ্টি বঞ্চিত হয় না। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিজগ্রামে আসিতেন ও সেই অবসরে গ্রামবাসীদের অভিযোগের প্রতি অবহিত হইবার সুযোগ হইত। সেখানেও প্রতিটি দুঃস্থ আত্মীয় পরিবার, দরিদ্র গ্রামবাসী বিপদের সময় তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। গ্রামবাসীদের কল্যাণে তিনি দাতব্য ঔষধালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন—প্রথমটি আজিও তাঁহার মাতা কামিনীদেবীর স্মৃতি বহন করিতেছে এবং দ্বিতীয়টি পিতার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

আত্মবলে বলীয়ান, সত্যপ্রেমিক ও ভগবদ্বিশ্বাসী ও নির্ভীক, জানকীনাথ ছিলেন সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে। তাঁহার আট পুত্র—প্রত্যেককেই সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে বিদেশে পাঠাইতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। শোনা যায়, যে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার দুই পুত্র সতীশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র যখন দেশে ফিরিলেন তখন মহানগরীর কায়স্থ সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। সে সময় তাঁহার গুরুদেব উন্মত্ত ঠাকুর ঐ সমাজের নেত্রীবর্গকে নিজগৃহে আনিয়া শিষ্য জানকীনাথের সহিত একত্রে প্রসাদ গ্রহণ করাইয়া সমাজচ্যুতির সম্ভাবনাকে নির্মূল করেন।

জানকীনাথ মনে প্রাণে দেশকে ভালবাসিতেন এবং পুত্রেরা স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। পুত্রেরা আন্দোলনে জড়িত থাকায় তাঁহাদের পরিবারে বারে

বারে বিপত্তি আসিয়াছে কিন্তু নিদারুণ বিপর্যয়ের আবর্তে পড়িয়াও তিনি নিজ নিজ আদর্শে অটল ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার সহধর্মিণী প্রভাবতীর কথাও স্মরণীয়। সেই তেজস্বিনী মহীয়সী রমণী সর্বদা তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে জীবন সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন অতি কোমল হৃদয়া অন্য দিকে তেমনি অপরিসীম সহনশীলতার আধার ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে শাসকশ্রেণীর হস্তে সন্তানদের অবর্ণনীয় নির্যাতন মাতৃহৃদয়কে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নাই—শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের বারংবার কারাবরণও নীরবে অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করিয়া জানকীনাথ ও প্রভাবতী আজীবন নিজকর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

আজ জানকীনাথের ১২৫তম জন্মতিথি উৎসবে সর্বশেষে এই কথাই বলি যে তিনি একটি আদর্শ হিন্দুপরিবারের স্রষ্টা, ধারক ও বাহক ছিলেন এবং অবিচল কর্ম নিষ্ঠার বলে তদানীন্তন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—

"তিনি পুত্ররূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে, বিশাল পরিবারের কর্তারূপে, মানুষরূপে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিরল এবং পরিবারবর্গের প্রতি, গ্রামের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি—তিনি যেভাবে নিজ কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন—এবং সত্য ও ধর্মকে ভিত্তি করিয়া যেভাবে স্বীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সকলের অনুকরণীয়।"

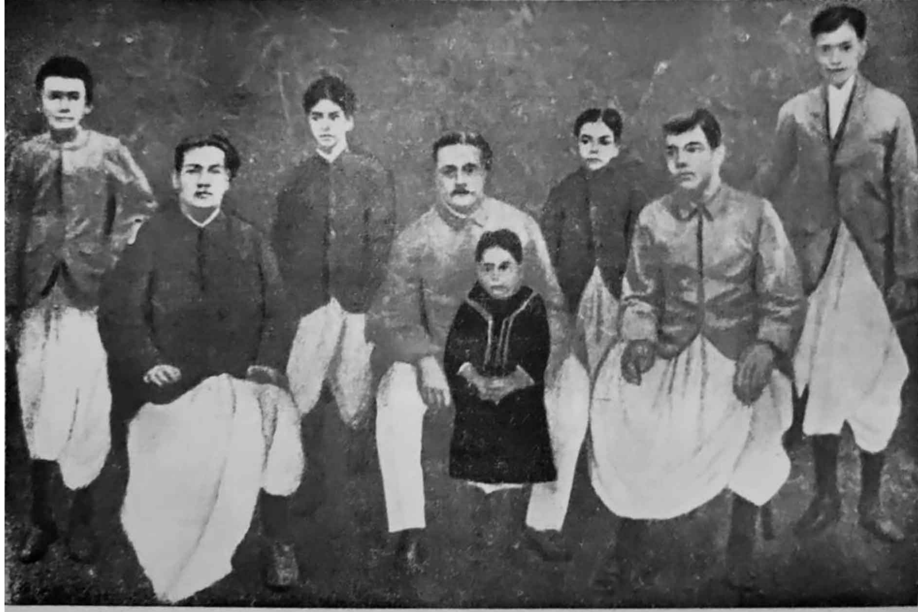
* ৺জানকীনাথ বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাজী ভবনে ৯ জুন ১৯৮৫তে প্রদত্ত ভাষণ।



সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী



সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ বসু



১৯০২ সালে কটকের বাগান বাড়ীতে। বাঁদিক থেকে সুধীরচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র, জানকীনাথ বসু, সুভাষচন্দ্র (৫ বছর বয়স), শরৎচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র



কটক এর বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের জন্ম কক্ষে লেখক

23 Saturday [23—342]
Beng.—11 MAGH. *Fuslee.*—5 MAGH. *Samvat.*—5 MAGH (BUDEE).
Mus.—18 SHABUN.

Arose early but found Prabha was
still suffering – A son was born at midday.
Prabha felt very ill – but thank God she
somehow got through

83

১৮৯৭ সালে জানুয়ারি মাসের ডায়ারীর পাতায় জানকীনাথ বসুর লেখা



শৈশবের সুভাষ। একটি দুর্লভ আলোকচিত্র



সুভাষ চন্দ্রের ধাত্রীমাতা সারদা



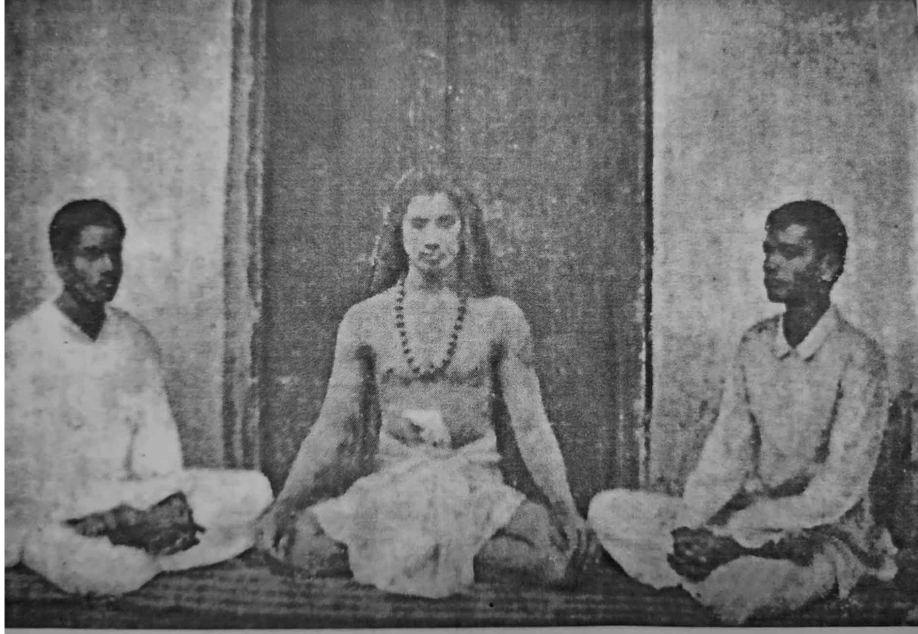
কিশোর সুভাষ পরিবারের সবার সঙ্গে।



কটকে কিশোরবেলা- বন্ধুদের সঙ্গে সুভাষ



মা জননী প্রভাবতী দেবীর সুবি


সন্ন্যাসী ইন্দ্রনাথ বাবাজীর সঙ্গে হেমন্তকুমার ও সুভাষচন্দ্র

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়—

[illegible]
[illegible]

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী—
শ্রীচরণকমলেষু—

মা,
অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। দাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। [illegible] পরীক্ষা দেওয়া [illegible] না।

ভগবানের দয়ার অন্ত নাই— দেখিতে গেলে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া? দুঃখে পড়িলে তাঁহাকে ডাকি — অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি — কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল — যেই সুখের আলোক আমাদের লাগিল — অমনি আমাদের ভাব [illegible]।

পরম পূজনীয়া মাতা ঠাকুরানীর কে কিশোর সুভাষ



সুভাষচন্দ্রের পরম পূজনীয়া মাতা ঠাকুরানী প্রভাবতী দেবী



কটকে বসু বাড়ির প্রাঙ্গণে দুর্গা মন্দির



ঐতিহাসিক প্রাচীন দুর্গা দালানের ডানদিকের শেষ প্রান্তের ঘরটি
প্রভাবতী দেবীর বিষ্ণু ঘর বলে পরিচিত

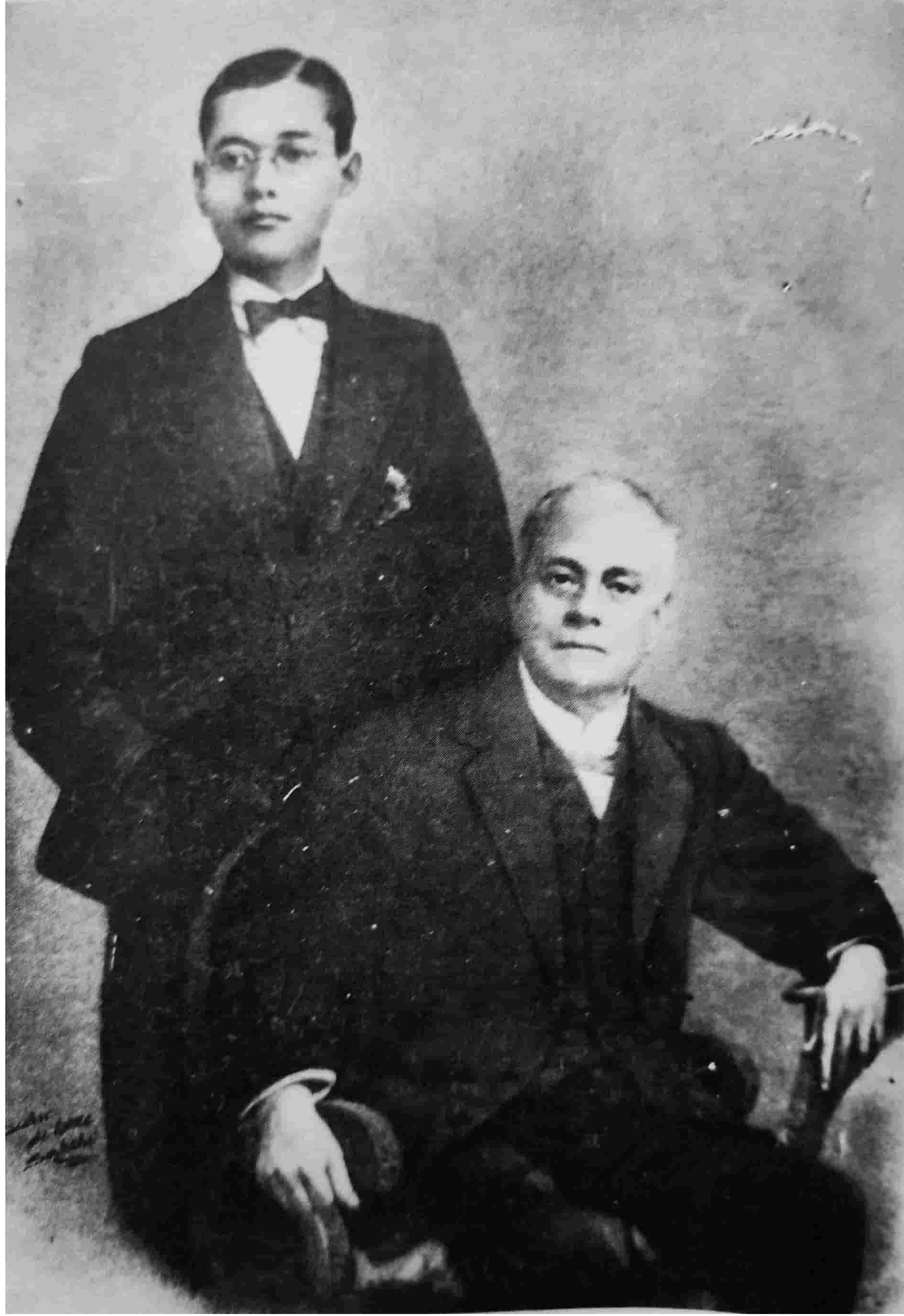
শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—

কটক
রবিবার

পরমপূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী—
শ্রীচরণকমলেষু—

মা,
ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই — তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যা চাও সবই আছে — প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্ত কাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি — স্বচ্ছসলিলা, পূণ্যতোয়া গোদাবরী — দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে — কি পবিত্র নদী!। দেখিবা মাত্র বা ভাবিবা মাত্র

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের দেশ-মাকে লেখা কিশোর সুভাষ চন্দ্রের পত্র



পিতা পুত্র



স্কটিশ চার্চ কলেজ এর ছাত্র। সামরিক ট্রেনিং নেওয়ার সময় সতীর্থদের সঙ্গে কলকাতার ব্রিটিশ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামে। (বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় সুভাষ)

Cuttack
12.12.21

My dear Sarat

He are proud of Subhas and proud of you all. I am not at all sorry as I believe in the doctrine of sacrifice in fact I was expecting it almost daily.

Your mother has taken the incident in a bold spirit and thinks that such sacrifice will ultimately lead to Swaraj.

Please convey to dear Subhas our heartfelt blessings.

We came back from Khurda last night and are pretty well.

Trust this will find you all in good health.

Yours ever affly
Janakinath

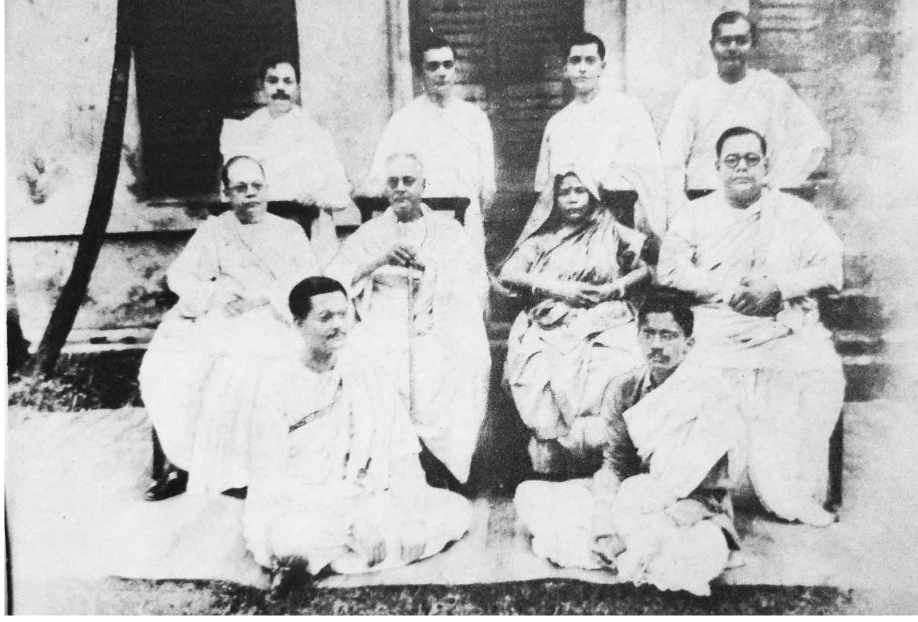
কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের প্রথম গ্রেপ্তার সংবাদে জানকীনাথ বসুর পত্র শরৎ বসুকে



১৯২৮ সালে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জি.ও.সি সুভাষচন্দ্র, আগামীর নেতাজি



১৯৩১ সালে মা বাবা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র



দাদাভাই ও মা জননী - পরিবারের সঙ্গে ডানদিকে দাঁড়িয়ে



দাদা ভাই-জানকীনাথ

আমার স্নেহের গীতু
জানি এ মধুমিলন
আশাতীত জানি
আশীর্বাদ —
মা এবং বাবা দুজনে
সর্বদা আনন্দে ও প্রেমে

তোমার দাদাভাই
(শ্রী জানকীনাথ বসু)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

স্নেহের গীতা রানী আমার

তোমার মাতা তোমার
জগৎ জননী জানবে
সেবা ও ভক্তির পূজা
করিলে বিশ্ব জননীর পূজা
করা হইবে।

ইতি তোমার নিত্য
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী মা জননী

দাদা ভাই জানকীনাথ ও মা জননী প্রভাবতী দেবীর স্বহস্তে লিখিত
আশীর্বাণী নাতনি গীতা বসুকে



জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবী
(নেতাজি তদন্তে নিয়োজিত মুখার্জী কমিশন ফৈজাবাদে ভগবানজির কক্ষে এই ছবিটিও খুঁজে পেয়েছিলেন)



প্রথম গুরুদেব শ্যামা নাথ ঠাকুরের ছবি এলগিন রোডে নেতাজির মা প্রভাবতী দেবীর শয়নকক্ষের উওর দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে, পূর্ব দেওয়ালে আছে ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের ছবি।

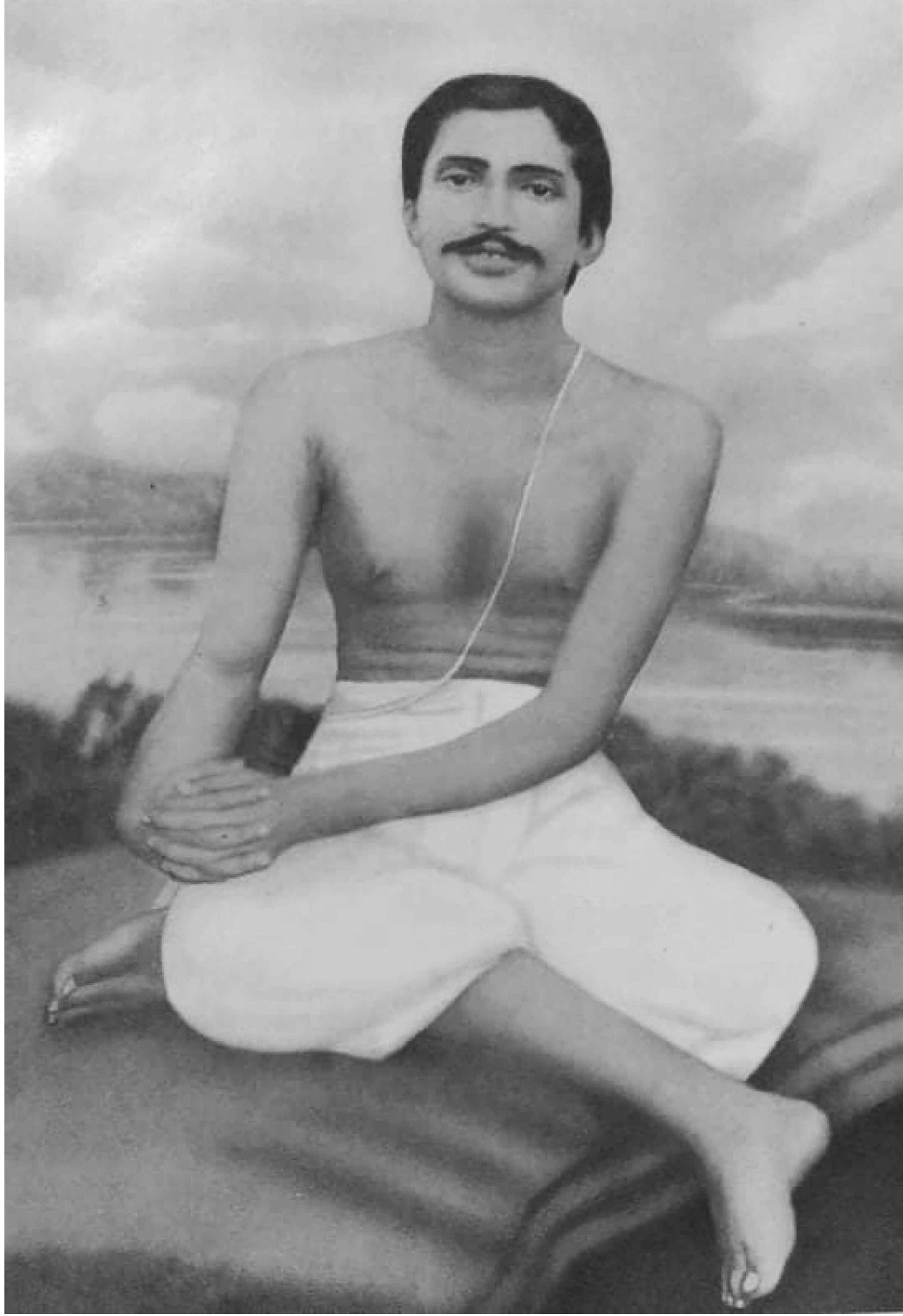


আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী





পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী
নেতাজির বাড়ির ধর্মে-কর্মে একান্ত পারিবারিক বন্ধু এই দু'জন



প্রথম দীক্ষাগুরুর প্রয়াণের পর নেতাজীর মা-বাবা ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের দীক্ষা নেন



নেতাজি ভবনে নেতাজির মায়ের ঘরে অনুকুল চন্দ্রের ছবি

একটি স্মৃতিচিত্র

DEPUTY SPEAKER
LEGISLATIVE ASSEMBLY
WEST BENGAL CALCUTTA

১৪/[illegible]/৮১

সেটা [illegible] ১৯৪২ সাল। সবে [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। আমি একটি নতুন [illegible]
[illegible]

[illegible]



DEPUTY SPEAKER
LEGISLATIVE ASSEMBLY
WEST BENGAL CALCUTTA

নেতাজী-জননী সেই তেজস্বী মহিয়সীর শেষ চিঠি
যত্নে রেখেছিলাম, সে অমূল্য চিঠিটি কোথায়
চলে গেছে জানি না; কিন্তু এ ঘটনাটি আমার
মনের গভীরে এমন দাগ কেটে রেখেছে যা
কখনও ভুলতে পারি না।

শ্রীহরিদাস মিত্র

হরিদাস মিত্রের স্মৃতিচারণায় নেতাজির মা

c/o D.I.G., I.B., C.I.D. Bengal
Lord Sinha Road
Calcutta

শ্রীচরণেষু

Supr. Yerarda Central [illegible]

মা, পাঠিয়েছিলাম একখানা চিঠি আপনার পায়ের
ধুলো নিতে পারব — কিন্তু তা আর হল না। [illegible]
আপনার কোনও খবর নেই। আমি গত মে ১০ই পর্যন্ত
জ্বর-সহ আবার পেটের রোগে ছিলাম। সেখান
থেকে ১০ই তারিখ এখানে এসেছি। যেদিন
মহাত্মা গান্ধীর [illegible] হয়েছিল সেই খবরটাও
আমি আজও পাইনি। এখন এখানে আছি ভাল।
[illegible] দেন, তাহলে আমি [illegible] [illegible]
দিতাম। [illegible] শরীর এখন কেমন? [illegible]
নিজের শরীর কেমন চলছে? আমার [illegible]
প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
সুভাষ
(Subhas C Bose)

যেরবেদা সেন্ট্রাল জেল
পুনা
১৭/৪/৩৩

Sd. 21/4

To
Srijukta Basanti Debi
5 Nafar Kundu Road
Kalighat P.O.
Calcutta

জেল থেকে বাসন্তী দেবী কে দেওয়া পত্র

মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ এই যে মানুষ একটা আদর্শের জন্য বাঁচতে পারে এবং প্রয়োজন হলে মরতেও পারে, কিন্তু পশু বাঁচে কেবল জীবনধারণের জন্য। যখন চারিদিকে দেখি যে অধিকাংশ মানুষ, পশুর মত, কেবল জীবনধারণের জন্য বেঁচে আছে, তখন মনে হয় যে তাহাদের মনুষ্যজীবন-লাভ একেবারে ব্যর্থ। যদি নিজের জীবন সার্থক করতে চাও, তা হলে গতানুগতিক পন্থা ছেড়ে নূতন পথ ধর।

নারীর জীবনের মূল্য পুরুষের জীবনের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এবং নারীজীবনের উদ্দেশ্য কেবল রন্ধন ও সন্তান উৎপাদন নয়। নারীও একটা আদর্শের আশ্রয় নিয়ে নিজের জীবন সার্থক করে তুলতে পারে। তা যদি করতে পারো, তা হলেই আমি সুখী হব এবং তোমার খাতার পাতা সার্থক হবে।

তোমার রাঙাকাকাবাবু
(শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু)

ভাইঝি গীতা বসুর খাতায় সুভাষ চন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত নারী মুক্তি প্রসঙ্গ

৩৮/[illegible]
২৪ ভাদ্র
কটক
সোমবার

শ্রীশ্রী কালীমাতা সহায় —

প্রাণাধিক সুভাষ
কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষ চন্দ্র বাবাজীউ
দীর্ঘজীবেষু —

বাবা সুভাষ কয়েক দিবস গত হইল তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ [illegible] খানা পত্র পাইয়া তুমি ভাল আছ জানিয়া আনন্দ আহ্লাদিত হইলাম।

পরম পূজনীয় মহাত্মা গান্ধি গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার সময়ে একবারটি আসিয়াছিলেন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁর শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে এবারে পাহাড়ে যাওয়া হইবেনা কারণ তাঁর ও আমার কোমরে ও পায়ে বাত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছি। আমাদের ভুবনেশ্বরে গিয়া [illegible] কয়েক দিবস থাকিয়া আশ্বিন মাসের প্রথমে কলিকাতায় যাওয়া হইবে।

অনিল পত্র আসিয়াছে তাহারা সকলে ভাল আছে এবং আশ্বিন মাসের প্রথমে তাহারা কলিকাতায় আসিবে লিখিয়াছে, শরৎ ও আসিবে। সকলে এখন এখানে আছে ও ভাল আছে।

গোপালি ও মঙ্গু ও [illegible] কলিকাতায় গিয়াছে। শ্রীমতী [illegible] ও [illegible] লইয়া এলগিন রোডে আছে ও ভাল আছে।

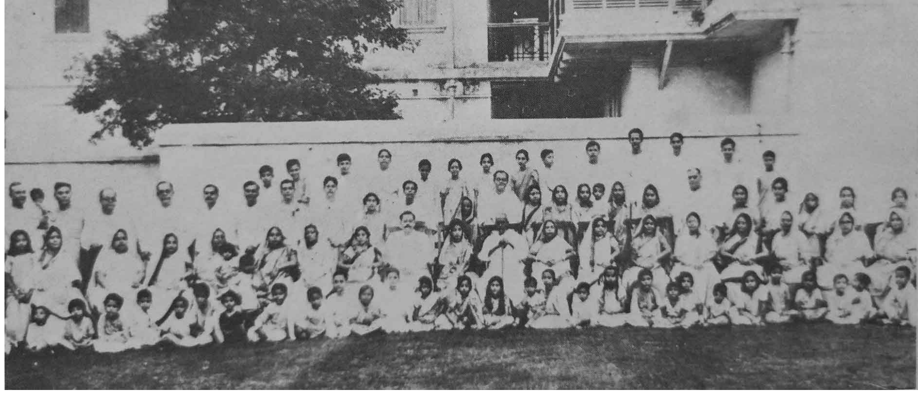
সুভাষকে লেখা মা জননী প্রভাবতী দেবীর পত্র



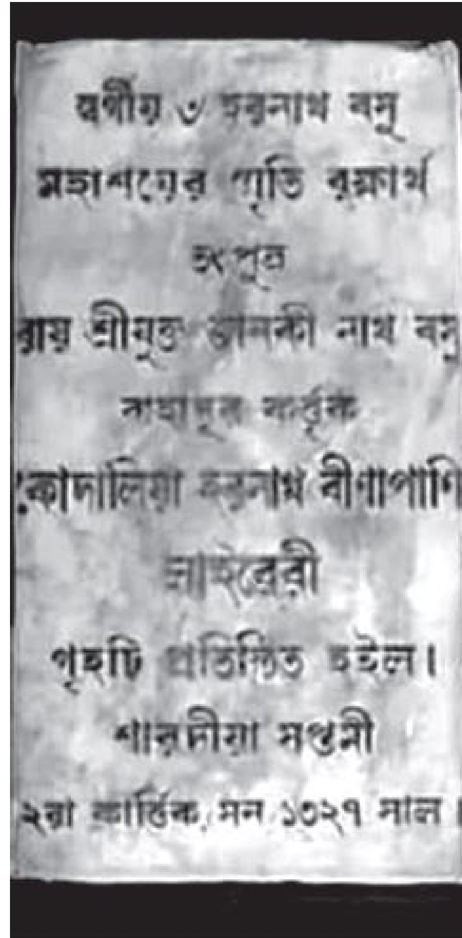
নেতাজির মা-বাবা কাশ্মীর ভ্রমণে, পুত্র শরৎ বসুর পরিবারের সঙ্গে।



হরনাথ লজের তোরণ কোদালিয়া



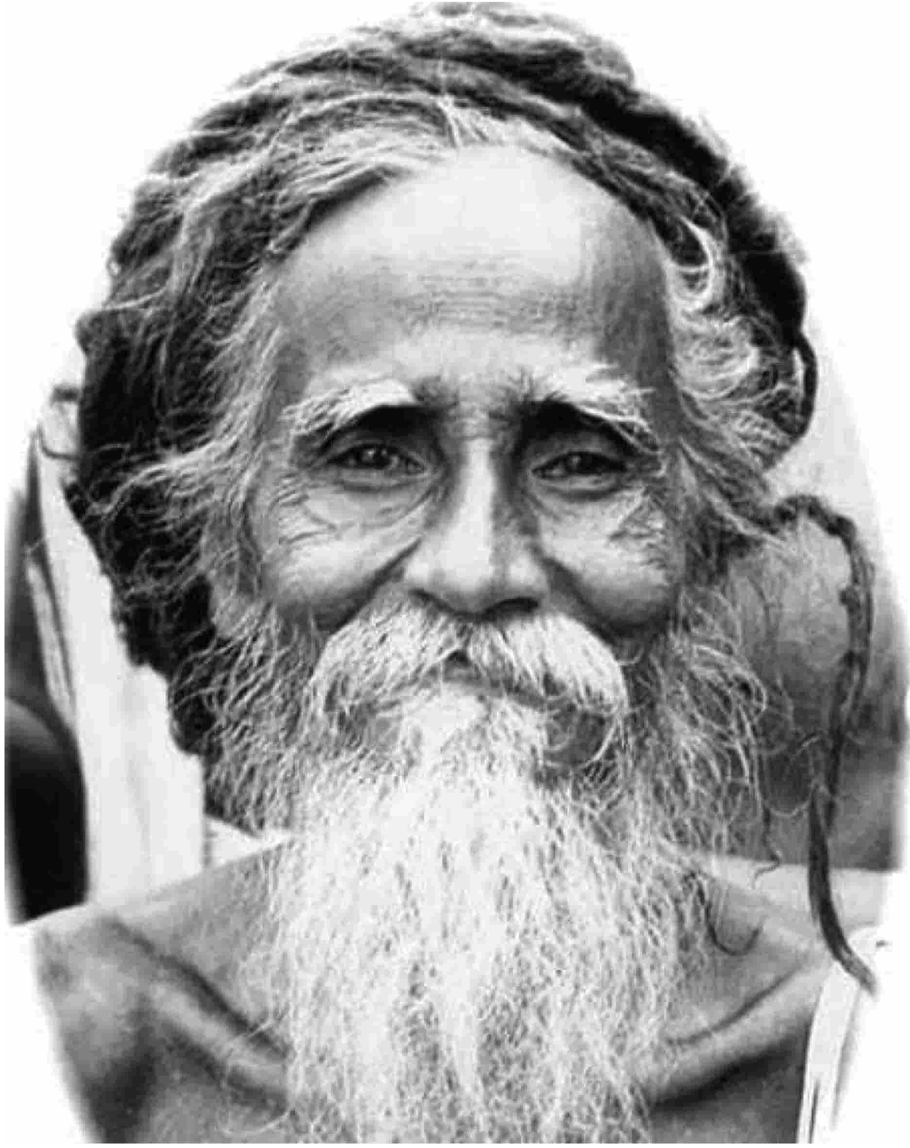
বৃহত্তর বসু পরিবারের চার প্রজন্ম



জানকীনাথের এই গ্রন্থাগারটি কোদালিয়াতে আজও আছে। তারই স্মৃতি ফলক।



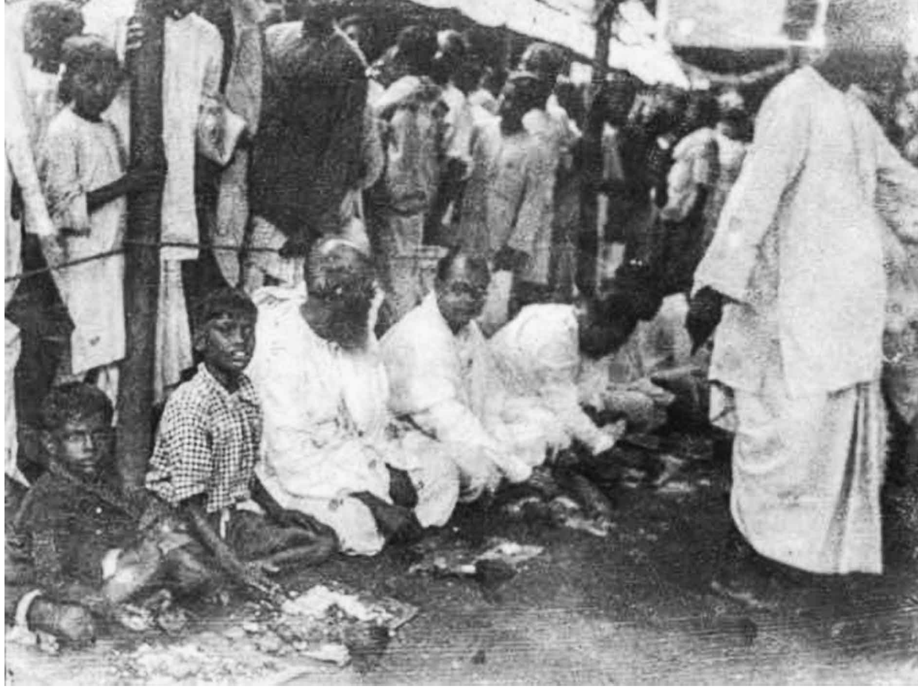
মাতৃসমা বাসন্তী দেবী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ



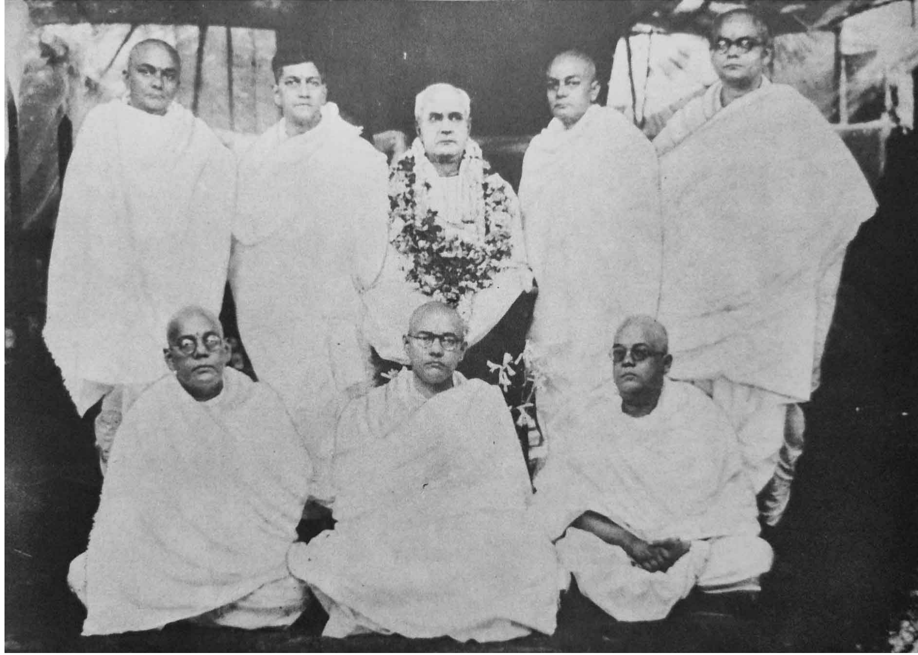
শ্রী শ্রী ওঙ্কার নাথ ঠাকুর যাঁর মুখে প্রভাবতী দেবী 'কথা রামায়ণ' কথা শুনতেন



মা জননী প্রভাবতী দেবী



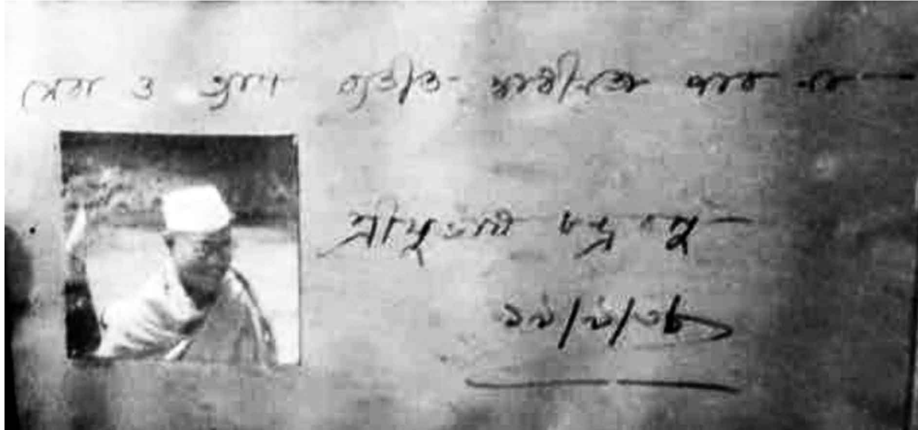
সর্বজনীন দুর্গা পুজোয় মহাষ্টমীতে দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্র বসু মাটিতে বসে সকলের সঙ্গে পংক্তি ভোজনে



পিতৃশ্রাদ্ধে সহোদরদের সঙ্গে সুভাষ



পুত্র ও পুত্রবধু দের সঙ্গে। মা জননী প্রভাবতী দেবীর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষচন্দ্র



মুক্তিপথের অগ্রদূত এর জীবন দর্শন



সুভাষ জননীর দুঃখরাতের রাজপুত্র সুভাষচন্দ্র। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তখন সুভাষ গুরুতর অসুস্থ। 'সুবি'র পাশে সুভাষের মাতাঠাকুরাণী।



কোদালিয়া পৈত্রিক গৃহের ছবি পুকুরে প্রতিফলিত হয়েছে।
যেখানে গ্রামে এলে সুভাষ সাঁতার কাটতেন।





কোদালিয়ার বিষ্ণু ঘরে প্রভাবতী দেবীর আরাধিত শ্রীবিষ্ণুর আসন, আজও নিত্য সেবা হয়।



বিষ্ণুঘর সংলগ্ন তুলসী মঞ্চ



মাতা -পুত্রের শেষ ছবি, ডিসেম্বর ১৯৪০। গৃহত্যাগ এর প্রস্তুতি পর্বের আগে মা জননীর শয়ন কক্ষে সুভাষ এই ছবি তোলান। চেয়ারে বড়দাদা সতীশচন্দ্র বসু ও কলকাতার মেয়র এ.আর.সিদ্দিকি



জানকীনাথ বসুর নির্মিত এলগিন রোডের সেই বাড়ি

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ

গত রবিবার অপরাহ্ন হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবারাত্র এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েক-দিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত এমন কি আত্মীয়স্বজনের সহিতও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্বেগের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং সংবাদ ছাপিতে দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই বলিয়া জানা গেল।

Hindusthan Standard
AN INDEPENDENT ORGAN OF INDIAN NATIONALISM
CALCUTTA:—MONDAY, JANUARY 27 1941. MAGH 14 1347 B. S.

WHAT HAS HAPPENED TO SJ. SUBHAS CH. BOSE?

Unexpected Exit From Home

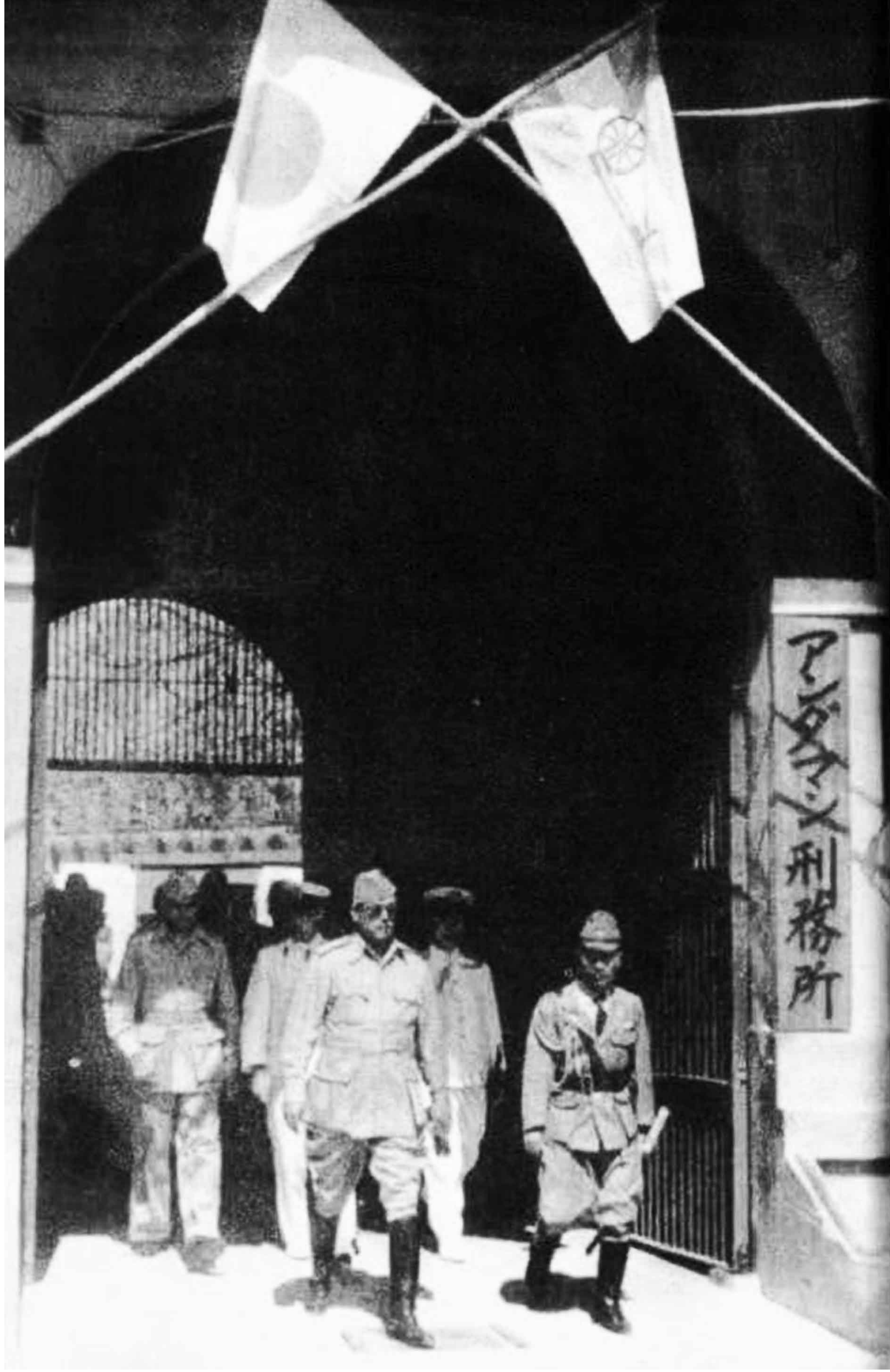
Great anxiety prevails amongst the relatives and friends of Sj. Subhas Bose since yesterday afternoon when it was noticed that he was not in his room where he was confined since his release from jail in the 1st week of December last. It is generally known that from the last few days he was observing strict silence and had not been seeing anybody not even the members of his family but has been spending his time in religious practices. Anxiety is all the more acute on account of his present state of health.

Enquiries have been made at various places about him but up to the time of going to the Press we understand he has not returned home.

সংবাদপত্রে নিরুদ্দেশের পথিক সুভাষ



শেষ বয়সে সুভাষ জননী



আন্দামানের সেলুলার জেল পরিদর্শন শেষে বেরিয়ে আসছেন আজাদ হিন্দ এর সর্বাধিনায়ক নেতাজি, ১৯৪৩এর ৩০ডিসেম্বর। চোখে কালো চশমা।



শিল্পীর চোখে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র। 'শিল্পী'র সঙ্গে সুভাষের স্বাক্ষর লক্ষণীয়।

সমাপ্ত

পড়ে ভালো লাগলে বই কিনে রাখুন, এই রকম আরো বই পড়তে আমাদের টেলিগ্রামে জয়েন করুন